সঙ্গী তিনজন

অজাতশত্রু

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুনীল গুহ

ছেপেছেন : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একলাই হাসছিল সুশান্ত। তার অনর্গল হাসির অসংলগ্নতা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠছিল।

আলো-নেভানো সিঁড়ি পার হয়ে সদরে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। শীতের বাতাস আজ সকাল থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের মতো বারবার হামলা করছে।

কয়েকদিন ধরে সুশান্ত বলছিল, দরজায় তালা দিয়ে যেও মা।

কেন? অবাক হয়েছিল হৈমবতী, তালা কেন?

কি জানি, তুমি বাড়ি থেকে চলে যাবার পর আমার আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কোথাও বেরিয়ে পড়ি। আর এমন কোথাও চলে যাই যেখানকার নদী পাহাড় উপত্যকা গাছপালা পাখি মানুষজন কিছুই চিনি না!

সে আবার কি রকম?

কি জানি, অন্ধকার এলেই ইচ্ছে করে ডায়াজের মতো প্রেস্টার জনের খোঁজে জাহাজ ভাসাই। জাহাজ কোথায় পাব মা—তাই মনে ভাবি, সারারাত ধরে হাঁটি! ভোর হলে নতুন কোথাও পৌঁছে যাব যেখানে আমাকে কেউ চেনে না। আমিও কাউকে চিনি না!

তুই আজকাল বড্ড আবোল-তাবোল ভাবিস খোকা!

সে তুমি বলতে পার মা—তবে তালা দিয়ে না-গেলে আমি যদি বেরিয়ে যাই দোষ দিও না কিন্তু? সুশান্ত পিটপিট করে হাসে।

হৈমবতী ভয় পেয়ে সুশান্তকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে। যতক্ষণ হৈমবতী না-ফেরে সুশান্ত এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাবে না।

বন্দী হয়ে থাকতে হবে নাকি মা?

বন্দী কেন! তুই রইলি, দাদু রইল। তোর গা'
পাখিরা রইল। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা রইল। এত খোলামেল
মানুষ আবার বন্দী হয় নাকি!

সেই কখন রাত আট-টার ট্রেন হাঁপাতে-হাঁপাতে মা'
আসবে; আর স্টেশনের প্লাটফর্মে যাত্রী উগরে দু-এক মিনিট
আবার হাঁটতে থাকবে। বুড়ো কয়লার ইঞ্জিনের হাঁপানির '
শুনে কষ্ট হয় সুশান্তর! অনেকদিন এই সময় গেটের কাছে
দাঁড়ায়।

যাত্রীদের ভিড় একটু থিতিয়ে গেলে দেখা যাবে, শ্রান্ত হৈমবতী
ছাতা হাতে প্লাটফর্ম থেকে নেমে লাইন পেরিয়ে পশ্চিমদিকে
আসছে; তারপর বাঁ-হাতি কাঠ-ফেলা ছোটপুল পার হয়ে গেটের
সামনে এসে দাঁড়াবে। গেটের সামনে হেলে দাঁড়িয়ে থাকা
সিলভার ওকের পাতা তার চুলের উপর হয়তো হাত বুলিয়ে দেবে।
গেটের গায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে হৈমবতী। দাঁড়িয়ে কিছু
ভাববে কিনা কে জানে। কোন-কোন দিন হয়তো ভাবে। সব
মানুষের নিজস্ব কিছু ভাবনা থাকে।

তারপর কাঠের দরজায় ক্যাচ্-কোচ্ শব্দ হবে। একটু পরে
আবার শব্দের পুনরাবৃত্তি হবে। তাতেই দরজা খোলা আর '
হবার সঙ্কেত পাওয়া যাবে।

সদর থেকে পুকুরের দিকে চলে গেল সুশান্ত। এখন '
মায়ের ভাবনা নয়। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ঘরে ঢুকেছে কিনা কে জা'
দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসতে হবে। একটু পরেই শেয়াল'
খাবারের খোঁজে এখানে এসে একবার ঘুরে যাবে।

এখন চোখের সামনে এলিয়ে-থাকা হালকা অন্ধকার বুঝি '
মোঘল রাজকন্যার মসলিন।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ঘরের কাছে যেতে তারা ভয়ে প্যাক্-প'
করে চেঁচিয়ে ওঠে।

না জেগে আছিস! সুশান্ত দড়ি খুলে দিতেই
গেল, থাক সারারাত ঘুমিয়ে থাক—
রিয়ে-যাওয়া ছাতিম ফুলের গন্ধ বাতাসে পাল তুলেছে। সুশান্ত
ার ধারে দাঁড়িয়ে বুক ভরে সেই-গন্ধ নিঃশ্বাসে টেনে নেয়।
সুশান্তর মনে হল, হাসছিল কেন সে! না, হাসবার কোন
। খুঁজে পায় না। দাঁড়িয়ে ভাবে অনেকক্ষণ। তা'হলে মা
বলে, ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সেই কথাই সত্যি
! হি-হি করে হাসে সুশান্ত, মা এমন সব কথা বলে ভাবলেও
পায়।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে কঠিন হয়ে যায় সে। স্নায়ুতে টান পড়ে, আচ্ছা মা তোমাকে যদি পাগল বলি? সোজা হয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত, কি উত্তর দেবে শুনি—উঁ? কথা বলছ না যে? সুশান্তর মুখের ভাঁজে হাসি ফুটে ওঠে, তুমিও কম পাগল নয়! হাঁটতে থাকে সুশান্ত, জন্মে অবধি যে-বাবাকে আমি দেখিনি এখনো তুমি তার আশায় বসে আছ। কতো বছর ধরে শোনাচ্ছ, খোকা এটা করোনা তোমার বাবা বকবেন। খোকা ওখানে যেওনা তোমার বাবা পছন্দ করেন না। খোকা তোমাকে মানুষ হতে হবে। তোমার বাবার াই ইচ্ছে ছিল। আশ্চর্য, একটা অদৃশ্য সত্তাকে তুমি বাবা বলে লিয়ে দিতে চাও! কোনদিন যাকে দেখব না। চিনব না। নব না!

মা, আমাকে তুমি পাগল ভাবতে পার। বোকা ভাবতে পার। চ আমি জানি সারাজীবন ধরে কি-যেন আমার কাছ থেকে য়ে রাখতে চাও। তোমার ভয় পাছে খোকা তোমার রহস্য লামেলো করে দেয়। দেব। একদিন ঠিকই এলোমেলো করে ব। সেই জন্যেই বাড়ির সব অন্ধকার আতি-পাঁতি করে খুঁজি াথাও যদি সেই হদিস মেলে!

কি যেন একটা পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। তার ঠাণ্ডা

ছিলছিলে স্পর্শে সুশান্তর গা শিরশির করে ওঠে। আচমকা গা
গিয়ে মাথা গরম হয়ে ওঠে। ভাবে, বাবা একটা নরপশু। ব
দিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছা করে। ভালুকের মতো নখ
দিয়ে ফালা-ফালা করে ফেলতে চায়। একটা সন্দিগ্ধ সংশয়ে
আগুন বুঝি সুশান্তকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে!

সদর পার হয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে সুশান্ত। ত
চোখ দুটো অন্ধকারে শ্বাপদের মতো তীব্র হয়ে ওঠে। হঠাৎ দেয়ালে
কোণে ধাক্কা লেগে তার চেতনা লুপ্ত হয়ে আসে! মাথা
ভেঙে গেল নাকি! রক্তে তার চুল ভিজে যাচ্ছে বুঝি। অসংলগ্ন
গলায় সুশান্ত চেঁচিয়ে ওঠে, আর্মাডা—স্পেনিশ আর্মাডা ড্রেক—হকিন্স
আর টেনিস খেলার সময় নেই—। সুশান্তর পা থরথর করে কাঁপতে
থাকে। দেয়ালের গায় এলিয়ে পড়ে সে। তারপর কতকগুলো শব্দ
উচ্চারণ করতে পারে না শুধু মনে-মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ষ্টরম্—ষ্টরম্—
ষ্টরম্, রাইফেল মেন ফরম্—ফরম্—ফরম্!

সুশান্তর চোখের সামনে অন্ধকার উলটে-পালটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
কী রকম উজ্জ্বল নীল ফসফরাসের আলো হয়ে যায়। আর সমস্ত
শরীরের বাঁধুনি আলগা হয়ে দেওয়ালের গায়ে এলিয়ে পড়ে।

সারা বাড়িতে আর সাড় নেই। জাগুয়ারের মতো কালো
অন্ধকার সুশান্তর বুকের উপর থাবা পেতে বসে। অনেকদূরে
পুলের উপর দিয়ে গুমগুম শব্দে ট্রেন চলেছে। সেই শব্দ গড়িয়ে
আসে বাতাসে।

অনেকক্ষণ নিথর হয়ে থাকার পর সুশান্তর জ্ঞান হল।

বাইরে গৌরমোহনের গলা শোনা যায়, দাদুভাই আলো-টালো
জ্বালোনি কেন? বারান্দার মেঝের উপর গৌরমোহনের লাঠির শব্দ
পাওয়া গেল। বোঝা যায় অন্ধকারে লাঠি ঠুকে-ঠুকে ঘরে ঢুকছেন।

বাগানের কোথাও লেপটে-থাকা জুঁইলতা থেকে অল্প-স্বল্প গন্ধ
প্রজাপতির মতো হঠাৎ জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ছে।

আরে ভোর হয়ে গেছে বুঝি! জ্ঞান ফিরে উঠতে গিয়ে সুশান্ত দেখে বুকের উপর অন্ধকার জমে আছে। মনে পড়ে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। উঠবে কিনা ভাবছে এমন সময় বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে। সুশান্ত হাত দিয়ে দেখে ছোট-খাটো ট্যাপারির মত ফুলে উঠেছে কপালটা।

নিজের ঘরে বসে গৌরমোহন চেঁচিয়ে চলেছেন, দাদুভাই—ও দাদুভাই—

পা-টিপে নিচে নামতে গিয়ে সুশান্ত বলে, **My sides are aching.**

কাচের জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যায়, দাদু গৌরমোহন চশমাটা বারবার খুলে-পরে চোখের নজর পরখ করছেন। আজকাল কী যে হয়েছে দাদুর সব সময়ই ভাবছেন, অন্ধ হয়ে যাবেন বুঝি! আর চোখে দেখতে পাবেন না।

দাদুভাই। সুশান্তকে প্রায়ই ডাকেন গৌরমোহন, দেয়াল-ঘড়িতে এখন কটা বাজে দেখত?

সাতটা পনেরো।

দাদু ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলেন, আমিও তাই দেখছি—। তারপর হয়তো চশমাটা নাকের উপর বসিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, বাইরে কি অন্ধকার! কিছুই চোখে দেখা যাচ্ছে না।

সত্যি অন্ধকার! আমিও কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছি না দাদু।

ভাবলাম, চোখটা গেল বুঝি!

তোমার যত্তো বাজে ভাবনা!

না-রে দাদু, বুড়ো হলে ভাবনা হয় বৈকি!

হঠাৎ হয়তো গৌরমোহন অন্যমনস্ক হয়ে বলেন, ষ্টেশনে একটা আলো জ্বলছে না?

সুশান্ত বলে, না তো! তিনটে জ্বলছে—

তা' হলে। সন্দিগ্ধ গৌরমোহন কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ

আর চশমা মুছে আবার ষ্টেশনের দিকে তাকান, তা'হলে আমি আর দুটো দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?

বাঃ, একটা যদি দেখতে পাও তো আর দুটো দেখতে পাবে না কেন ?

আমিও তো তাই ভাবছি ভাই। শেষে হয়তো বাকি একটাকেও দেখতে পাব না। কি ভেবে গৌরমোহন বলেন, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি তো—। সোজা হয়ে বসে গলা বাড়াতেই গৌরমোহনের চোখে পড়ে, এক—দুই—তিন—

তিনটেই দেখতে পাচ্ছ দাদু ?

স্পষ্ট। তোকে যেমন দেখছি তেমনি। তা'হলে এতক্ষণ বোধহয় কম দেখছিলাম। একটু লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে গৌরমোহন বলেন, মাঝে-মাঝে কম দেখি—আবার ঠিক হয়ে যায় !

মোটেই না। চেঁচিয়ে ওঠে সুশান্ত, নিচু হয়ে চেয়ারে বসেছিলে তাই দেখতে পাওনি। যেই ঘাড় তুলেছ অমনি দেখতে পাচ্ছ।

তাই হবে বোধহয়।

সুশান্ত দেখে দাদু চশমা টেবিলে রেখে চোখ বুজে গড়গড়ার নল টেনে যাচ্ছেন। হয়তো দাদু কিছু ভাবছেন। তার কথা। তার মায়ের কথা। সকলের কথা।

খোলা দরজা দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে সুশান্ত গৌরমোহনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, দাদু—

কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? মুখ থেকে নল নামিয়ে গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, বাড়ি ফিরে দেখি আলো নেভানো।

পুকুরের ধারে গেছিলাম। ভাবলাম, সন্ধের আগেই তো তুমি পৌঁছে যাও—তুমিই আলো জ্বালবে। তা' তোমারও দেরি আমারও দেরি ! যাই, দোতলার ঘরে আলো জেলে দিয়ে আসি। যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় সুশান্ত, দাদু আজ তোমার গ্রেট সাকসেস্—সকালে তোমাকে বলেছিলাম না বসন্ত-গৌরিটা ছটফট

করছে। মনে হল পেট ব্যাথায় ছটফট করছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তোমাকে বলতে—তুমি বললে, এক ফোঁটা কলোসিন্থ দিয়ে দে'। বিকেলে দেখছি এক ডোজেই চাঙ্গা।

হোমিওপ্যাথি তো তুই বিশ্বাস করিস নে।

ভাবছি এবার থেকে করব। সুশান্ত দাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে উপরে উঠতে থাকে। হঠাৎ হরিহরের কথা মনে এল। ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় হরিহর প্রায়ই তাদের বাড়ি আসত।

একদিন হরিহর জিজ্ঞাসা করল, তোর বাবা কোথায় থাকেন ?

কি জানি। অন্যমনস্কের মতো জবাব দিয়েছিল সুশান্ত।

বরিশালের ছেলে হরিহর যেমন তুখোড় তেমনি চালু।

তার মানে তোর বাবা কোথায় থাকে জানিস না ?

কি করে জানবো, জন্মে অবধি আমার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি।

সেই কথা হরিহর কলেজের অন্য সহপাঠীদের রসিয়ে গল্প করেছিল। তারপর বন্ধুদের বাঁকাচোখের ঝকঝকে ইশারা সুশান্তকে বিস্মিত করেছে। বিহ্বল করেছে।

তোর বাবাকে কোনদিন দেখিস নি ? কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল।

না। ঋজু উত্তর দিয়েছিল সুশান্ত।

সহপাঠীরা মুখ টিপে হেসেছিল। এতে হাসবার কি আছে বুঝতে পারে নি সুশান্ত।

বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সুশান্ত, আমার বাবা কোথায় মা ?

সুশান্তকে কাছে টেনে নেন হৈমবতী, কেনরে খোকা ?

সবাই জিজ্ঞাসা করছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী বলে, তিনি যে এখন কোথায় আমি নিজেই জানি না।

জানো না কেন মা ?

তিনি জানাতে চান না। একটু থেমে হৈমবতী নিজের মনে বলে যায়, আমার অপরাধ জানি না। তবু সারা জীবন শাস্তি দিয়ে গেলেন !

আর প্রশ্ন করে নি সুশান্ত। মায়ের আর্দ্র কণ্ঠে গভীর বেদনার আভাস পেয়ে চুপ করে গেছিল।

হরিহরের সঙ্গে আর দেখা হয় না। হয়তো কোনদিন হবেও না। তবু সুশান্তর হৃদপিণ্ডে এমন একটা ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে যার নিরাময় নেই।

নিজের ঘরে পৌঁছে গেছিল সুশান্ত। খাটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে মনে-মনে বলে, Behold I was shapen inequity and in sin did my mother couceive me !

আলো জ্বালাতে ভুলে গেছিল সুশান্ত। অন্ধকারে ডুবে রইল। নিস্তব্ধ একতলা থেকে গৌরমোহনের গড়গড়ার শব্দ ভেসে আসে।

ট্রেন ফেল করে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে হৈমবতী। উপরে উঠে সুশান্তর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলে, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি ?

সাড়া না-পেয়ে সুইচ্ অন্ করতেই সুশান্ত খাটের উপর উঠে বসে, এই ফিরলে ?

হুঁ। ট্রেন ফেল করে দেরি হয়ে গেল। তা' তুই শুয়ে পড়েছিস শরীর খারাপ নয় তো ?

এমনি শুয়ে পড়েছিলাম।

হাতের ব্যাগটা খাটের উপর ছুড়ে ফেলে হৈমবতী চেয়ারে বসে বলে, আঃ—শরীর ভেঙে আসছে—আর পারা যায় না ! চোখ বুঁজে আসে হৈমবতীর। সারাদিনের পর রাত্রিটুকু তার বিশ্রাম। সেই ঘটনার পর থেকে একটানা এমনি চলেছে। এখন আর মাথায় সাদা চুল খুঁজতে হয় না চোখে পড়ে। হাতের কাঁকন

দুটো আগে ছোট হত এখন চলচলে হয়ে গেছে। পড়ে যাবে বুঝি। কতো রোগা হয়ে গেছে। কপালের শিরা এখন স্পষ্ট।

মাঝে-মাঝে এলোমেলো বাতাসের ঝাপটা এসে ক্যালেণ্ডার উলটে-পালটে দিচ্ছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে হৈমবতী, খোকা—

কি মা?

সেই গন্ধটা পাচ্ছি যেন!

কোন গন্ধ?

তোর ছোট মাসি চুলে যে তেল মাখত সেই গন্ধ! দেখত আকাশে মেঘ করেছে নাকি?

সুশান্ত উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায়, হ্যাঁ মা, আকাশ মেঘে ভরে গেছে।

হৈমবতী চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। তার চোখ দুটো অলৌকিক হয়ে ওঠে, এই সময়েই হেনা চলে গেছিল। আমাদের মায়া ছাড়তে পারে না তাই আসে। আর এই সময়েই আসে। আগের বারেও এই সময়ই এসেছিল। ঠিক বিষ্টির আগের মুহূর্তে! বাতাসে তার চুলের গন্ধ থই-থই করে। তারপর বিষ্টি নামে। খোকা—ও খোকা; আলোটা নিভিয়ে দে বাবা। ঘর আর সিঁড়ির আলো নিভিয়ে দে। আলোতে ওর বড় কষ্ট হয়!

সুশান্ত বিড়বিড় করে, তোমার এই পাগলামি রাত দুপুরে ভালো লাগে না মা।

কিছু বলছিস খোকা?

না তো। সুশান্ত আলো নিভিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে বাতাসেরা একদল শিশুর মতো ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়ে। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলোয় একরাশ মেঘ আকাশ ঢেকে দিল। তারপরই মুশলধারে বৃষ্টি। মাঠের উপর দিয়ে হু-হু করে জলভেজা বাতাস সোঁদা গন্ধ নিয়ে উপরে উঠে এল।

চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে হৈমবতী। কতো কাছে যেন সেই গন্ধ পাচ্ছে! হেনা হয়তো ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এ'টাই তো হেনার ঘর ছিল। স্নান করে এসে খোলা চুলে জানালায় কাপড় মেলে দিতে গিয়ে অবাক হয়ে মাঠের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকত।

বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেও মাঠের একধার জলে ভরা। চোত-বোশেখে সেই জল ফিনফিনে বেগুনি রঙের কচুড়ি পানার ফুলে বোঝাই হয়ে যেত। টোপরের মত ফুলের খুসি সব সময় বাতাসে কাঁপত।

নিঃসঙ্গ এক ডাহুক কচুড়ি-পানার উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে-হেঁটে সারাদিন কি যেন খুঁজত! তারপর বিকেলে মন-মরা হয়ে কোথায় যেন উড়ে যেত। সেই কচুড়িপানার ফুলের দিকে চেয়ে সারাটা দুপুর কাটত হেনার। ঠাণ্ডা মেজেতে শুয়ে-গড়িয়ে বই পড়ে হেনার দিন যেত।

বৃষ্টির দিনে গাছপালার ভিতর একলা ঘুরে বেড়াত হেনা।

মা বলতেন, বিষ্টি লাগাচ্ছিস যে বড়—এই-না সেদিন জ্বর থেকে উঠলি! একটুও ভয় নেই মেয়ের।

হাসত হেনা। চোখে হাসি। মুখে হাসি। উত্তর দিত না কথার।

হৈমবতী রাগ করত, এই মুখপুড়ি উঠে আয় বলছি—

গাছের আড়ালে সরে যেত হেনা। বাতাসে তার চুল উড়ত। বৃষ্টিতে ভিজতে কি যে ভালো লাগত তার! গায়ের রঙ কালো বলে বিয়ে হচ্ছিল না। কতজন দেখতে এসে ফিরে গেল। অমন শরীর অমন চেহারা কালো বলে মিথ্যে হয়ে গেল। স্নান করে এসে হেনা চুল খুলে দিত আর আলো পড়ে মনে হত কালোজলের স্রোত এলিয়ে গেছে বুঝি।

হৈমবতী চুল বাঁধতে বসে বলত, কি চুল তোর মাথায় হেমু!

দু-হাতের আঁজলার মধ্যে চুলগুলো তুলে নিজের গালে ঠেকাত হৈমবতী, দেখিস কেউ-না-কেউ এই চুল দেখেই তোকে তুলে নিয়ে যাবে!

আমি যে কালো দিদি। কি রকম কান্নায় ভরা থাকত হেনার গলা।

বাবারও এমন পয়সা ছিল না যে কালো রঙের দাম ধরে দেবেন। অনেক চেষ্টা করেছিলেন বাবা। পারেন নি। কাউকে পছন্দ করাতে পারেন নি। প্রত্যেকবারই তাকে বিরস মুখে পাত্র-পক্ষের বাড়ি থেকে ফিরতে হত। এই ধকল বাবাও আর সামলাতে পারছিলেন না।

হেনার চুলের গন্ধ ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টির দিনে তাকে খুসির পাগলামিতে পেয়েছে বুঝি!

হেনু। ডেকে ফেলেন হৈমবতী। হেনার জন্যে জমে-থাকা স্নেহ গলে বেরিয়ে আসে।

বাইরে আঝোর বৃষ্টি নেমেছে। গাছপালাগুলোও মাতাল হয়ে উঠেছে। হেনার নিজের হাতে লাগানো য়্যুকলিপটাস্ গাছের পাতাগুলো ঝন ঝন করে বাজছে। তার আনন্দই বুঝি সবচেয়ে বেশি। পাতার ছায়ারা এক নাগাড়ে ফিসফাস করে চলেছে। তারা বুঝি হেনার সঙ্গে কথা বলছে!

কারো ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে হৈমবতী বলে, খোকা নাকি রে?

কেউ সাড়া দিল না।

তোর ছোট মাসি যে এ বাড়িতে আসে কখন জানতে পারলাম জানিস? হৈমবতী সুশান্তকে উদ্দেশ্য করে বলে যায়, সে-বার কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। রূপচাঁদা মাছের মতো ধবধবে চাঁদ উঠেছে। বেশ শীত পড়েছে। আমি ফুলতোলা খয়েরি খদ্দরের চাদরটা গায় জড়িয়ে বাগানে ঘুরছিলাম। ভিজে ঘাস-পাতার গন্ধের সঙ্গে শিউলির বাসে বাগান বোঝাই। কোন সাড়া-শব্দ

নেই। শুধু এক-একবার ঘুমভাঙা পাখিরা ডেকে উঠছে। আর কখনো পাতা থেকে শিশির ঝরা টুপটাপ।

কি বলব তোকে খোকা, আলোয় বুঝি পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে! এমন সময় আচমকা একটা গন্ধ আমাকে চমকে দিল। মনে হ'ল গন্ধটা আমার চেনা। থমকে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিলাম। বুক ভরে গেল সেই গন্ধে। ভেবে আর কূল পাইনা। হেনা তো কতোদিন আগে মারা গেছে। তাকে তখন ভুলেই গেছি। তার চুলের গন্ধ কি আর মনে থাকে।

বাবা কখন ঘুমিয়ে গেছেন। মা একলা পুজোর ঘরে জেগে আছেন। তার ঘুমোতে নেই। তোকেও ঘরে শুইয়ে মশারি টানিয়ে রেখে এসেছি।

আমি এদিক-ওদিক তাকাই। হঠাৎ মনে হল, আরে এই তেল তো হেনা চুলে মাখত। কিন্তু এখন এ গন্ধ এখানে আসবে কি করে। আমি বুঝি ভয় পেয়ে গেছিলাম। চারপাশে গাছ, গাছের পাতা আর তাদের ছায়া, ফুল, ফুলের গন্ধ, শিশির পড়ার টুপটাপ সব বুঝি স্তব্ধ হয়ে আছে।

ফিরে দাঁড়ালাম। ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখলাম। না, কেউ কোথাও নেই। তবে এ গন্ধ আসছে কোথা থেকে!

তুই বললে বিশ্বাস করবি না খোকা! নিজের কানে শুনতে পেলাম কে যেন ডাকল, দিদি। সেই কতোকালের ওপার থেকে, যেন কতো ভুলে-যাওয়া দিনের ওপার থেকে আলতো একটা শব্দ হেঁটে এল। প্রথমে ভাবলাম মনের ভুল। দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। আবার যদি শুনতে পাই। তারপর ভাবলাম মনের ভুল। এমন আবার হয় নাকি। দারুণ একটা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা মুহূর্তের পর মুহূর্ত আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল। একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম— স্পষ্ট শুনতে পেলাম হেনার গলার ডাক, দিদি—। চমকে তাকালাম চারদিকে। শুধু আমাব ছায়াটা নড়ে-চড়ে আবার স্থির হয়ে গেল।

আরে হেনা তো বেঁচে নেই! এই ভাবনাটা মনে আসতেই কি রকম একটা ভয় বুঝি আমাকে চেপে ধরল। আমার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আমি দৌড়ে বাড়ি ঢুকে সদর বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেলাম। তারপর কোন রকমে আলো জ্বালিয়ে মশারি ফেলে তোকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। ও মা, খানিকবাদে দেখি সেই গন্ধ মশারির ভিতরেও সাঁৎরে বেড়াচ্ছে।

একটু চুপ করে হৈমবতী। তারপর নিজের মনে বলে. কেন এত ভালোবেসেছিলি যে চলে গিয়েও ছেড়ে থাকতে পারিস না মুখপুড়ি!

খোকা। অন্ধকারে হৈমবতী ফিসফিস করে। কারো সাড়া না-পেয়ে উঠে আলো জ্বালিয়ে দেখে কেউ নেই। ওমা! এতক্ষণ ধরে একলাই বকে যাচ্ছি!

সুশান্ত ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়, আর কতোক্ষণ বসে থাকবে মা? দাদুর কিন্তু ঘুম পেয়ে গেছে—

এই উঠছি। উঃ, শরীর আর নড়তে চাইছে না। উঠে দাঁড়িয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে খোকা তুই কোন গন্ধ পাসনি?

না তো।

একটুও না! অবাক হয় হৈমবতী, কি জানি আমি ভিজে বাতাসে নিঃশ্বাস টানতেই ওই গন্ধে বুক ভরে গেল।

ছোট মাসি মরেছিল কি করে মা? আমার তো এতোটুকুও মনে নেই।

যেতে গিয়ে থেমে গেল হৈমবতী, কতো আর বয়েস তোর তখন! অতটুকু বয়েসে মনে থাকে নাকি! ডাক্তারেরা ধরতেই পারলেন না। একদিনের জ্বরেই শেষ।

আমার শুধু মনে আছে অনেক লোকজন এসেছিল। তোমরা কাঁদছিলে। তারপর একটু থেমে স্মৃতি হাতড়ে অস্পষ্ট সংশয়ে সুশান্ত বলে, পুলিশ এসেছিল না মা?

পুলিশ। গালে হাত দেয় হৈমবতী, পুলিশ আসবে কেন? কি বলছিস পাগলের মতো?

সুশান্তর মুখে সন্দেহের ছাপ, হয়তো গুলিয়ে ফেলছি মা।

চল্ তোদের খাবার দি। হৈমবতী তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তারপর একতলায় নেমে উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, বেশি দেরি করিস নে খোকা। দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সুশান্তর মুখে পুলিশ শুনে চমকে উঠেছিল হৈমবতী। সত্যি পুলিশ এসেছিল। তারাই পোস্টমর্টমের জন্যে মৃতদেহ নিয়ে গেছিল। গেটের বাইরে কি কারণে যেন হেনার লাস নামানো হয়েছিল। উলুখড়ের ভিতর হেনার সারাটা শরীর ডুবে গেছিল। মনে হচ্ছিল, হেনা বুঝি ঘাসের ভিতর ঘুমিয়ে আছে।

কিছুদিন ধরে হৈমবতীর মনে হচ্ছিল হেনা তাকে এড়িয়ে চলে। মনের মধ্যে বন্দী একটা ভাবনা তাকে আনমনা করে তুলেছে। স্নানের সময় যে-মেয়ে পুকুরের জল উতল-পাথাল করে তুলত কোন মন্ত্রে সেই মেয়ে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

আগে একদিন হেনা বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছিল, তুমি আর আমার বিয়ের চেষ্টা করো না বাবা। অনেক তো করে দেখলে—

কেন মা? বাবা বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন অবাক হয়ে।

একজনের বিয়ে দিয়ে সর্বশান্ত হলে—দিদিকে সেই বাপের বাড়ি ফিরে আসতে হল। আমার জন্যে আবার যদি চেষ্টা করো বিষ খেয়ে মরব।

বাবা বিমূঢ় হয়ে হেনার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হৈমবতীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে হেমুর?

কি জানি বাবা, আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

পাগলামি করতে নিষেধ কর। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর পাগলিকে।

রান্না ঘরে বসে হেনার মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলেন. তুই তো অবুঝ নোস ?

সাপের মতো ফুঁসে উঠেছিল হেনা, বিয়ে না-করে কি মেয়েরা বাঁচতে পারে না ?

পারেই তো না। মা জোর দিয়েছিলেন, পারেই তো না !

আমি খুব পারব মা! আমাকে যদি জ্বালাতন কর আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

সেবার হেনা আর বিষ খাবার কথা বলেনি। খুশি হয়েছিল হৈমবতী। হেনা তো একেবারে অবুঝ নয়। বৃষ্টিতে ভেজে, পেয়ারা খেতে গাছে চড়ে, প্রজাপতি ধরতে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে, বাগানের বাইরে নিচু মাঠে জলের মধ্যে মাছ ধরতে নেমে যায় সে ওর স্বভাব। নইলে অমন শান্ত মেয়ে ক'টা পাওয়া যায়।

মা বললেন, ওসব ছেলেমানুষি রাখ। অমনি করেই সবার বিয়ে হয়। এই আমাদের দেশের ধারা। এতে কিছু মান-অপমান নেই। তোদের যত সব আজগুবি কথা !

তোমাদের তো সারাদিন দেখছি কাজ আর কাজ! হাতে এতটুকু সময় থাকে না। এ এক রকমের খাঁচা !

মা উত্তর দিলেন, এ খাঁচা সোনার খাঁচা মা—আমার বয়েস না-হলে বুঝবি নে এ' কতো সুখের !

না মা, আমি আকাশের পাখি আমাকে খাঁচায় বাঁধতে যেও না। ডানা ঝাপটে মরব তা'হলে—

তা' বললে হয় রে পাগলি ! বয়েস মেয়েদের শত্তুর। একজন তো চাই যে রক্ষে করবে। মেয়েরা পৃথিবীতে একা বাঁচতে পারে নাকি !

নিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী। আজ হেনাও নেই। মাও নেই।

দুধ ধরে যাচ্ছে আর তুমি বাইরে তাকিয়ে আছ মা! সুশান্ত দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, কি ভাবছ মা ?

ভাবছি নে রে খোকা। শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে। করুণ দেখায় হৈমবতীর মুখ।

তুমিই তো দেরি করছ। খেয়ে-দেয়ে এতক্ষণ শুয়ে পড়তে পারি।

হৈমবতী খাবার সাজিয়ে দেয় সামনে, তুই খেতে সুরু কর খোকা। আমি বাবাকে খাবারটা দিয়ে আসি। আজ বড্ড রাত হয়ে গেল!

গৌরমোহনের ঘরে খাবার দিয়ে এসে হৈমবতী খেতে বসে। খেতে বসে কোন কথা হয় না। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে শীত ধরিয়ে দিচ্ছে। চাইনিজ ইংকের মতো অন্ধকার এক-একবার বিদ্যুতের আলোয় ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন শুধু পাতা থেকে জল-পড়ার টুপটাপ শব্দ।

মালতীপুরের চোখে এখন ঘুম এসে গেছে।

হৈমবতীর আগে খেয়ে নিজের ঘরে চলে গেল সুশান্ত। আলো জ্বালাবার দরকার নেই। বিছানা পাতা আছে। হাত-পা ছাড়িয়ে শুয়ে পড়ে। চোখের সামনে জানালার ফ্রেমে-বাঁধানো আকাশের ব্লাকবোর্ড। নিথর গাছপালা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

হঠাৎ পাখিটার কথা মনে পড়ে! আজ হয়তো আসবে না। এক-একদিন কি যে হয় পাখিটার আসে না। সুশান্তর প্রায়ই রাতে ঘুম আসে না। একদিন এমনি জেগে থাকতে গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দেখে একটা পাখি। কি পাখি কে জানে! সাদা ধবধবে একটা পাখি। কি লম্বা তার ডানা দুটো। সুশান্তদের বাড়ি ঘিরে মরা-জ্যোৎস্নায় ঘুরে-ঘুরে উড়ছে। চারপাশের গাছপালার উপর দিয়ে নিঃশব্দে ডানা ভাসিয়ে শীতের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে!

বিশ্বভুবন জুড়ে যখন স্তব্ধতা স্রোত হয়ে ভেসে বেড়ায় তখন কোথা থেকে উড়ে আসে এই পাখি! সুশান্তর মনে হয় সে যেন

কোলরিজের কবিতার নাবিক। ডেকের উপর বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাখিটা এ্যাল্‌বাট্রসের মতো অন্ধকার জাহাজের উপর ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

ভাঙা কাচের মতো ছড়ানো-ছেটানো ভাঙা-জোছনা গাছপালার ভিতর দিয়ে বিছানার উপর এসে পড়ে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোলাটে জোছনা গায় মেখে কি খোঁজে পাখিটা। কি চায়? অশুভ কোন সংকেত আনে না তো!

রোজ ঘুম ভাঙে না সুশান্তর। যেদিন ঘুম ভাঙে সেদিনই পাখিটাকে দেখে। কোনদিন একটু দেরি করে আসে পাখিটা। তখন আর সুশান্তর চোখে ঘুম থাকে না। এক-আকাশ তারা চোখে নিয়ে বসে থাকে। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। গাছপালা বাড়ি-ঘর পুকুর-মাঠ সবাই কি ভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে!

সুশান্ত একদিন গৌরমোহনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদু পাখিরা কি রাত্তিরেও ওড়ে?

ওড়ে বৈকি।

দেখেছ তুমি?

সাপড়ি আর আনারের ক্ষেতে যখন রাত জেগে পাহারা দিতাম তখন কতো পাখি উড়তে দেখেছি।

ভয় পেতে না?

ভয় আবার কিসের। হেসে উঠেছিলেন গৌরমোহন।

পাখি ছাড়া অন্য কিছুও তো হতে পারে।

অন্য কিছু আবার কি?

সে কি আমি জানি নাকি। অন্যমনস্ক হয়ে সুশান্ত নিজের ঘরে চলে গেছিল।

বেশ শীত পড়েছে আজ। চাদরটা গায়ের উপর টেনে নেয় সুশান্ত। দু'চোখে ঘুম টলটল করে। তবু জেগে থাকতে চায়। পাখিটা যদি আসে!

সুশান্তর ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। শীর্ণ একটা আলোর আভাস বাতাসে কাঁপছে। কাল রাতে আর ঘুম ভাঙে নি। হয়তো পাখিটা এসেছিল।

শরতের শেষের দিকে আবছা একটা শীতের ছোঁয়াচ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ঘুম যেন তাই কুয়াসার মতো চোখের গায় জড়িয়ে থাকে। বারবার চোখ রগড়েও ঘুম তাড়ান যায় না। তবু সকালে যখন কেউ ওঠে না পৃথিবী একা জেগে বসে থাকে তখনই সুশান্তর উঠতে ভালো লাগে।

গন্ধ আসে। ফুলের গন্ধ। অস্পষ্ট। কুয়াসায় ভেজা।

দরজা খুলে নিচে নেমে যায় সুশান্ত।

সকালের আলো পেয়ে বদরি আর বুলবুলিরা জেগে উঠেছে। কিচমিচ করছে। আলতো শিস দিচ্ছে। ওদের খাবার দিয়ে সুশান্ত সোজা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ঘরের কাছে চলে গেল। ঘরের দরজা তুলে ধরতেই থপথপে পা ফেলে রাজহাঁস দুটো বেরিয়ে আসে। সুশান্ত হাততালি দিতে তারা প্যাক্‌প্যাক্ করে পুকুরে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে।

তারপর এ্যাগাপান্‌থাস্ ব্লু-লিলির পাশ দিয়ে ঘুরে যায় সুশান্ত। নাইজিরিয়া থেকে আনা এই নীল লিলির প্রত্যাশায় সুশান্ত অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করে আছে।

মা আজ দেরিতে উঠবে। হয়তো ডাকতে হবে সুশান্তকে। সারা সপ্তাহ যা খাটুনি যায় রবিবারের ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না। রবিবারে তাই চা খেতে দেরি হয়ে যায়।

বৃষ্টি-ভেজা পাতা গায়ে লাগতেই গা শিরশির করে। সুশান্ত একটু এগিয়ে পুকুর ঘাটের বাঁধান চত্বরে বসে। গেটের কাছ থেকে দাদুর কাসির শব্দ আসছে। গেটের কাছে সিলভার ওকের তলায় যে ফাঁকা জায়গা আছে—সেখানে দাঁড়িয়ে দাদু খাবার ছড়িয়ে দেন আর কোথাকার পাখি এসে ভিড় করে। ব্লু-ব্লাক আর সাদা পালখের কোট

প'রে দোয়েল আসে। আসে অস্থির-লেজ টুনটুনি। শালিক—চড়াই। রাজ্যের পাখিদের কল-কূজনে মনে হয় কি যেন একটা ব্যাপার চলছে। সুশান্ত গেলেই পাখিরা পালিয়ে যায়। ভয় পায় সুশান্তকে।

সুশান্তর দাদামশাই গৌরমোহন সান্যাল মালতিপুরের দোতলা এই বাড়িটা সস্তায় পেয়ে যান। রিটায়ার করবার পর দেশে ফেরবার জন্যে ছটফট করছিলেন। সেই সময় এই বাড়িটা পেয়ে সেকেন্দ্রারাও থেকে তলপি-তলপা গুটিয়ে বাংলা দেশে ফিরলেন। এক পয়েন্ট পাঁচ একরের মতো জমি আছে বাড়িটাতে। দিশি-বিদিশি জানা-অজানা ফল আর ফুলের গাছে ভরা। মানুষ সমান উঁচু কাঁটা-তারে ঘেরা এই বাড়িব গেট থেকে বাড়ি যতোদূর বাড়ি থেকে পুকুবও ঠিক ততোখানি দূরে।

বাড়ির পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে বিশাল এক মাঠ ছড়িয়ে আছে। জলা ঘাসবন চাষ-আবাদের জমি আর নাম-না-থাকা চেঁড়া-খোঁড়া এক জলেব স্রোত। জল আছে কি নেই। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনে সেই জলের ধারা নদী হতে চায়। পুব দিকে স্টেশন। পুব-পশ্চিমে চলে গেছে ট্রেনের লাইন। উত্তব দিকে অনেকখানি জুড়ে গাছপালা মাঠ তারপর লোকালয়। সব দিকেই মাথার উপর আকাশ। নীল সারসের মতো ডানা মেলে দিয়েছে। চোখ তুলে তাকালে সেই নীল ছায়া সব সময় চোখ আচ্ছন্ন ক'রে রাখে।

গাড়ির শব্দ আসছে। এখুনি কুয়াসার ভিতর থেকে ভারি ইঞ্জিনের মুখটা বেরিয়ে আসবে। সিগন্যালের চোখটা ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে। মাথা তুলে সুশান্ত গাড়িটাকে একবার দেখতে চায়। তারপর মাথা নামিয়ে ভাবে—সকাল থেকে দাদামশায়ের ঘোড়া মহীলালের কথা মনে পড়ছে! মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে আস্তাবল থেকে মহীলালের পা-ঠোকার শব্দ কানে আসত। পা ঠুকে মশা তাড়াত মহীলাল। ঘুম চোখে পাশ ফিরতে গিয়ে

জেগে যেত সুশান্ত। মশারির ভিতর শুয়ে মনে হত একলা আস্তাবলে বোধহয় মহীলালের ভয় করছে !

ছোটমাসি মারা যাবার পর দিদিমা এ বাড়িতে থাকতে পারলেন না। দাদামশাই তাই সবাইকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন। হাতে কাজ নেই পয়সারও দরকার দাদামশাই হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিস্ শুরু করলেন ; আর দূরে রোগী দেখতে যাতে অসুবিধা না-হয় সেজন্যে ঘোড়া কিনেছিলেন একটা। যাদের কাছ থেকে কেনা মহীলাল তাদেরই দেওয়া নাম। ভোর না হতে মুন্না মিঁয়া মহীলালকে ডলাই মলাই করে দিয়ে যেত। ছোটবেলায় ভয়ে মহীলালের কাছে কিছুতেই যেত না সুশান্ত। দাদু কতোদিন জোর করে মহীলালের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে আর সুশান্ত ভয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠেছে। দিদিমা রাগ করেছেন, ছেলেটা এত ভয় পায় তবু শোন না তুমি ! দাদামশাই হাসতেন, তোমার নাতিটা একেবারে ভিতুর ডিম !

একটু বড় হয়ে সুশান্ত এক একদিন দাদুকে না-বলে ভোরবেলা একলাই বেরিয়ে পড়েছে। সকালের খোলা হাওয়ায় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে কি মজা লাগত ! খোলা মাঠের দিগ্‌দিকে ঘোড়া নিয়ে উড়ে যেত সুশান্ত। অড়হর ক্ষেত বাঁয়ে ফেলে জেলা বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠত। তারপর সোজা রাস্তা ধরে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে বুনো গাছপালা পেরিয়ে একেবারে কুমার নদীর ধারে। শীতে জল তখন নিচে নেমে গেছে। তল অবধি দেখা যায়। ওরি কোথাও এক-আধটা মাছ স্রোত ঠেলে উজানে পাড়ি দিচ্ছে। নদীর ধার দিয়ে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যেত সুশান্ত। অনেকটা এগিয়ে মাঠে গিয়ে পড়ত। ঘোড়া দুলকি চালে মাঠের কুয়াসা ভেঙে নিজের ইচ্ছে মত চলত। ঠাণ্ডা বাতাস মুখে ঝাপটা মারত। চুল এসে পড়ত মুখের উপর। অনেক দূরে মাঠের ওপারে ঘুম-ভাঙা সূর্যকে কুয়াসার মধ্যে চোখ মুছতে দেখা যেত।

জনহীন সেই মাঠের তেপান্তরে সুশান্তর নিজেকে অচিনপুরীর

রাজপুত্র বলে মনে হত তখন। মনে হত অমুদ্দেশ এই পথের কোথায় যেন গল্পে শোনা রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে আছে!

এমনি অকারণে কতো দিন নদীয়া জেলার নীলমণিগঞ্জের আদিগন্ত মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ঘোড়ার পিঠে। কতো গ্রীষ্মের সকাল-বিকেল অড়হর গাছের ছায়ায় কেটেছে। নির্জন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুমার নদীর পারে একলা চলে গেছে। এপারে-ওপারে রূপোলি জলেরা বারংবার কান্নায় মাথা কুটে মরছে। বোধ হয় কিছু বলতে চায়—কি সে কথা সুশান্ত আজও জানে না। ইচ্ছে করে, আরেকবার কুমার নদীর কূলে বসে তাদের কথা শোনে। আজ হয়তো বুঝতে পারে।

সুশান্তর কতো দুপুর সেখানে তন্ময় হয়ে কেটেছে। ঘুঘু আর শালিকের ডাকে বিস্তীর্ণ সেই দুপুরের রোদ ভেঙে-চুরে আজও চার-পাশে বুঝি ছড়িয়ে আছে।

আরে! চমকে ওঠে সুশান্ত। তার আধ-বোজা চোখের উপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। এমন গাঢ় নীল শরীর আর ঝিঘল হলুদ ডানার পাখি আগে দেখেনি তো এখানে! রাত্রে যে পাখিটাকে দেখে সুশান্তর ভয় হয় এর কোথাও সেই ভয় নেই। আলোর আনন্দ সারা শরীর থেকে ঠিকরে যাচ্ছে। গাছপালার আড়ালে হঠাৎ কোথাও ডুবে গেল।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে সুশান্ত নিজের ভাবনাটাকে আবার তুলে নিল: ছোটবেলার সেই পরিচিত মাঠ, মাঠ-ভরা অড়হরের ক্ষেত—সাদাটে ফুলে বোঝাই, আখের ক্ষেতে বাতাস লেগে দিনরাত সরসরানি মরমরানি সে সব কোথায়। আহা-রে, কোথায় সেই কুমার নদী! আম জাম আর বেতের ছায়ায় ঢালু হয়ে যাওয়া পাড়ে ঝোপের তলায় যখন-তখন ডাহুকের ডাক, আমের বোলে চৈত্রের গন্ধবতী জোছনার রাত, মাঠের উপর মেঘ করে থাকা নিথর বিকেল—সে

সব কোথায় গেল! তারা তো সব আছে। তেমনিই আছে। পথে যে দরজা দেওয়া যাবার কোন উপায় নেই!

আজ এই-সুশান্তর সেই-সুশান্তকে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সুশান্ত ফিসফিস করত, দাদু ও-দাদু?

সুশান্তর ডাকে সাড়া দেবার জন্যেই কিনা কে জানে গৌরমোহন বোধহয় সারা রাত জেগে থাকতেন, কি বলছ দাদুভাই?

তোমার কাছে যাব।

মশারি তুলে নেমে এস। এইতো আমি বসে তামাক খাচ্ছি। গৌরমোহনের গড়গড়া একবার থেমে আবার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ করত।

কয়েক হাত মাত্র তবু সুশান্তর মনে হত কত দূর।

দাদু। কাঁদ-কাঁদ গলায় আবার ডাক দিত সুশান্ত।

কি হল?

ভয় করছে।

ভয় কিসের—এই তো আমি বসে আছি—এস নেবে এস—

অন্ধকারে হারিয়ে যাব যে। ছোট্ট সুশান্তর গলায় উদ্বেগ।

অবশেষে দাদু তার কালো পেট মোটা সিন্দুক থেকে নেমে নাতিকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। হৈমবতী জানতেও পারত না।

দাদুর কোলের মধ্যে নিরাপদ হয়ে সুশান্ত বায়না ধরত, গল্প বলো দাদু—

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস সুশান্তর বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।

সকালের রোদ রূপকথার মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। ফুলফোটা গাছের গায় সেই রোদের আঁকিবুকি।

চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়েছে। অনেক লম্বা হয়ে গেছে। কাটতে হবে। চুল সরিয়ে দিয়ে আকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছোটবেলার ভাবনায় ডুবে থাকে সুশান্ত।

সন্ধে হতে জোনাকিরা দল বেঁধে বন থেকে উড়ে আসত। আর

সুশান্ত পড়া কামাই করে পাতার ঠোঙায় জোনাকি ধরে রাখত। রাত্রে মা মশারি টানিয়ে দিয়ে গেলে জোনাকিগুলো মশারির মধ্যে ছেড়ে দিত। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে দেখত অন্ধকারে জোনাকিরা ঘুরে মরছে। উপরে উঠছে। নিচে নামছে। সবুজাভ-হলুদ আলো এক-একবার দপ করে জ্বলে উঠছে।

নিশ্চল সুশান্তর পায়ের কাছে একটা কাঠবেড়ালি নেমে এসেছে। লেজটা সুশান্তর গায় লাগছে। সুড়সুড়ি লাগতে হিহি করে হেসে ওঠে সুশান্ত। কাঠবেড়ালিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। লেজটা ঘাসের উপর পতাকার মত মুহূর্তের জন্যে জেগে থাকতে দেখা যায়।

খোকা।

সুশান্ত পিছন ফিরে দেখে মা এসে দাঁড়িয়েছে।

তুমি এত সকালে? অবাক হয় সুশান্ত।

ঘুম ভেঙে গেল তাই। হৈমবতী এগিয়ে এল, এত সকালে তুই এখানে কি করছিস?

হঠাৎ নীলমণিগঞ্জের কথা মনে পড়ল। মহীলালের কথা মনে পড়ল। কিছুতেই আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। জানো মা, মালতিপুরের বন্দীশালার মতো এই বাড়ী থেকে নীলমণিগঞ্জের সেই বাড়িটা অনেক ভালো ছিল। তোমার মনে আছে মা, পৌষ মাসে আখের গাড়িগুলো একটানা ষ্টেশনের দিকে আখ বোঝাই হয়ে যেত। আমি ছুটে গিয়ে আখ টেনে নিতাম। তোমার বয়স তখন কম ছিল। তুমিও সেই আখ খেতে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুশান্ত স্বগতোক্তি করে, তোমার মাথায় তখন একটাও পাকা চুল ছিল না।

হৈমবতীও বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল সুশান্তর কথা শুনে। নীল-মণিগঞ্জের সেই সময়টা সুখের কি দুঃখের কে জানে। তবে নীলমণি-গঞ্জে যেতে হয়েছিল অনেক দুঃখে। সব কিছু হারিয়ে।

মহীলালকে এখন হাতের কাছে পেলে সামনের মাঠটা একবার চক্কর দিয়ে আসত সুশান্ত। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে পেটে একটা

গুঁতো দিলেই ব্যস্—আর দেখতে হত না—একদৌড়ে মীরপুরের অড়হরের খেত, তারপর নাবাল জমিটা পেরিয়ে—দৌড়—দৌড় আর দৌড়—!

খোকা, আমি যাচ্ছি। হৈমবতী ফিরে যায়, তুই আয় অনেক কাজ আছে।

চলে যাচ্ছ মা? এত সকালে আবার কাজ কিসের? একটু না হয় বসলে—

হৈমবতী দাঁড়ায় না। গাছপালা ঘেরা পথের ভিতর দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। সিঁড়িতে পা দিয়ে হৈমবতী সুশান্তর দিকে ফিরল, দরখাস্তগুলো আজই লিখে সকালের দিকে ডাকে ফেলে দিয়ে আয়—

উত্তর না দিয়ে ফিসফিস করে সুশান্ত, এখন আমি যাব না। আর দরখাস্তও করতে পারব না। বাঁধান ঘাটের উপর শুয়ে পড়ে সুশান্ত, ইংরিজি অনার্স—বেকন মার্লো সেকস্পীয়রের দাম কি আজকাল! ব্যালেন্স সীট তৈরি করতে পারি না—সায়েন্সের ডিগ্রী নেই—এখন আমি চাকরীর বাজারে অচল! দরখাস্ত করে লাভ কি! এখন আমি শুয়ে নীলমণিগঞ্জের কথা ভাবব। হারানো এল্ ডোরাডোকে মনে-মনেই পাব। সেখানে ইণ্টারভিউ নেই—উমেদারি নেই—কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে নিজেকে ছোট বলে মনে হয় না। তারপর ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরা নেই। চোখ বুজে শুয়ে থাকে সুশান্ত।

এক ডিবেটিং-এ তার চমৎকার ইংরাজি শুনে ইংরিজি-এক দৈনিকের সম্পাদক সহকারী সম্পাদকের চাকরি দিয়েছিলেন। বেশ কয়েক মাস চাকরি করার পর কি যে হল—হঠাৎ একদিন স্কুল-কলেজে পাওয়া সার্টিফিকেট নিয়ে সম্পাদক মশাইয়ের নাকের সামনে ধরে চেঁচাতে সুরু করল সুশান্ত, দেখুন মশাই আমার মতো ব্রিলিয়াণ্ট্ ছেলে কি কাজ করছে!

তারপর সম্পাদকের কামরা থেকে বেরিয়ে সহযোগীদের সামনে গিয়ে সেই সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলতে থাকে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কোন লাভ হবে না। এ-সব চাকরির আমি পরোয়াই করি না!

কাগজের চাকরি আর টেঁকে নি।

তারপর সি. আই. টির এক স্কুলে চাকরি জোগাড় হল। হৈমবতী নিজেই যোগাযোগ করে দিয়েছিল। সেখানে কিছুদিন ভালোই চলল। তারপর সুশান্ত হেড্‌মিস্ট্রেসের ইংরিজির ভুল ধরতে সুরু করল। হৈমবতীর কাছে খবর গেল। সুশান্ত হৈমবতীর নিষেধ শুনল না। বলল, চাকরী যায় যাক ভুল সহ্য করতে পারব না মা। ঠোকাঠুকি চলল। শেষকালে সুশান্তকে বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হল।

ভাগ্যের জোরে তৃতীয় বার ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসে একটা কেরানির কাজ জুটে গেল। সেখানেও একই ইতিহাস। একদিন অফিসারের লেখা একটা সাকুলার হাতে আসতে তার চেম্বারে গিয়ে হাজির, এই নিন সই করে আবার ইস্যু করুন। প্রিপোজিসন্ আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস্ টেনসের ভুল ছিল শুধরে দিয়েছি। শুনে তো অফিসারের চোখ ছানা বড়া। কয়েকদিন বাদে ইনসাবর্ডিনেশনের অজুহাতে কেন তার চাকরি যাবে না তার কারণ দেখাতে বলা হল। সুশান্ত কৈফিয়ৎ না-দিয়ে হ্যাং ইয়োর জব বলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল।

সুশান্ত ভাবে মাঝে-মাঝে কেন যে তার এমন হয় কে জানে!

কোথায় পাতার আড়ালে ঘুঘু ডাকছে। ঘুঘুর ডাক শুনলে সুশান্তর বিকেল-বিকেল 'মনে হয়। ঘুম আসে। ঘুম এলে স্বপ্ন দেখে।

কতোক্ষণ আকাশের দিকে অপলক হয়েছিল সুশান্ত মনে নেই। হঠাৎ মনে হল মা যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। গলার স্বরে অনুমান করে তাকে ছোঁয়া গেল না। কান পেতে রাখে সুশান্ত।

হয়তো এতদূর থেকে শোনা যাবে না। বাতাসে ভেসে এল হৈমবতীর গলা, আরে, সতুদা তুমি! এস-এস ভেতরে এস! এবার সুশান্তর কৌতূহলকে প্রশ্রয় দিতে হল। উঠে অল্প-স্বল্প ঝরা পাতা মাড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর দোয়েলের ডানার মতো ধুসর অন্ধকারে অপরিচিত একটা মুখ।

হৈমবতী বলে আমি তো ভাবতেই পারি না সতুদা, তুমি আসবে—আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

গলা বাড়িয়ে সুশান্ত দেখে হৈমবতীর মুখে খুসি ঝকঝক করছে।

সতুদার উত্তর দিল না। নিঃশব্দ একটা হাসি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মুখে, আমিই কি জানতাম হৈম!

তুমি আমার খবর পেলে কি করে?

পেলাম আর কোথায় জুটে গেল হঠাৎ। কতো দিন ধরে যে ইচ্ছে করছিল তোমার সঙ্গে দেখা করি।

তা' বেশ করেছ।

অনেকদিন বাদে সুশান্ত মাকে হাসতে দেখে। দেখে অবাক হয়।

তুমি বোস সতুদা। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। হৈমবতী দ্রুত পায় বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকে, খোকা ও-খোকা—

গম্ভীর ও চাপা গলায় সুশান্ত উত্তর দেয়, কি বলছ?

কিছু খাবার-দাবার আনতে হবে বাবা।

কার জন্যে? সুশান্তর চোখ দুটো পিটপিট করে।

আয় ভেতরে আয় খোকা। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি' তোর মামা হন!

মামা! অবাক হল সুশান্ত, কি রকম মামা মা?

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবে হৈমবতী। তারপর সহজ হয়ে বলে, আমার ছেলে-বেলার খেলার সাথি—সেকেন্দ্রারাওয়ে এক-জায়গায় মানুষ হয়েছি। তোর দাদুর সঙ্গে জ্যাঠামশাই মানে

সতুদার বাবার সম্পর্ক ছিল আত্মীয়তারও বেশি। হঠাৎ থেমে গিয়ে হৈমবতী বলে, তুই বরং আগে খাবার নিয়ে আয় পরে চা খেতে বসে একসঙ্গে গল্প করা যাবে।

আমি যেতে পারব না। সুশান্ত মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকে।

এই খোকা। শোন বলছি। যেতে পারবি না কেন শুনি?

কদ্দুর যেতে হবে বল তো!

ছিঃ—

চা আর বিস্কুট দাও। জিঞ্জার নাট তো ভাল বিস্কুট।

একদিন এসেছে সতুদা। হয়তো আর কোনদিন আসবে না। দাঁড়া টাকা এনে দি।

এমন বিরক্ত কর!

টাকা নিয়ে সুশান্ত গেটের কাছাকাছি গিয়ে সিলভার ওক গাছের তলায় দাঁড়ায়। পিছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পায় না। কি ভেবে সিলভার ওকের গায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত।

অনেকক্ষণ বাদে জানালার কাছে এসে হৈমবতী দেখে সুশান্ত দাঁড়িয়ে আছে।

তুই এখনও যাস নি?

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে চমকে উঠে সুশান্ত বলে, এই যাচ্ছি—

গেটের বাইরে পা দিয়ে সুশান্তর বিমর্ষ ভাব কেটে গেল। নিজের অজান্তে বাজারের উলটো দিকে হাঁটতে সুরু করে। অনেকদূর এগিয়ে সুশান্তর খেয়াল হল। রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে যায়! মনে হল অনেকদূর চলে এসেছে। এখন ফিরে বাজারে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে ঢালু বেয়ে মাঠের সমতলে নেমে গেল।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতর তাকাতে হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করে সত্যপ্রসাদ, তোমার ছেলে বুঝি ?

হ্যাঁ, আমার ছেলে।

কতো বয়েস হল ?

কুড়ি-একুশ হবে বোধহয়।

অবিকল তোমার মুখ। অন্য কোথাও ওকে দেখলেও তোমার কথাই আমার মনে হত হৈম। কি করে ও ?

কিছুই না।

তার মানে ? একটু বুঝি কৌতূহল বোধ করে সত্যপ্রসাদ, কিছু করে না। কেন—অতবড় ছেলে।

কি জানি। বলি তো অত করে, কিছু একটা কর্ আমি আর পেরে উঠছি না খোকা। শোনে। উত্তর দেয় না। সারাদিন পুকুরের ধারে, বাগানে গাছপালার মধ্যে, সামনের মাঠে ঘুরে বেড়ায়। সবচেয়ে মুসকিলের ব্যাপার হল, ওর ধারণা—সারা পৃথিবী ওর শত্রু তাই কিছু করে উঠতে পারছে না। ঘর পার হয়ে দরজার কাছে থেমে হৈমবতী বলে, একটু বোস সতুদা। আমি চা করে আনি।

তোমার বাবা কোথায় হৈম ?

তিনি বোধহয় পাখিদের খাবার দিয়ে ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে গেছেন। জনকয়েক বৃদ্ধ আসেন স্টেশনে তাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করেন। চা খাবার সময় হয়েছে। এই এখুনি এসে পড়লেন বলে—

দ্রুত পায় বেরিয়ে যায় হৈমবতী। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত যেতে হৈমবতীর পায়ের গতি শ্লথ হয়ে আসে। মুহূর্তের জন্যে বুকের কোথায় যেন আশ্চর্য যন্ত্রণা অনুভব করে।

উনুনে জল চাপিয়ে দিয়ে অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী।

ছোট একটা মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে। তার পিছনে একটা ছেলে! সারামাঠে চুকন্দর-গাঠগোবির ক্ষেত। কোথাও চনকের অঙ্কুরিত পাতার গালচে পাতা।

ছেলেটা মেয়েটাকে ছুঁতে চায়। মা... ভূতেশ্বরের... তাকিয়ে এসে ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গেছে। ...চেয়ে উঁচুতে ভূ মন্দির। মেয়েটি অবলীল ভঙ্গীতে একটার পর একটা ধাপ দেখতে— হয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসে হাঁপায়। ঝুকে পড়া ডেহুয়া গাছের আমাকে তার মুখের উপর ঝিলমিল করে।

একটু পরে ছেলেটা উঠে এসে মেয়েটার পাশে বসে। তার কিনা দুজনের সে কি হাসি।

মনে পড়ছে : ভূতেশ্বরের মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। ছড়িয়ে পড়ছে সেই ঘণ্টার শব্দ চারপাশের মাঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করে থাকা গাছপালার পাতার আড়ালে বসে-থাকা বটের তিতির তোতা আর সুগ্যা পাখী চমকে-চমকে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। পশলা-পশলা রোদ বৃষ্টি হচ্ছে মাঠে।

ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। কতোদিন বাদে সেই গন্ধ এখনও যেন অনুভব হয়। হাতরাস থেকে যে শাহি-সড়ক সেকেন্দ্রারাও ছুঁয়ে ঘুরে কাশগঞ্জ চলে গেছে সেই পথের চলতি-মানুষও ঘণ্টার শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। এখনও স্পষ্ট দেখতে পায় হৈমবতী

মন্দিরের বারান্দায় বসে পশ্চিম দিকে তাকালে যদ্দূর দেখা যায় গাপড়ি আর আনারের বাগিচা। দক্ষিণে বোম্বা আর নহর। বোম্বা আর নহরের সঙ্গে সমান্তরাল আম নিম আর আমলতাসের সার। আমলতাসের গোছা-গোছা ফুল দুপুরেও বুঝি বিকেল বেলার হলুদ আলো হয়ে থাকে। আর উত্তরে সেকেন্দ্রারাও সহর। সেখান থেকে তারা দৌড়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে ইদারার জল খেয়ে সহরে যাবার পথে তারা মাঠ ঘুরে যেত। জলে নেমে পানিফল খেত। কেউ হয়তো কনকনে জল ...রা গায় ছিটিয়ে দিত। খিলখিল করে হাসত দু'জনে। মিউ...ন্যালিটির জমা দেওয়া পেয়ারা আর ডালিমের বাগান

আসত তারা। কাঁচা ফল পেড়ে চিবোত। তারপর পাহারা-জিজ্ঞ। তাড়া খেয়ে সহরের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

। না-না। আর অলীক ভাবনা নয়। হৈমবতী চা করতে হল। খোকা কেন যে এত দেরী করছে! বড্ড বিরক্ত হয় বতী।

সুশান্ত ফিরছে না দেখে চা আর। বিস্কুট নিয়ে হাজির হল হৈমবতী। লজ্জা করছে।

চা করতে এত দেরী!

কি কৈফিয়ৎ দেবে বুঝে উঠতে পারে না হৈমবতী।

তোমার ছেলে ফিরেছে?

মাথা নাড়ে হৈমবতী, না ফেরেনি। কখন ফিরবে কে জানে। ওর জন্যে বসে থাকতে গেলে তোমার আর চা খাওয়া হবে না।

তা' হলে? অবাক হল সত্যপ্রসাদ।

ভাবতে হবে না। ওমনি ওর স্বভাব—শোধরান গেল না—। হৈমবতীর গলায় অনেকখানি কুণ্ঠা। তবে সেটুকু সামলে নিতে দেরি হল না হৈমবতীর, তোমাকে দেখে আশ্চর্য লাগছে সতুদা—এত পালটে গেছ তুমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না। অমা রে, চা খাচ্ছ না যে--ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাপড় দিয়ে নিজের মুখ মুছে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, বৌদি কোথায়? ছেলে মেয়ে ক'টি?

আমি তো বিয়ে করিনি হৈম। বিস্কুটে কামড় দিয়ে সত্যপ্রসাদ মিটমিট করে হাসে।

বিয়ে ক'রোনি! হৈমবতী ফিক করে হেসে ফেলে বলে, যাঃ মিথ্যে কথা!

সত্যি, হৈম আমি বিয়ে করিনি।

কেন? হৈমবতীর গলার স্বর ভারি হয়ে যায়, বিয়ে ক'রলে না কেন সতুদা?

এমনি। ধরো সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

ও। নিষ্পলক হৈমবতী সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলে, এতদিন বাদে আমাকে তোমার মনে পড়ল।

মনে তুমি সব সময়ই আছ। তাইতো এলাম তোমাকে দেখতে—

সত্যপ্রসাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হৈমবতী বলে, আমাকে আর কিছু দেখার নেই সতুদা। সব খুইয়ে বসে আছি।

তোমার স্বামী ?

জানি নে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী, বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি নে। নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। এই আশ্চর্য শরতের দিন বছরের পর বছর চোখের সামনে মিছিল করে যায় আর দিনের পর দিন হৈমবতী ক্লান্ত হয়ে আসে। আশা মরে যায়। চোখের আলো কমে আসে। বুকে তেমন আর বল পায় না। ক্লান্তি। শুধু ক্লান্তি। সঞ্চয় করে রাখা সুখের সেই নীল পদ্মটি ছাড়া জীবনের আর কোথাও কিছু নেই।

অনেকক্ষণ বাদে সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে, তোমার বাবা তো এখনও এলেন না ?

কি জানি।

তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতাম। নিজের মনে কথা বলে সত্যপ্রসাদ, তাহলে—

উত্তর দিল না হৈমবতী।

তা'হলে। একটু ইতস্তত করে উঠে দাঁড়ায় সত্যপ্রসাদ, আসি—

হৈমবতীও সত্যপ্রসাদের পিছনে এগিয়ে যেতে-যেতে বলে, দেখে তো গেলে সতুদা তোমার সেই হৈম সুখে নেই। শুনে গেলে তার স্বামী নিরুদ্দেশ। ছেলেটা মানুষ হল না। তার সম্পর্কে কোন ভাবনা রেখ না। তার দুঃখ নিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে দাও—

ভুল করছ হৈম। সত্যপ্রসাদ ফিরে দাঁড়ায়।

হঠাৎ নিজের অজান্তেই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে হৈমবতী, এখানে এসে

আর আমার অশান্তি বাড়িও না। নিজের এই অবস্থায় কাউকে আমি সহ্য করতে পারি না। মনে হয় তারা বুঝি আমাকে—

নিশ্চল চোখে হৈমবতীর দিকে চেয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, আমি চলে যাচ্ছি হৈম—

উত্তেজনায় হৈমবতীর বুকের ভিতর দপদপ করে। কোন উত্তর দিতে পারে না। অনেকক্ষণ বাদে তার ঠোঁট নাড়ে, এসো--

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল সত্যপ্রসাদ তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী। সত্যপ্রসাদ গেট পার হয়ে গেল। হৈমবতী স্থির হয়ে কি-যেন-একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে।

দরজা খোলা পড়ে থাকে। দোতলার বারান্দায় উঠে গেল হৈমবতী। এখনও স্টেশনের প্লাটফর্মে সত্যপ্রসাদকে দেখা যাচ্ছে। এখনো ফিরিয়ে আনা যায় ইচ্ছে ছিল, সত্যপ্রসাদকে সারাদিন ধরে রেখে ভরিয়ে-ভরিয়ে ছেলেখেলার সুখের স্বাদ নেয়। অথচ তাকে ফিরিয়ে দিল হৈমবতী। এসেই ফিরে গেল মানুষটা। হৈমবতী তাকে একবার থাকতেও বলল না।

ট্রেন এল। ট্রেন চলে গেল। স্টেশনে সত্যপ্রসাদকে আর দেখা যায় না।

দুপুরে গৌরমোহনকে খাইয়ে নিজের ঘরে গেল হৈমবতী। কতো দিন বাদে অস্থির একটা স্মৃতি উন্মনা করে তুলেছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। বিকেলে হৈমবতীর যখন ঘুম ভাঙল তখনো সুশান্ত ফেরে নি। সূর্য একেবারে ঢলে পড়েছে। ভাঙা-চোরা কালো মেঘের গা-ফেটে আগুনের মতো তীব্র আলো ঠিকরে যাচ্ছে। ঝড়ো বাতাস মাঠ ভর্তি সর্ষে ফুলের হলুদ রঙ ঢেউ হয়ে যাচ্ছে।

হৈমবতী আয়না, চিরুনি, সিঁদুরের কৌটো আর চুল বাঁধা ফিতে

নিয়ে ছাদে গিয়ে বসে। চুল-বাঁধা শেষ করে পশ্চিম আকাশের সূর্যের মতো মস্ত বড় এক ফোঁটা দিল কপালে। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে চিলে কোঠার সিঁড়ির উপর বসে রইল। কতোক্ষণ অন্ধকার সব ঢেকে ফেলেছে খেয়াল নেই। আজ সারাদিন নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে কারো বুকে মাথা রেখে শান্তি পায়। যে সব-দায়িত্ব সব-ভার থেকে হৈমকে চিরকালের মত মুক্তি দেবে। না, তেমন কেউ নেই। মা বেঁচে থাকতে তার কাছে তবু ঠাঁই মিলত। বছরখানেক হল মা নেই।

অনেকদিন বাদে হৈমবতীর গলা গুনগুনিয়ে ওঠে,

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।

কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।

মনের কান্না বুঝি গানের সুর হয়ে বেরিয়ে আসে। বার-বার গাইতে থাকে হৈমবতী। জীবনে আশ্রয় করবার মতো কিছু বুঝি আর নেই।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হৈমবতী জানে সুশান্ত এসেছে!

তুমি উপরে বসে আছ মা আর আমি সারা বাড়ি খুঁজে মরছি! কি করছ এখানে—এঁ্যা—চুপ করে বসে আছ যে বড়—কথা বলছ না কেন?

কি কথা বলব? হৈমবতীর গলায় জ্বালা।

তুমি বড্ড রেগে যাও মা!

তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলতে এস না!

কেন মা?

সকালে তুমি যা' কাণ্ড করলে তাতে আমি আর তোমার মা হতে াই না।

তুমি বড্ড রেগে গেছ মা। সুশান্ত মায়ের গা-ঘেঁষে বসে। াট পেরিয়ে দেখি বিষ্টি ভেজা মাঠ এলিয়ে আছে। ইচ্ছে হল

মাঠের উপর দিয়ে একবার হেঁটে যাই। তুমি তো জানো মা, ভেজা মাঠে হাঁটতে আমার কি রকম ভালো লাগে! ভাবলাম, একবার হেঁটে তারপর বাজার থেকে খাবার আনব। অর্ধেকটা যাবার পর দেখি পথ আটকে আছে মরা খালটা। সেখানে মাচার উপর বসে একটা ছেলে তার বাবার জাল পাহারা দিচ্ছে। আমাকে দেখে বলে, ও বাবু একটু বোস না—আমি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে মাঠে বাবাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি বললাম, তাড়াতাড়ি আসবি—

যাব আর আসব! ছুটে চলে গেল সে।

আমি উঠে বসলাম মাচার উপর। মাথার উপর তালপাতার ছাউনি। তলা দিয়ে জল যাচ্ছে। কলকলিয়ে ছলছলিয়ে। কি মিষ্টি শব্দ। ধারে-ধারে বক বসে আছে। এখানে সেখানে কাদা-খোঁচা। ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি পাখি-পাখালি মাঠভরা সবুজ। নীল আকাশটা হঠাৎ বুঝি নৌকোর পালের মতো বাতাসে ফুলে উঠেছে।

বসে থাকতে-থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!

সুশান্ত বলতে গিয়েও থেমে যায়, তুমি তো জান না মা সারারাত আমি ঘুমোই না। সেই অনাছিষ্টির পাখিটার জন্যে সারারাত জেগে থাকি আর সকাল হলেই ঘুম পায়।

থাক। হৈমবতীর গলায় নিস্পৃহতা, আর শোনার দরকার নেই!

বাঃ-রে, সবটুকু না-শুনলে বুঝবে কি করে!

হৈমবতী চুপ করে থাকে।

ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখি, সদরে বসে আছি। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন বাবা। আমি তার দিকে তাকাতে বললেন, আমাকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারলে না তো! আমি এখন কলকাতাতেই আছি।

বাবা! হৈমবতী অবাক হয়ে সুশান্তর মুখের দিকে তাকায়,

স্বপ্নে যাকে দেখলি কি করে বুঝলি তোর বাবা ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী এ বাড়িতে তো তার একখানা ফটোও নেই !

তিনিই তো বললেন। আমি সদরে বসে ছিলাম। একজন ভদ্রলোক এসে বললেন, এটা কার বাড়ি ?

অপরিচিত লোক। উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিল না তবু বললাম, আলাউদ্দিন খিলজির বাড়ি !

ভদ্রলোক বললেন, এখানে গৌরমোহন সান্যাল থাকেন না ?

গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম, থাকেন। এখন নেই। ষ্টেশনে বেড়াতে গেছেন। কখন ফিরবেন জানি না।

ও। শুনে ভদ্রলোক দমে গেলেন। তারপর ইতস্তত করে বললেন, তা' হৈম—হৈমবতী এখন কোথায় ? এখানেই থাকে তো ?

থাকে। মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

সারাবাড়ির গায় চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এখন আছে নাকি ভিতরে ?

বললাম, টিউশনি করতে গেছে।

কোথায় ?

পাশের ষ্টেশনে।

কখন ফিরবে ?

তার তো ঠিক নেই। তবে আটটার ট্রেনেই আসবে।

দেরি হয় না ?

দেরি হবে কেন ? তার তো দেরি হবার মত কোন জায়গা নেই।

তুমি তার কেউ হও নাকি ?

আমি তার ছেলে।

তাই নাকি ! ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন, তবে তো আমি তোমার বাবা হই।

খোকা। হঠাৎ হৈমবতীর গলার স্বর ভারি হয়ে গেল, তোমার বাবা সিগারেট খান না !

তা'হবে। তবে স্বপ্নে তো মা সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে থাকে! সবটুকু কি আর সত্যি থাকে। তাহলে আর স্বপ্ন কিসের?

আমাকে চিনতে পার? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

না তো। মাথা নাড়লাম আমি, দেখিইনি কোনদিন আপনাকে'

দেখবে কি করে! ভদ্রলোক বললেন, তোমরা তো কেউ চাও নি আমাকে' তা' ছাড়া তোমার দাদামশাইয়ের বাড়িতে আমার জায়গা হবে কি করে!

আমি বললাম, হবে না কেন বাবা?

কি করে হবে? সারাবাড়িতে ক্যাক্‌টাস্‌ বসিয়েছ। সারাক্ষণ কাঁটা বেঁধে! কাঁটাকে আমার বড্ড ভয় খোকা।

আমি চুপ করে রইলাম মা।

এখানে-সেখানে অর্কিড আর পোর্টালুকা ঝুলিয়েছ। বাবা অভিযোগ করলেন, চলতে ফিরতে গায় লাগে। আর যে-টুকু ফাঁকটাক আছে সেখানে বদরি আর বুলবুলির খাঁচা বাতাসে ঝুলছে। আচমকা হেসে উঠলেন তিনি, এর মধ্যে তোমাদেরি জায়গা হয় না, আমি কোথায় থাকব! বাড়িখানাকে তো দেখছি চিড়িয়াখানা আর বোটানিক্যাল গার্ডেন বানিয়ে তুলেছ!

আমি চুপ করে রইলাম। কি যে উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ বাদে বললাম, বদরিরা কি চমৎকার শিস দেয় বাবা। বললে বিশ্বাস হবে না, বুলবুলির শিস শুনে সিলোইর্জিনি অর্কিডের ঘুম ভাঙে। জোৎস্নারাতে ওরা গন্ধ ছড়িয়ে কথা বলে। আপনি যদি এখানে থাকেন আপনার ভালো লাগবে। ওরা কারো অনিষ্ট করে না। সংসারের ভালো-মন্দে থাকে না—

ভালো-ভালো। বাবা বললেন, ওই সব নিয়ে থাক তোমরা। তোমরা কি আর আমাকে চাও?

সত্যি আমরা তোমাকে চাই। বাবাকে তুমি বললাম আমি। তোমাকেই আমাদের সব চেয়ে দরকার। খেটে-খেটে মায়ের শরীর

ভেঙে গেছে। চুল সাদা হয়ে আসছে। চোখে কালি পড়েছে। সব সময় বুক ধড়ফড় করে। মা আর কতদিন খাটবে! আমার চাকরি নেই। কাঁড়ি-কাঁড়ি দরখাস্ত করেও একটা চাকরি জোঠাতে পারছি না। বসে থেকে আমারও বুঝি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি এলে আমাদের সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে। আমরা সুস্থ হয়ে উঠব।

হঠাৎ বাবা বললেন, আমি যাচ্ছি।

আমিও বাবার পিছনে চললাম।

একটু এগিয়ে বাবা বললেন, চমৎকার গোলাপ তো—নাম কি?

আঙ্গরীন্ অব্ সুইডেন্।

বাঃ, চমৎকার চারটে সাদা গেরোবাজ পায়রা বুঝি গা-ঘেঁষে জড়োসড় হয়ে বসে আছে। তোমার হাতের লাগানো বুঝি?

আমি খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলাম।

কাজের ছেলে তো তুমি!

বাবার প্রশংসা শুনে হাসতে গিয়ে মনে হল বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছি না তো!

তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন বাবা? চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

বাবা আবার হাসলেন।

আমি বললাম, বাবা, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন!

কী রকম অদ্ভুত ব্যাপার ভাব দেখি। উত্তেজনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি ছেলেটা আমার পাশে বসে আছে। তাকে কিছু না-বলে নেমে এলাম। তারপর সারাটা বিকেল মাঠে-মাঠে ঘুরেছি। বাবাকে স্বপ্ন দেখে পাগল হয়ে গেছিলাম মা। আর মুখ দেখতে না পেয়ে কি রকম যেন হয়ে গেলাম। সারামাঠ চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগলাম, বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—তোমার মুখ দেখতে চাই—মুখ দেখতে চাই—

কথা বলতে-বলতে সুশান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল আর পাগলের মতো বিকৃত আর ভাঙাচোরা গলায় চেঁচাতে-চেঁচাতে নিচে নেমে গেল, বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—বাবা তোমার মুখ দেখতে চাই—

হৈমবতী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

কয়েকদিন উন্মনা হয়ে যায় হৈমবতী। সুশান্তর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না।

সুশান্ত একলা পুকুরের ধারে বসে থাকে। গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কখনো অনসূয়া প্রিয়ংবদার সঙ্গে পুকুরের জলে সাঁতার কাটে। কোথা থেকে একটা বসন্তগৌরি পাখি এনেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিস্ দেয়।

সেদিন দুপুরে হৈমবতী ঘুমুলে সুশান্ত কাউকে না বলে কলকাতায় পাড়ি দিল। অনেকদিন ধরে কর্পোরেশন স্কুলে একটা মাষ্টারির চেষ্টা করছে। কলেজের এক বন্ধুর দাদা কাউন্সিলর। সেই সূত্রে আলাপ। বন্ধুটি অনেকবার চেষ্টা করে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে পড়তে গেছিল। সুবিধে হয় নি। তাই দাদা এদেশে পড়াশুনো হবে না বলে বিদেশে মিলিং শিখতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে অপদার্থ ভাই গম পেষাইয়েব ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কিংবা ক্যান্টিন ম্যানেজ্‌মেণ্টের ওপর ডক্টরেট্ করে ফিরে আসবে। আর কোথাও কোন রাজকন্যার পিতা প্রচুর ব্ল্যাকমানি জমিয়ে রেখেছে সকন্যা উপহার দেবে বলে। অথচ তার থেকে কত ভাল ছাত্র হয়েও সুশান্ত একশ ষাট টাকার একটা মাষ্টাবি জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মায়ের অবসন্ন শরীরের রোজগারে ভাগ বসাতে হচ্ছে'

কাউন্সিলর্ মশাইয়ের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। একঘর লোকের সামনে চাকরির উমেদার হয়ে যেতে লজ্জা করে।

নিজেকে বড়ো ছোট বলে মনে হয়। ভিতরের মানুষটি লজ্জায় জড়োসড় হয়ে থাকে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু লোকের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। এক সময় শেষ অভ্যাগতকে বিদায় দিতে (গণ্যমান্য কেউ হবেন বোধ করি) কাউন্সিলর্ মশাই বাইরে এলেন। ভদ্রলোক গাড়িতে উঠলে সুশান্ত এগিয়ে যায়। এই সুযোগ। নিজেকে সামনে ঠেলে দেয়। মুখে হাসি সাজিয়ে রাখে। সেই হাসিকে আবার বিষণ্ণতা দিয়ে আবছা করে ঢেকে দেয়। মুহূর্তের জন্যে মুখটাকে তুলে ধরে। এসব যেন ধূর্ত আর ভণ্ড কাউন্সিলরের চোখে ধরা পড়ে।

আরে তুমি!

অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি আপনার জন্যে। সুশান্ত তার কথায় উচ্চারণে নিজেকে নৈরাশ্যে বিপর্যস্ত একটা চরিত্র হিসাবে খাড়া করতে চায়।

দাঁড়িয়ে কেন বসতে পার তো! সঙ্কোচ করো না। তুমি আমার ছোট-ভাইয়েব বন্ধু। ছোট-ভাই হও। চল ঘরে গিয়ে বসা যাক। যেতে যেতে কাউন্সিলর্ জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করলেন, দেখ তো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ। সত্যি, অনেক দিন হয়ে গেল কিছু করা যাচ্ছে না তোমার জন্যে—। বোস—। বাড়ির ভিতর থেকে ঘুরে এলেন কাউন্সিলর্ মশাই।

ইতিমধ্যে চা এসে গেল।

নাও চা খাও। চা খেতে-খেতে কাউন্সিলর্ বললেন, তোমার জন্যে বলে রেখেছি এডুকেশন্ কমিটির চেয়ারম্যানকে। ভদ্রলোক দেখা করতে বলেছেন। হপ্তাখানেকের মধ্যে দেখা' কর। হয়ে যাবে বোধ হয়। তবে জানো তো আমাদের কর্পোরেশনের কথা। সেখানে দিনের বেলা রাত আর রাত্রে দিন হয়। বিশ্বাস কর, তোমার জন্যে সিন্‌সিয়ারলি চেষ্টা করছি অথচ তোমার হচ্ছে না। তা, বলে এ্যাপয়েন্ট্মেন্ট্ বন্ধ নেই। কারা পাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আশা পেয়ে সজীব হয়ে ওঠে সুশান্ত, আপনি ভালো করে বলে রেখেছেন তো ?

বলে রেখেছি। তবে কাজের লোক তো—মাঝে-মাঝে গিয়ে মনে করিয়ে দেবে। প্যানেলে তোমার নাম আছে। আফিসারটা বড্ড বেয়াড়া!

সুশান্ত উঠল।

কাউন্সিলরও উঠলেন, আমাকে আবার বেরুতে হবে। কলকাতা মেলার গ্রাণ্ড সাক্সেসের পর আমাদের ম্যানেজমেণ্টে একটা হোটেল খুলব ভাবছি। অবিশ্যি—। তাকে চিন্তিত মনে হল, ইঁদুরের পোস্টমর্টম রিপোর্টের ওপর আমাদের পলিটিক্যাল্ কেরিয়ার্ নির্ভর করছে। আজ সন্ধেবেলা রিপোর্টটা কাউন্সিলর্স ক্লাবরুমের দরজায় টানিয়ে দেওয়া হবে। কপালে কি আছে কে জানে! অবশ্য পাবলিক আমাদের সিন্‌সিয়ারিটিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নি। দু'দিন জল না পেয়ে এত কষ্ট হয়েছে তবু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত হয়নি।

রাজ্যসরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে আন্‌এম্‌প্লয়মেণ্ট সম্পর্কে আমরা কিরকম সজাগ দেখছ তো ? ফুটপাথের এক ইঞ্চি জমিও আমরা ফেলে রাখিনি। হকার্সদের বসিয়ে দিয়েছি। ব্যবসা করে দু'পয়সা করছে। শিয়ালদার চৌহদ্দি জুড়ে দিনরাত্তির বেচা-কেনার বাজার বসেছে। রাসবিহারী—এস্‌প্লানেড্—শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার ভ্যালুয়েবেল্ জায়গাগুলো এতদিনে সত্যি কাজে লাগছে। অনেকে অবিশ্যি কাগজে লিখে বিরোধিতা করছে কিন্তু একথা তো সত্যি : Hunger is greater than anything !

সুশান্তের মনে হয় আজকের চোখে-দেখা কলকাতা বুঝি গ্যালিভারের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ; আর সেই অবসরে লিলিপুটের মতো অসংখ্য হকার বেসাতি নিয়ে তার পা থেকে মাথা অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। মিটার মিলিমিটার জুড়ে হকার শুধু হকার! ঘুম ভেঙে গ্যালিভার অবাক হয়ে গেছিল। কলকাতার ঘুম আর বোধহয় ভাঙবে না।

সুখি রাজপুত্রের মতো সপ্রতিভ কলকাতার বদলে এ কোন লক্ষ্মীছাড়া দারিদ্রের কুৎসিৎ কালিঝুলি মাখা কিম্ভূত কলকাতা!

অথচ কত ছুটির দিন সকালে সুশান্ত দেখেছে ঘুম-ভাঙা কলকাতা সলজ্জ চোখে আকাশের দিকে অপলক। রাত্রেও মিলিত কিংবা নিমীলিত চোখে তারাদের দিকে চেয়ে আছে। সিঁথির মতো এলিয়ে থাকা ধর্মতলার নির্জন পথের দুপাশে গোল্মোরের স্বর্ণাভ-হলুদ কুসুমে মুগ্ধ হয়েছে। হায়, জব চার্নকের লালিত শিশুটি পরিণত হবার আগেই মৃত্যুর ক্রীতদাস হল।

কী হে কথা বলছ না যে? কাউন্সিলর্ জিজ্ঞাসা করলেন।

একটু হাসে সুশান্ত।

দাঁড়াও, তোমাকে একটা চিঠি লিখে দি। প্যাড্ টেনে নিয়ে কাউন্সিলর্ মশাই মাথা নিচু করে লিখে যেতে লাগলেন।

সুশান্ত কাউন্সিলারের দিকে নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইল। তার মন মনে-মনে কথা বলতে থাকে: ডারুইনের বিবর্তনবাদ পিছু হতে সুরু করেছে নাকি! প্রাগিতিহাসের বানর-মানুষ পিথেক্যানথ্রোপাসের চেয়ে বেশি বুদ্ধি কি এই সব জবুথবু কাউন্সিলরদের মাথায় নেই?

সুশান্তর কৌতূহলের ইচ্ছে করে, হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে-ঠুকে মাথার খুলি খুলে ফেলে এই সব পৌর-পিতাদের মস্তিষ্ক মজ্জা পরীক্ষা করে দেখে। হয়তো এদের মস্তিষ্কের কোষে সৌন্দর্য-চেতনার কোন স্নায়ুগুচ্ছ নেই।

সৌন্দর্য! কাউন্সিলরদের সম্পর্কে এই শব্দটা ভাবতে গিয়ে তার বিচ্ছিরি একটা হাসি পেল। ট্রাইসেরাটপ্সের মতো দুর্ভেদ্য চামড়ার বর্ম দিয়ে এদের শরীর ঢাকা। ঘাড়ের ওপর ছাতার মতো ঢেউ খেলান সুদৃঢ় হাড়ের ঘের—মাথায় ভয়ঙ্কর তিনটে তীক্ষ্ণ শিঙ! অনুভূতির পরিসর শূন্য!

এই চিঠিটা চেয়ারম্যানকে দিও!

বাড়িতে যেতে হবে নাকি ?

ক্লাবরুমে দিও। ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন কাউন্সিলার, এতক্ষণ হয়তো রিপোর্ট টানিয়ে দিয়েছে। কি যে হবে বুঝতে পারছি না—

তা' সত্যি, যেখানে ইঁদুর স্যাবোটাজ করে সেখানে আপনারা আর কি করতে পারেন ! সুশান্ত সান্ত্বনা দেয়।

কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামে সুশান্ত। দানবের মত বিশাল এক সভ্যতা স্কাই-স্ক্রাপার হয়ে মাথা তুলেছে। লিমোজেন চ্যাম্পিয়ন ষ্টুডি-বেকারের বহর বুঝি তার হাতের খেলনা। রেডিয়াম ডায়ালের মতো লোভ ঝকঝক করছে তার চোখে।

সুশান্তর ইচ্ছে করে, নখ দিয়ে হিংস্র আক্রোশে এই সভ্যতার মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে দেয়। এত তোমার দম্ভ অথচ একশ ষাট টাকা মাইনের একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পার না। মানুষের লোভ নিয়ে খেলা কর—দরিদ্রের প্রয়োজন মেটাতে পার না।

একটা দেশলাই জ্বেলে সভ্যতার মুখে আগুন দিলে কেমন হয় ! হেসে ওঠে সুশান্ত—কী বোকা সে ! হাসি আর থামতে চায় না। এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসতে থাকে। হঠাৎ মনে হল রাস্তার লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। হনহন করে হাঁটতে থাকে সে। কর্পোরেশনের চাকরির জন্যে কতদিন আর নচ্ছার চেষ্টা চালাতে হবে কে জানে ! একটা নিরাশা বোধ সুশান্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে থেমে গেল সুশান্ত, আরে এই তো সেই ভদ্রলোক ! তাদের বাড়িতে গেছিলেন আর খাবার আনতে গিয়ে সুশান্ত কোথায় চলে গেছিল। সামনে দিয়ে যেতে হবে। বড্ড লজ্জা করছে। কী ফ্যাসাদ ! গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে !

কাঠবেড়ালির মতো ছাইরঙের ডোরাকাটা সোয়েটার পরে দাঁড়িয়েছিল সত্যপ্রসাদ। সুশান্তকে সে দেখতেই পায় নি। মুখ ফিরিয়েই দেখে সামনে সুশান্ত, তুমি এখানে কোথায় ?

সুশান্ত মুখে এমন একটা ভাব আনে যেন সত্যপ্রসাদকে চিনতে পারছে না, মানে—আপনাকে তো—

হো-হো করে হেসে ওঠে সত্যপ্রসাদ, কিছুদিন আগে তোমাদের বাড়ি গেছিলাম বেড়াতে—আর আমার জন্যে খাবার আনতে গিয়ে তুমি ফেরার হয়ে গেলে—মনে পড়ছে ?

মানে দেখুন—সত্যি বলছি—ইচ্ছে করে করিনি। ক্ষমা করবেন—

থাক্-থাক্—। সত্যপ্রসাদ আদর করার ভঙ্গিতে চাপড়ে দেয় সুশান্তর পিঠ।

আরেক দিন যদি আসেন আমাদের বাড়িতে—

আমাকে দেখে ভয় পেয়ে আবার পালিয়ে যাবে না তো ?

হো-হো করে হাসে সত্যপ্রসাদ।

খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এটাকে একটা দুর্ঘটনা বলতে পারেন। আপনি আরেকদিন আসুন।

বলছ ?

সত্যি—

আচ্ছা। যাব একদিন। দিন-টিন দেখে তো যাওয়া হয়ে উঠবে না হঠাৎ একদিন হুট করে গিয়ে হাজির হব। কি বল ?

তাই যাবেন। আপনার সুবিধেমত। একটু চুপ করে থেকে সুশান্ত বলে, যাই 'তা' হলে—

কোথায় যাচ্ছ এখন ?

বাড়ি। সুশান্ত দেরি না-করে বাস ধরে। ভেবেছিল মালতিপুর লোকালটা ধরতে পারবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল ছুটতে-ছুটতে গিয়ে হাতল ধরে লাফ দিয়ে উঠল সুশান্ত।

গেটের সামনে পৌছে সুশান্ত দেখে হৈমবতী সিলভার ওকের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

তুমি আজ পড়াতে যাওনি মা ?

কি করে যাব। বাবা বুড়োমানুষ, তাকে তো একলা রেখে যাওয়া যায় না। তুই না-বলে চলে গেছিস! ঘুম থেকে উঠে দেখি তোর আর খোঁজ নেই। একটা দিন এমনি কামাই হল।

হোক গে। একদিন না-হয় ছুটি নিলে। বাড়ির দিকে চলে গেল সুশান্ত।

হৈমবতী একলা সিলভার ওকের তলায় দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁড়িতে পা দিয়ে সুশান্ত ফিরে দাঁড়ায়, আজ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল মা।

কোন ভদ্রলোক? হৈমবতী অবাক হল, কে?

আরে সেই যে—কি নাম কে-জানে, একদিন সকালবেলা এখানে এসেছিলেন না?

সতুদা?

তাই হবে বোধ করি।

কি বললি তাকে?

বললাম, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। আরেকদিন যদি আসেন আপনি।

কি বলল সতুদা?

একটু কিন্তু কিন্তু করছিলেন তারপর বললেন, যাব একদিন—

ভ্রূ-কুঁচকে হৈমবতী বলে, আসতে বলার দরকার ছিল না কিছু।

বাঃ, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু তাই বললাম। দাদুও তো কয়েক-দিন ধরে বলছেন, দেখা হল না। দেখা হল না। হাই তোলে সুশান্ত, পথের বলা তো নাও আসতে পারেন ভদ্রলোক! যাক গে খেতে দাও মা। আজ কিন্তু দু' কাপ চা খাব।

কেন?

কি জানি এক-একদিন ইচ্ছে করে।

খাবার ঢাকা আছে। চা একবার হয়ে গেছে আবার দাদু এলে সন্ধেবেলা হবে।

সুশান্ত চলে গেল।

গাছপালার ভিতরে একলাই পায়চারি করে হৈমবতী।

সত্যপ্রসাদকে সুশান্ত আসতে বলে এসেছে। না, বললেই ভালো হত। এই ক্লান্ত অচল অসহ্য জীবনে সেই পুরোন হৈমবতী আর বেঁচে নেই। কী লাভ এখানে এসে!

সেকেন্দ্রারাও শব্দটা তার মনের মধ্যে চমকে ওঠে।

আওরংজেব সবে তখন দিল্লী অধিকার করে বসেছেন। সাজাহান কারাগারে। দারা যুদ্ধে হেরে আরো উত্তরে কোথায় ফেরার। এমন সময় খবর হল, সুবা বাংলার শাসনকর্তা সুজা রাজমহলের রাজ-প্রসাদে অভিষেক সম্পন্ন করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষনা করে দিল্লী অধিকার করতে ছুটে আসছেন।

ত্রস্ত আওরংজেব সেনাপতি মীর জুমলা আর পুত্র মুহম্মদকে তিরিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সুজাকে আটাকানোর জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজে আটঘাট বেঁধে আগ্রা থেকে রওনা হলেন।

পথে থামতে হয়েছিল কয়েকবার। বর্তমান আলিগড় সহর থেকে মাইল দশেক পুবে একটা মাঠের মধ্যে তাঁবু ফেলেছিলেন আওরংজেব। সেই থেকে এই পত্তনি। তারপর গ্রাম বেড়ে এখন মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই খানেই চোখ মেলেছিল হৈমবতী। এখানেই সত্যপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয়। হুরমতগঞ্জ আর লটকা কুয়া কত দূর! এ পাড়া-ওপাড়া।

স্মৃতিকে নেড়েচেড়েও সবটুকু মনে পড়ে না হৈমবতীর। অথচ কতোদিনের কথা!

ছেলে ছিল না গৌরমোহনের মেয়েকে তাই পুরুষের মতো করে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। হৈমবতীর খেলাধুলো দৌড়-ঝাপে বাধা দিতেন না। সেই খেলাধুলোর মাঝখানে কি করে যেন দু'জনের মন জানাজানি হয়ে গেল।

একদিন সত্যপ্রসাদ হৈমবতীকে ভূতেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে গেল। দু'জনে তখন বড় হয়ে উঠেছে। মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে সত্যপ্রসাদ বলেছিল, তোমাকে একটা কথা দিতে হবে হৈম।

কী কথা সতুদা ?

বলো দেবে ?

না জেনে দেব কি করে।

ভূতেশ্বরের মন্দির ছুঁয়ে তোমাকে কথা দিতে হবে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

খিলখিল করে হাসে হৈম। হেসে গড়িয়ে পড়ে।

হাসছ যে ? অবাক হয়ে তাকায় সত্যপ্রসাদ।

হাসব না। এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বল তুমি সতুদা! হৈমবতীর হাসি আর থামতে চায় না, বিয়ে পর্যন্ত বাঁচি না মরি তার ঠিক নেই আগে থেকে তোমাকে কথা দেব। আর তা' ছাড়া ধর—,ফিক ফিক করে হাসে হৈম, কথা-টথা দিয়ে শেষকালে তুমি যদি আর কাউকে বিয়ে কর সতুদা ?

আমি মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

তা'হলে আমিও করছি।

এমনি একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার ঘটেছিল। হৈম তাকে অল্পবয়সের ছেলেখেলা বলেই মেনে নিয়েছিল! সত্যপ্রসাদ কি ভেবেছিল সেই জানে। তারপর হৈমর আর মনেও ছিল না।

কতোদিন হৈমবতী আর সত্যপ্রসাদ নহরের ধারে বেড়াতে গেছে। গরমের দিনে নহরের জলে নাইতে নেমেছে। ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় ইউক্যালিপ্‌ট্যাসের ছায়ায় গা ভিজিয়ে বসেছে। সামনের পরিপাটি লনের পর কুয়াসার মত নিমের ফুল ঝরে পড়েছে। আম গাছের বুকের তলায় বোম্বার জলের লুটোপাটি বারবার কানে এসেছে। জল-মোরগা দম্পতি গাছের মাথায় তীক্ষ্ণ চিৎকার ছড়িয়ে দিয়েছে।

দুজনের নিভৃত কথামালায় এসব বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

সত্যপ্রসাদের ছেলেমানুষি স্বভাব ছিল। লোমরি দেখে তাড়া দিয়েছে ধরবার জন্যে।

হৈমবতী হেসে উঠেছে, তুমি পাগল নাকি সতুদা—দৌড়ে ওকে ধরতে পারবে

দেখি তো। সত্যপ্রসাদ ফাঁকা মাঠে শেয়ালকে তাড়া করে নিয়ে গেছে। তারপর বিফল হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসেছে।

মাঠে লঙ্কা পেকে টুকটুকে লাল হয়ে আছে। লঙ্কার লোভে নানা রাজ্যের টিয়া এসে ক্ষেতে নামে। সহরে ফেরবার পথে সত্যপ্রসাদ আলের উপর দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে টা-ট্যা শব্দ করে টিয়ারা আকাশে পাখা মেলত। আর সবুজ ছায়ায় অন্ধকার হয়ে যেত চোখ। সেই সব আশ্চর্য ছবি এখনো মনে আছে।

একবার এক হেমন্তের দিনে সকালের দিকে হৈমবতী আর সত্যপ্রসাদ নহরের দিকে বেড়াতে গেছিল।

পথে সত্যপ্রসাদ বলল, লি ওর গায়ে ঘা হয়েছে।

কী করবে ?

ভাবছি।

ভেটানারি ডাক্তার দেখাও না।

ভাবছি।

তারপর নহরের ব্রীজের উপর উঠে সত্যপ্রসাদ বলে, তুমি দাঁড়াও হৈম আমি একটু ঘুরে আসি। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল সত্যপ্রসাদ। অনেকখানি এগিয়ে পিছন ফিরে দেখে হৈমবতী। তুমি !

হাসে হৈম, তোমার পিছনে যাচ্ছি—

পাগল নাকি তুমি !

কেন ?

আমি যাচ্ছি সাপের খোলস আনতে—

আমিও যাব। মিটমিট করে হাসে হৈম।

কি যে পাগলামি কর—

তুমি করতে পার আর আমি পারি না? হৈমবতীর মুখে দুষ্টুমি হাসি হয়ে ওঠে।

কক্ষনো না! অত্যন্ত বিরক্ত হয় সত্যপ্রসাদ।

কক্ষনো হ্যাঁ! খিলখিল করে হাসে হৈম।

সবে অমাবস্যা গেছে। সাপেরা খোলস ছাড়িয়ে এখানে-সেখানে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। গায়ে পা লাগলে আর দেখতে হবে না!

কি রকম গোয়ার্তুমি যে হৈমকে পেয়ে বসেছিল কে জানে, আমার পা লাগতে পারে তোমার লাগতে পারে না?

সত্যপ্রসাদ রেগে উত্তর দিয়েছিল, যা'ইচ্ছে তাই কর।

নহর আর বোম্বার মাঝামাঝি সরু অথচ দীর্ঘ জঙ্গলের গভীরতায় ঢুকে পড়ে দুজনে। আগে সত্যপ্রসাদ পিছনে হৈমবতী। মহানিম অমলতাস চিড়্ চিহোড়্ গাছের ডালপালা-মেলা অরণ্যের মধ্যে সাপের খোলস খুঁজতে থাকে সত্যপ্রসাদ।

এলাকার লোকেরা কুকুরের গায় ঘা হলে রুটির সঙ্গে সাপের খোলস মিশিয়ে খেতে দেয়। সকালেই কোথা থেকে খবর জোগাড় করেছে সতুদা। লিও সতুদার প্রাণের দোসর। আফগান হাউণ্ড। হাউণ্ড। কী চমৎকার দেখতে। মাথায় সিংহের মতো সোনালি কেশর ঘাড় বেয়ে নেমে এসেছে। পশমের মত নরম লোমে সারাদেহ ঢাকা। জ্যাঠামশাই—সতুদার বাবা কোথা থেকে এনে দিয়েছিলেন।

শতমূলের জঙ্গলে পথ আটকে আছে। অমলবেতের লতানে ডালপালা অক্টোপাশের মতো হাত বাড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। তারি মাঝ দিয়ে সন্তর্পনে পথ করে সত্যপ্রসাদ। পিছনে হৈমবতী। কতোক্ষণ ধরে খুঁজছে—সাপের খোলসের কোন পাত্তা নেই।

নিঃশব্দ বন। মাঝে মাঝে নহরের ওপার থেকে বাঁদর বাচ্চার কুঁই-কুঁই শব্দ ভেসে আসছে। কখনো ঝরাপাতার উপর ওদের দু'জনের পায়ের শব্দ।

হৈমবতী একবার মাত্র বলেছিল, ফিরে গেলে হ'ত না সতুদা? আমার ভয় করছে।

পিছন ফিরে একবার তাকিয়েছিল সত্যপ্রসাদ। উত্তর দেয় নি।

এক জায়গায় এসে থেমে গেল দু'জনে। সত্যপ্রসাদের পিছন থেকে হৈমবতী দেখে, সামনে অর্জুন গাছের ডালের উপর প্রকাণ্ড একটা সাপের খোলস এলিয়ে আছে। অল্প বাতাসে কাঁপছে। বন-তরইয়ের লতায় সামনেটা হিজিবিজি। সত্যপ্রসাদ এগিয়ে হাত বাড়াতে গেছিল। জামা টেনে ধরে হৈমবতী বলে, আগে একটা লাঠি দিয়ে দেখে নিলে হত না?

কথাটা মনে ধরেছিল সত্যপ্রসাদের। একটা লম্বা ডাল ভেঙে খোলসের দিকে বাড়াতেই গুঁড়ির গর্ত থেকে বিদ্যুতের মতো একটা ফণা হিসহিসিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল দু'জনে। এত বড় সাপ দেখেনি কখনো। বোম্বার কালভার্টের উপর বসে হাঁপায় তারা। হৈমবতীর বুক তখনো কাঁপছে। ভয় কিছুতে যেতে চায় না। শেষে জঙ্গলের পথ ফেলে শাহি-সড়ক ধরে সেকেন্দ্রারাও ফিরে এসেছিল।

ফেরবার পথে হৈমবতী বলেছিল, কি যে কুকুর পোষ!

আচ্ছন্ন সত্যপ্রসাদ কোন উত্তর দেয় নি।

আমি কুকুর একদম পছন্দ করি না।

চোখ তুলে তাকায় সত্যপ্রসাদ।

তোমার কুকুর পোষা দেখে গা ঘিনঘিন করে সতুদা। হরিণ কি ময়ুর পুষতে পার না! কেমন সুন্দর!

হরিণ পাব কোথায়?

নহর ধরে আরো পুবের দিকে এগিয়ে যাও না—কত হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের চাকর রামচাঁদকে নিয়ে যাও! জাল পেতে ধরে দেবে।

সত্যি-সত্যি একদিন কাউকে না-বলে রামচাঁদকে নিয়ে হরিণ

ধরতে গেছিল সত্যপ্রসাদ আরো পুবে ন্হরের জঙ্গলে। যেখানে বরেলির জঙ্গলের সীমা এসে মিশেছে।

বাড়ির লোক সারাদিন খোঁজ পায় না। এখানে সেখানে ছুটোছুটি। খোঁজাখুঁজি কাছে-দূরে। পরদিন সন্ধ্যেবেলা রামচাঁদ বাঁশের ঝোড়ায় শুইয়ে সত্যপ্রসাদকে নিয়ে এল। চারজন দেহাতিলোক তাকে বয়ে এনেছে। হরিণ ধরতে গিয়ে চিতার পাল্লায় পড়েছিল সতুদা। ন্হরের জঙ্গলে হরিণ না-পেয়ে বরেলির জঙ্গলের সীমায় ঢুকে পড়েছিল। রামচাঁদের নিষেধ শোনেনি। ভাগ্যি ভালো বেঁচে গেছে। রামচাঁদের তাড়ায় সরেগেছিল চিতাটা। যাবার সময় কাঁধের কাছটা আঁচড়ে দিয়েছিল।

গৌরমোহন গিয়ে রাগারাগি করতে সত্যপ্রসাদ বলেছিল, আমি কি করবো কাকা, হৈমই তো বলেছিল হরিণ ধরে আনতে। বাড়ি ফিরে গৌরমোহন সেই-কথা বলতে লজ্জায় পরদিন আর মুখ দেখাতে পারে না হৈমবতী।

দাগটা এখনো বোধকরি আছে। ফিসফিস করে হৈমবতী, বড্ড ডাকাবুকো মানুষ ছিল সতুদা। হৈমবতী একবার বললেই হল যে করেই হোক তা করা চাই—

প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। নির্লিপ্ত চোখ দুটো তুলে ধরেছে। দেখছে না কিছুই। ভাবছে। মনে-মনে কেবল ভেবে যাচ্ছে।

তারপর একদিন সতুদা ম্যাট্রিক পাশ করে হঠাৎ কি-যেন-একটা শিখতে বম্বে চলে গেল। যাবার সময় অসুস্থ হৈমবতীর সঙ্গে একবার দেখা করেও যেতে পারল না!

সতুদা, তখন যদি তুমি একবার দেখা করে যেতে—একটিবার যদি বলে যেতে তা'হলে এমন হয়! হৈম সারাজীবন তোমার অপেক্ষা করে থাকত। তুমি তো হৈমকে চিনতে সতুদা! যাবার আগে একবার যদি বাজিয়ে যেতে তোমার হৈম তোমারই থাকত। কবে

একদিন ভূতেশ্বরের মন্দির ছুঁয়ে কি-একটু বলেছিলাম সেইটুকু তুমি আঁকড়ে রইলে। হায় অভাগী হৈমর তো তার এতটুকু মনে ছিল না। মনে যদি থাকত তা'হলে হৈমর কি আজ এমন দশা হয়! তুমিও বিয়ে করলে না। পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আর আমার সারাজীবন চোখের জলে নদী হয়ে গেল।

চোখ মোছে হৈমবতী।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার এল বুঝি হৈমবতীর শরীরের কানায়-কানায়।

মা বলেন, আর তো ঘরে রাখা যায় না।

বাবা বলেন, কি করি বলত, এই বিদেশে কোথায় এখন পাত্র পাই!

তখনই তো তোমাকে বলেছিলাম দেশ-গাঁ একেবারে ছেড়ে দিও না। আসা-যাওয়া রাখা ভাল। শুনলে সে-কথা! পাট চুকিয়ে বসে রইলে—

তবু গৌরমোহন হাতরাশ আলিগড় আগ্রা রায়া মথুরা থেকে পুবে কাশগঞ্জ অবধি ছেলের খোঁজ করলেন। শেষে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই ছেলের খোঁজ পাওয়া গেল। বাবা কলকাতায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। অবশ্য তার আগে ছেলের জ্যাঠামশাই মেয়ে দেখে গেছেন। তার দেখাতেই সব। ছেলে মেয়ে দেখবে না।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে কেমন দেখলে?

ভালো।

নিজের চোখে দেখেছ?

না, তা' অবিশ্যি দেখিনি। তবে ছেলের জ্যাঠামশাই বললেন, সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান বিদ্বান।

তুমি তো গেলে ছেলে দেখতে?

তা' গেছিলাম। গৌরমোহন আমতা-আমতা করেন।

তবে ছেলে না দেখেই ফিরলে—অত খরচ-পত্তর করে গেলে—

তাঁরাও কিছু বললেন না আর আমিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। কি রকম যেন লজ্জা করতে লাগল।

বাবার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত হৈম ঠকেনি। যেমন গায়ের রঙ—তেমনি স্বাস্থ্য। মাথায় একরাশ কালো চুলের এলোমেলো। মস্ত বড় দুটো চোখে পৃথিবীর সমস্ত আলো-অন্ধকার ধরা পড়ত। দু'হাতের মধ্যে হৈমকে যখন জড়িয়ে ধরত কি-রকম-যেন অসহায় মনে হত নিজেকে। অথচ কি যে ভাল লাগত।

গৌরমোহন সান্যাল কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে মেয়ের বিয়ে দিলেন। জাঁকজমক করেই দিলেন।

বিয়ের সময় সতুদার কথা এতটুকুও মনে পড়েনি। আত্মীয়-স্বজন পরিজন সানাই সব মিলে ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্নের মতো ঘটে গেল। বিয়ের পর সুরপতির ভালোবাসায় ডুবেগেছিল হৈম। সত্যপ্রসাদ সেখানে বিঘ্ন ঘটায় নি।

খবর পেল আলিগড়ের রানিদিদির কাছে। সেবার শীতে কলকাতায় এসেছিল তাই দেখা করে গেল হৈমর সঙ্গে।

সতুর খবর কিছু জানিস?

না তো। অবাক হয়ে মুখ তুলে চায় হৈমবতী, কতোদিন যে সতুদার সঙ্গে দেখা হয় না।

সেবেন্দ্রাবাও ফিব তোব বিয়েব কথা শুনে সতু অবাক। কার কাছে আর খোঁজ পাবে। তাই আমাদের বাড়ি এসেছিল। তোর সব কথা শুনে বলল, মেয়েদের কি এতটুকুও বিশ্বাস করা যায় না রানিদিদি?

আমি বললাম, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কাজ আবার কে করল?

সতু বলল, হৈম ভূতেশ্বরেব মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তার বিয়ে হয়ে গেল

জানতেও পারলাম না! এতদিন যে দূরদেশে পড়াশুনা করছিলাম সে তো তার দিকেই চেয়ে—তাকে নিয়ে সংসার পাতব—তাকে সুখে রাখব—গলা ছলছল করছিল সতুর।

আমি বললাম, দুঃখ করে কি আর হবে ভাই। চাকরিতে বোস। সোনার বউ এনে দেব।

হাসল সতু। কথার উত্তর দিল না। একটু পরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার আর কিছু রইল না। ভাবছি, এখন কি নিয়ে বাঁচি—জন্মেই তো দেখছি—পাগলটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রানিদিদি আমি চললাম।

কতো করে বললাম, রাতটা থেকে যা সতু।

থাকল না সে। বলল, দিল্লি যাচ্ছি ইনটারভিউ দিতে—যদি চাকরি পাই বিদেশে চলে যাব। হৈমকে তো ভোলা যাবে না। এখানে থাকলে যন্ত্রণা আরো বাড়বে।

সেই চলে গেল আর ফেরেনি সতু। হয়তো জাহাজে চড়ে সমুদ্দুরে পাড়ি দিয়েছে।

রানিদিদির কাছে এই গল্প শুনে সারাদিন ছটফট করেছে হৈমবতী। কিছুতে মন বসে নি। বিষন্ন একটা অশান্তি তাকে তাড়া করে ফিরেছে।

রাত্রে সুরপতি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাকে আজ এত নিঝুম লাগছে কেন?

শরীরটা বড্ড খারাপ।

কী হয়েছে দেখি—জ্বর-টর নাকি?

কি জানি কি যে হয়েছে!

সারারাত ঘুমোতে পারে নি হৈমবতী। কেঁদেছে। কেঁদেও শান্তি পায়নি। যা' সে ছেলেমানুষি বলে ফেলে দিয়েছে আরেকজন তা-ই বুকে তুলে রেখেছে। কতোদিন ধরে সেই ব্যথার বিষ তার বুক কুঁরে-কুঁরে খেয়েছে। সেই জীবাশ্ম স্বপ্ন কোনদিন আর বাঁচবে

না। জানে হৈমবতী। তাই নিজেকে প্রশ্রয় না দিয়ে তাকে বিদায় করেছিল। সুশান্ত আবার ডেকে আনতে গেল কেন। এবার তাকে কি বলে বিদায় দেবে!

আহা, আজো ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। সেই নীল আকাশ—মালতিলতার মতো ফুলে-পাতায় আচ্ছন্ন করে থাকা শৈশব-কৈশোরের দিন—সেই সেকেন্দ্রারাও সহর—ভূতেশ্বরের মন্দির—চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মাঠ। ইচ্ছে করে—এখনো ইচ্ছে করে ছুঁতে। এখনো রক্তে বাজে তার ডাক। নূপুরের মত মধুর। মনে হয় হাত দিলে ছোঁয়া যায়। যায় কি।

মা।

বিরক্ত হয় হৈমবতী, কি?

কতক্ষণ ধরে অন্ধকারে গাছপালার মধ্যে একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছ—

তা' কি হয়েছে?

একলা বাড়িতে আজকাল বড্ড ভয় করে।

ভয় আবার কিসের?

কি জানি।

আমি যাচ্ছি। তুই যা'—

কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায় সুশান্ত, জানো মা, সেদিন আলো নিভে গেলে দাদুর পেটমোটা সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে হিংস্র জানোয়ার বলে মনে হচ্ছিল—ঘাপটি মেরে বসে আছে। সুবিধে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে এক অসহ্য মুহূর্ত। সমস্ত শরীর নিথর হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল আমি দাঁড়িয়ে থেকে হাটফেল করব বুঝি।

তুই তো জানতিস খোকা ওটা সিন্দুক?

সেইখানেই তো মুসকিল মা। তখন ওসব কিচ্ছু মনে থাকে না! সুশান্ত আর দাঁড়ায় না। নিজের মনে বিড়বিড় করতে-করতে চলে যায়।

চারদিকে তাকিয়ে হৈমবতী অবাক। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পাতা চুঁইয়ে অন্ধকার ঝরে টুপটাপ। টুপটাপ। স্বপ্নে এমন ডুবে ছিল হৈমবতী আলো যে মুছে গেছে টেরও পায় নি।

সুশান্ত সিঁড়ির উপর পা দিয়ে আবার ফিরে এল।

কি রে আবার ফিরলি? হৈমবতী একটু অবাক হল।

আচ্ছা মা। ইতস্তত করে সুশান্ত, তোমার আগের জন্মের কথা কিছু মনে পড়ে?

না তো। হৈমবতী অবাক হয়ে সুশান্তর মুখের দিকে তাকায়।

কখনো মনে আসে?

মাথা নাড়ে হৈমবতী, না, তাও আসে না।

ও। মাথা নিচু করে সুশান্ত আবার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, তোর মনে পড়ে নাকি?

বলতে গেলে তুমি তো বলবে, খোকা তুই বড্ড আজেবাজে ভাবিস আজকাল—

তা' বলব কেন।

সত্যি বলছ?

সত্যি রে সত্যি।

জানো মা, সেদিন দুপুরে মেঘ করে অন্ধকার হয়ে এল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কি রকম আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। আর যেন আগের জন্মের আমাকে দেখতে পেলাম।

বলিস কি খোকা!

সত্যি মা। দেখলাম, ছ'-সাত বছরের আমি বাবার হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছি। গাছপালায় ছাওয়া ছোট্ট একটা বাড়ি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মা বলছে, স্কুলে গিয়ে দুষ্টুমি ক'রো না কিন্তু।

তোর একটা চাকরির দরকার। হৈমবতী মন্তব্য করে।

অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলে, বিশ্বাস করো মা নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

তোর কাজকর্মের দরকার হয়ে পড়েছে। বাড়িতে থেকে থেকে আজেবাজে সব ভাবনা গজিয়ে উঠছে।

নিষ্পলক চোখে সুশান্ত মায়েব দিকে চেয়ে রইল তারপর আচমকা হনহন করে চলে গেল।

হৈমবতী একটু এগিয়ে গেটের কাছে সিলভার ওকের তলায় বেঞ্চের মতো পেতে রাখা কাঠের উপর গিয়ে বসে। সুশান্ত অবিকল যেন সুবপতি। তেমনি ছটফটে তেমনি ছেলেমানুষ। সুরপতি নামের তলায় রক্তমাংসের সেই মানুষটা আজ আর মোটেই স্পষ্ট নয়।

অথচ। ফিসফিস করে কথা বলে হৈমবতী, একদিন এই মানুষটার হাত ধরে সংসারে ঢুকেছিলাম। সে কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে।

বিয়ের পব সুবপতিব সঙ্গে প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ি গেল হৈম কি বকম যেন ভয় করছিল।

সময তখন গোধূলি। গাড়িব ভিতরেও বোদ এসে পড়েছিল। হৈমর দিকে বারবার তাকিযে দেখছিল সুবপতি। প্রথমে তাড় চোখে। তারপব সোজাসুজি। ঘোমটার ফাক দিযে হৈমও দেখছিল। অনুভূতি শিউরে দিচ্ছিল। একপাশে সুরপতি। অন্যপাশে হেনা।

সন্ধ্যের সময় গাড়ি এসে আলো-ঝলমল বাড়ির সামনে থামল। বাতাসে উতরোল সানাই হিন্দোল-বাহারে তান ধরেছে। উৎসবের কল ধ্বনি মেয়েদেব অসংলগ্ন হাসির প্রলাপে—ছোট ছেলে-মেয়েদের হৈ-হট্টগোলে মুখর। একরাশ সুন্দর মুখ এসে গাড়ির ভিতর ঝুকে পড়েছিল। কেউ ডাকছিল, মামি। কেউ বলছিল, বৌদি কি ফর্সা! নবোদ্ভিন্ন যৌবনের সুগন্ধ যেন সমস্ত আবহাওয়ায় মনোহর মায়া বিস্তার করেছিল। তাব সঙ্গে সানাইয়ের সুর কখনো পুলকে উচ্ছল কখনো বিরহে মধুর। মৃদু। এবং মদির।

সব শেষে এলেন ঠাকুমা। কে একজন বলল, ওমা বুড়িকে এখনো আনা হয়নি। বুড়ি সেই দুপুরের পর থেকে ফোকলা মুখে

পান দিয়ে বসে আছে। দু'জন ঠাকুমাকে ধরে নিয়ে এল। তখন কতো বয়েস হয়েছিল ঠাকুমার হৈমবতীর পক্ষে বলা কঠিন। তার শরীরের চামড়া ভাঁজে-ভাঁজে ভেঙে-চুরে কাল অবোধ্য সব আঁকিবুকি করে রেখেছে।

কই দেখি দাদু কাকে চুরি করে আনলে। হৈমবতীর মুখটা ঠাকুমা কাছাকাছি টেনে নিলেন।

কেমন দেখলে ঠাকুমা? ঠাট্টা করেছিল সুরপতি।

ভালো তো দেখিনে ভাই; তবে মনে হচ্ছে তোর ভাগ্যে লক্ষ্মী এসেছে।

আকবরি মোহর দিয়ে মুখ দেখেছিলেন ঠাকুমা। এখনো মুখ-খানা স্পষ্ট মনে আছে। চামড়া কুঁচকে গেলেও হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ তখনো মরেনি।

পরের দিন ছিল ফুলশয্যা। সকাল থেকেই সুরপতির দেখা নেই। মানুষের ভিড়ে হৈমবতী হারিয়ে গেল বুঝি! 'তুতো-বোন আর বৌদিরা সারাদিন-সারাক্ষণ কলগুঞ্জনে মুখর করে তুলেছিল। ক্ষণে-ক্ষণে কুসুমগন্ধ পুষ্পসারের যাওয়া-আসা, সাড়ির খসখসানি, অলীক কৌতূহল ও কৌতুকের ফিসফিস, নতুন পরিচয়ের মধুর হাসি সব যেন আজ স্বপ্ন মনে হয়!

সন্ধ্যের পর আনন্দ যেন আরো জমে উঠল।

ফুলশয্যার রাত। ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়েছিল।

সেই ফুলেরা এখন স্বপ্ন। সেই গন্ধও স্বপ্ন। স্বপ্ন এখন সেই রাত্রিও।

একঘর মেয়ে হৈমবতীকে ঘিরে গল্প করছিল! আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুরপতি। হঠাৎ একসময় আসরে ঢুকে বলল, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। আমি আর বসতে পারছিনা। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছি। কেউ আলো জ্বালিয়ে বিরক্ত ক'রো না।

হৈমবতীর ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে একবার সুরপতিকে জিজ্ঞাসা

করে, কি হয়েছে তোমার ? একটু মাথা টিপে দেব ? সে তো হবার উপায় নেই। হৈমবতীকে আসরে বসে থাকতে হল।

অনেকরাত্রে একঝাক মেয়ে তাকেঁ দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে উদাস কণ্ঠে বলল, যাও ভাই—ভিতরে গিয়ে বুঝে-সুঝে নাও। আমরা আর দাঁড়াতে পারছি না। চোখ ভেঙে আসছে। তাদের গলায় চাপা কৌতুক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হৈমবতী। ফুলের গন্ধ যেন সখির মতো গলা জড়িয়ে ধরেছে। স্তব্ধ হয়ে পালঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী। প্রতি মুহূর্তে সাদর আমন্ত্রণ প্রত্যাশা করছিল। না, অন্ধকার বোবা হয়ে রইল। কোন কণ্ঠস্বর গান হয়ে উঠল না। কোন স্পর্শ শিহরণ এনে দিল না। সন্ত্রস্ত একটা লজ্জা তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। কতক্ষণ আর দাঁড়ান যায়। হৈমবতী ভাবে, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। জড়োসড় হয়ে বিছানায় উঠে দেখে সুরপতি নেই। পালঙ্কের উপর চুপ করে বসে থাকে। ভয় করছিল তার। ভাবছিল দরজা খুলে কাউকে ডাকে। লজ্জায় তাও পারছিল না।

হঠাৎ বাইরে একটা সোরগোল আর কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দিল হৈমবতী। সুরপতি আড়ি-পাতা অপরাধিনীদের হাতে-নাতে ধরে ফেলে হাসছে। বৌদি আর বোনেদের চলে যেতে দেখে বলে, আহা তোমরা একলা চলে যাচ্ছ কেন ? খাটের তলায় আরো দুজন আছে তাদেরও নিয়ে যাও! কতক্ষণ আর অন্ধকারে বসে থাকবে। এক মাসতুতো দিদি আর মামাতো বৌদি পালঙ্কের তলা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সকলে মিলে কথা কলরব আর কৌতুক হাসির পাতাবাহারে মর্মরিত হয়ে উঠল।

সবাই চলে গেল। সুরপতি চারদিক দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিজয়ীর মতো হৈমবতীকে দু'হাতের মধ্যে টেনে নিল। সে কথা ভাবলে এখনো বুকের মধ্যে বিবশ হয়ে যায়। সেই সুখ আর

কতদিন ঝেড়ে-পুছে বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে। রোদ- বৃষ্টি লেগে মরচে ধরে কবে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে!

দোতলায় থাকতেন জ্যাঠামশাই। তিনতলায় হৈমবতী সুরপতি আর ঠাকুমা। পাশাপাশি ঘর। ঘরের সামনে প্রকাণ্ড এক ছাদ। বাড়ি-ঘরে ভরা কলকাতার সেই ছাদটুকুতে সেকেন্দ্রারাওয়ের স্বাদ পেত হৈমবতী। তেমনি নির্জন সন্ধ্যা আর সকাল। তেমনি ছায়া-পড়া পাখি-ডাকা বিকেল। লোকজনের ভিড় একটু কমে-এলে একদিন ঠাকুমা বললেন, কি দিদিভাই কর্তার মন বাঁধতে পেরেছ?

হেসেছিল হৈমবতী, জানিনা তো ঠাকুমা—

জানতে হবে গো দিদিভাই। এ কলকাতা সহর। পুরুষের মন—কে কোথা থেকে ছোঁ মেরে নেয় কে জানে! ঠাকুমার সব কথা স্পষ্ট বোঝা যেত না। তবু সেই ফোকলা মুখের হাসি ভারি মিষ্টি লাগত!

বুড়োবয়সেও ঠাকুরমা নিজের হাতে রান্না করতেন। কী সব আশ্চর্য নিরামিষ রান্না! সেকেন্দ্রারাও থাকতে এমন রান্না হৈমবতী ভাবতেও পারত না। ঠাকুমার কাছেই তার সব রান্না শেখা। এখনও সুশান্ত বলে, তোমার রান্না এত ভালো লাগে মা—যেখানেই থাকি, খিদে পেলে ইচ্ছে করে তোমার কাছে চলে আসি।

বিকেলে ঠাকুরমা বলতেন, দিদিভাই বেলা পড়ে এল চুল বেঁধে নাও। নাপিত-বৌ এসে বসে থাকবে।

সারাটা শীত বুড়ি ছাদে বসে বড়ি দিতেন। আচার বানাতেন। কতো রকম বড়ি দিতেন ঠাকুমা। তার বড়ি দেওয়া দেখে মনে হত কাপড়ে ফুল তুলছেন। হৈমবতীর অনভ্যস্ত চোখে অদ্ভুত ঠেকত।

গাছের সখ ছিল জ্যাঠামশাইয়ের। ছাদ ভরতি গাছ। গরম-কালে সেই গাছের পাশে মাদুর পেতে বসতেন ঠাকুমা।

হৈমবতী একদম মাছ খেতে চাইত না। অভ্যেস ছিল না। ঠাকুরমা জোর করে মাছ খাওয়াতেন। জ্যাঠামশাই যখন উপরে

আসতেন তার চটির শব্দে জানা যেত। জ্যাঠামশাইয়েরও তখন অনেক বয়স। তা' বোধ হয় ষাটের কাছাকাছি। বিয়ে করেন নি।

বৌমা কি করছ? দরজায় দাঁড়িয়ে জ্যাঠামশাই যদি দেখতেন স্বরপতি ঘরে আছে তবে দাঁড়াতেন না। মায়ের ঘরে চলে যেতেন। সেইখান থেকে ডেকে পাঠাতেন হৈমবতীকে, বৌমা তোমাদের হিন্দুস্থানী চা করো দিকি—। হৈমবতী দাঁড়িয়ে থাকত।

কী হল দাঁড়িয়ে রইলে যে।

হিন্দুস্থানী চা কি জ্যাঠামশাই?

তার সেই সরল প্রাণখোলা হাসি হেসে বলতেন, বেশি দুধ দিয়ে আর কি।

সুরপতির সামনেই হৈমবতীকে বলতেন, বাড়ির একটা মাত্র ছেলে গোল্লায় যেতে বসেছে। দেখো তো বৌমা মানুষ করতে পার কি না।

যখন বেরুতেন পকেটে দুটো বড় রুমাল থাকত। শিয়ালদার বাজার থেকে সজনে-ফুল ফুল-কপি কড়াইশুঁটি করলা এই সব নিয়ে আসতেন। তিনতলায় উঠে মায়ের ঘরের সামনে নামিয়ে বলতেন, মা তুমি তো আজকাল পেরে উঠছ না। বৌমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও—তোমার পর তো বৌমাই ভরসা। তারপর নিজের মনে স্বগতোক্তি করতেন, কত ব্যাপারেই তো বৌমার উপর ভরসা।

ঠাকুমা বলতেন, শিখিয়ে দেব বৈকি।

আর কিছু না পার সুক্তুনিটা অন্তত শিখিয়ে দিও—

সাইটিকা বাতে বড্ড কষ্ট পেতেন ঠাকুমা। অমাবস্যা পূর্ণিমা এলে তার ওঠবার উপায় থাকত না। তবু সেই-বয়সে বুড়ি একসঙ্গে তিনটে নেচি সাজিয়ে লুচি বেলতে পারতেন। অনেক চেষ্টা করেও হৈমবতী আজ অবধি সেই কৌশল রপ্ত করতে পারে নি।

জ্যাঠামশাই বলতেন, এ আর কি খাটুনি বৌমা—এরপর তো এই আইবুড়ো ছেলেটার ভার তোমাকে নিতে হবে।

হৈমবতী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, জ্যাঠামশাই বিয়ে করলেন না কেন ঠাকুমা ?

' কি জানি কেন ! ঠাকুমা হাসতেন।

বলুন না ? আবদার করত হৈমবতী।

বড় ছেলে তো— । শেষে ঠাকুমা বলেছিলেন, বিয়ের চেষ্টা কি কম হয়েছিল। তোমার ঠাকুরদা মশাই তো চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। পছন্দ করাতে পারা গেল না। ঠাকুরদা ফেল হলেন। আমিও কম কসুর করিনি। এখন তো তোমার জ্যাঠা বলে, বিয়ে আমার কপালে নেই মা।

সকাল দশটার আগে ভোর হত না জ্যাঠামশাইয়ের। ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস চা আর তিনটে খবরের কাগজ নিয়ে বসতেন।

হৈমবতী দুপুরে খেয়ে কাগজ আনতে গিয়ে দেখত কাগজের গায় দগদগে লাল দাগে বোঝাই—প্রিপোজিসন আর ডেফিনিট্ আর্টিকেলের ভুল বের করেছেন। খবর পড়া থেকে খবরের কাগজের ভুল বের করার দিকেই তার নজর থাকত বেশি।

বারোটা-স-বারোটা নাগাদ জ্যাঠামশাই আড্ডা দিতে বেরোতেন। ফিরতে দু'টো-আড়াইটে। ঠাকুমা বলতেন, গিরিনের জন্যে বসে থেক না। ও পাগল কখন ফিরবে তার কি ঠিক আছে !

এত দেরি করে খেলে যে শরীর খারাপ হবে। ঘোমটায় ঢাকে ফিসফিস করত হৈমবতী।

ঠাকুমা হাসতেন, আমি তো পারিনি বাপু। দেখ তুমি যদি পার।

জ্যাঠামশাইয়ের খেতে-করতে চারটে সাড়ে চারটে বেজে যেত। তারপর ঘুমিয়ে কি একটু গড়িয়ে আবার সন্ধ্যেয় বেরুতেন। রাত্রে বেশি দূরে যেতেন না। পাড়ায় নাগেদের বাড়ি কালি-কেত্তনের আখড়ায় গিয়ে বসতেন। কখনো বেদান্ত আশ্রমে গিয়ে মহারাজদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। রাত্রে তার ফেরবার সময়

হৈমবতীর জানা থাকত না। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে চৌবাচ্চা থেকে জল ঢালার শব্দ শুনে বুঝত জ্যাঠামশাই স্নান করছেন। তারপর গরমকাল হলে ছাদে পায়চারি করতেন।

কখনো বা জ্যাঠামশাইয়ের দোতলার ঘর থেকে এস্‌রাজের সুর ভেসে আসত। মনে হত অন্ধকার বুঝি কাঁদছে। এক একদিন সারারাত বাজাতেন। হৈমবতী সুরপতিকে জিজ্ঞাসা করত, জ্যাঠামশাই আজ ঘুমোবেন না?

কি জানি। ঘুমের মধ্যে উত্তর দিত সুরপতি।

সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়ত হৈমবতী। ঘুম ভেঙে মনে হত কাল রাতের সেই অশরীরী সুর এখনো বুঝি জানালার উপর এসে আছড়ে পড়ছে। কী রকম একটা কান্না মাথা কুটে মরছে।

ঠাকুমা সেবার বললেন, গিরিন আমাকে একবার তীর্থ করিয়ে নিয়ে আয়—

তুমি আবার তীর্থে যাবে কি মা।

কেন রে?

এই বয়েসে পাহাড়ে ওঠা-নামার ধকল তোমার পোষাবে। তা'ছাড়া এমন শীত-কাতুরে তুমি—

তুই তো সঙ্গে থাকবি। সারাজীবন বাড়িতে কাটল—এখন একটু তীর্থ-ধম্ম করব না।

আমারও বয়েস হয়েছে মা। জ্যাঠামশাই বললেন, এককালে হাত-কাটা গেঞ্জি আর আদ্দির পাঞ্জাবি গায় কেদার-বদরি করে এসেছি। সে দিন তো আর নেই মা—আর তা'ছাড়া—

কি রে গিরিন?

সুরপতিকে একলা রেখে যেতে ইচ্ছে করে না। একেবারে ছেলেমানুষ। তারপর বৌমা রয়েছে—কি যে কখন হয় মা—সেবার বরেন্দ্র আর মেজ বৌমার ওই ব্যাপারের পর—

ঠাকুমা চোখের জল মুছলেন।

হৈমবতীর নিজের শ্বশুর ডাক্তার ছিলেন। পোস্টিং হয়েছিল বর্ধমানে। ছেলে-বৌ নিয়ে উঠেছিলেন সেখানে।

সুরপতির তিন-চার বছর বয়েস। একরাতে সাপের কামড়ে দু'জনে মারা গেলেন। আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেল সুরপতি। জ্যাঠামশাই নিজে গিয়ে সুরপতিকে বর্ধমান থেকে নিয়ে এলেন। তারপর থেকে বুকে করে মানুষ করেছেন। এখনো সুরপতির শরীর খারাপ হলে তার উদ্বেগের সীমা থাকে না।

ঠাকুমা তবু শুনলেন না। তোড়জোড় করে তৈরি হতে লাগলেন! তারপর আষাঢ় মাসে বৃষ্টি নামতে বেরিয়ে পড়লেন দু'জনে।

হৈমবতীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঠাকুমা বললেন, ক'টা তো দিন দিদিভাই দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। একটু সামলে-সুমলে নিও।

জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে আশীর্বাদ করে বললেন, অনেকদিন তো বেরুই না বৌমা কেমন ভয়-ভয় করছে!

হৈমবতী বলল, সঙ্গে কাউকে নিয়ে গেলে হত না?

ঠাকুমা বললেন, তীর্থ তো দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়েই করতে হয় দিদি। সুখ ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় তাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

হৈমবতী ঠাকুমার হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিল। সেই বয়েসেও ঠাকুমা বেশ শক্ত ছিলেন। হাওড়ার স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার আগে হৈমবতীর চিবুকের ঘ্রাণ নিয়ে ঠাকুমা বললেন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি বৌমা—সুরপতির ভার তোমার উপর দিয়ে—

ফেরবার পথে একতলায় একজনকে দেখে ভয় পেয়ে গেছিল হৈমবতী। লম্বা একটা মানুষ। অত্যন্ত রোগা আর কালো। গায়ের চামড়াটাও দগদগে। জ্বলজ্বলে চোখ। একমুখ দাড়ি-গোঁফের ভিতর শুধু তার শিরা-ওঠা চোখ দুটো একতলার দমবন্ধ অন্ধকারে

হলদেটে-সবুজ হয়ে জ্বলজ্বল করছিল। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল হৈমবতী আর সুরপতির দিকে। ভয় পেয়ে হৈম প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, কে—কে?

কাকার দিকে একবার তাকিয়ে সুরপতি ত্রস্ত হৈমকে নিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। উপরের ঘরের উজ্জ্বল আলোতেও হৈমবতীর ভয় দূর হতে চায় না। বলে, বিশ্বাস করতে পারছিনা তোমার কাকা!

বিষণ্ণ হেসে সুরপতি বলে, তুমি বিশ্বাস করতে না-পারলেও উনি আমার কাকা।

তোমার কাকা আছেন কোনদিন শুনি নি তো!

এ বাড়িতে থাকেন এই পর্যন্ত—এর বেশি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

তোমরা সবাই এত ফর্সা আর তোমার কাকা এত কালো যে দেখলে ভয় করে।

তা' করতে পারে। তোমার আর দোষ কি—অন্ধকারে কাকাকে দেখলে আমারই ভয় করে। শুনেছি আগুনে ঝলসে অমনি হয়ে গেছে।

ঠাকুমা তো কোনদিন কাকার কথা বলেন নি! অবাক হয় হৈমবতী।

বোধহয় বলতে চান নি।

ছোটবেলা থেকেই কাকা নিজের খেয়ালে চলেন। বাড়ির কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। আর আমরাও কোন সম্পর্ক রাখি নি।

বাব্‌বা, আমার যা ভয় করছিল দেখে! তুমি না-থাকলে এবাড়িতে আমি একলা কিছুতেই থাকতে পারব না।

হেসে সুরপতি বলে, আমি বরং ছুটি নিয়ে নি। ক'টা তো মোটে দিন!

তাই নাও বাপু—নইলে বড্ড ভয় করবে!

ঝিটাকে না-হয় আরেকটু বেশি সময় থাকতে বলে দিও!

সেই রাত্রে সুরপতির বুকের কাছে মাথা রেখে কাকাবাবুর উপাখ্যান শুনেছিল হৈমবতী।

এ্যান্সুয়াল পরীক্ষার আগের দিন সকালে, আসছি বলে কাকা উধাও। একলা নয়। সঙ্গে আরেক জনকে নিয়ে—সেও এই পাড়ারই ছেলে। পড়াশুনো ছাড়া আর সব ব্যাপারে কাকার চৌকস বুদ্ধি। পয়সা-কড়ি কারো হাতে তেমন ছিল না; তাই সম্বলটুকু জমা রেখে বিনা টিকিটে নিরুদ্দেশ এক ট্রেনে চেপে বসল। সারা রাত ভালোই কেটেছিল। ভোরবেলা চেকারের হাতে ধরা পড়ল দু'জনে। বন্ধুটি চেকারের হাত এড়িয়ে সরে পড়ল। চেকার শিকার ফসকে যাওয়ায় মহাখাপ্পা। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কাকার উপর। শাসাতে থাকে, মোঘলসরাই গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কাকুতি-মিনতিতে চেকারের মন গলে না। আবার পয়সা ছাড়াও অন্য কিছুতে আপোষ করতেও নারাজ! অনেক বলা-কওয়ার পর সাধের সিগারেট লাইটার দিয়ে কাকাকে রফা করতে হল। চেকার পকেট হাতড়ে পয়সা-কড়ি যা ছিল তাও নিয়ে গেল। তারপর দু'ষ্টেশনের মাঝামাঝি এক জায়গায় লাইন সারানোর জন্যে গাড়ি থেমে গেলে সেই খানেই নামিয়ে দিল। গাড়ি চলে গেলে দেখা গেল দুপাশেই জঙ্গল। কুলিরা একলা যেতে নিষেধ করল। বলল, আমরা যখন দল বেঁধে যাব তখন আমাদের সঙ্গে যেও। ষ্টেশনে পৌঁছে দেব। তোমাকে একলা পেলে দু'একটা শের দেখা করবার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে কিংবা অনধিকার প্রবেশের জন্যে রেগে গিয়ে ভালুকও চপেটাঘাত করতে পারে।

সারাদিন কুলিদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যের অনেক পরে কাকা ষ্টেশনে গিয়ে পৌছল। অজ্ঞাত অখ্যাত এক ষ্টেশন। প্লাটফর্মে লোক নেই। শুধু একসার দেবদারুগাছ ষ্টেশন পাহারা দিচ্ছে।

হলদেটে-সবুজ হয়ে জ্বলজ্বল করছিল। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল হৈমবতী আর সুরপতির দিকে। ভয় পেয়ে হৈম প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, কে—কে ?

কাকার দিকে একবার তাকিয়ে সুরপতি ত্রস্ত হৈমকে নিয়ে উপরে উঠে এসেছিল। উপরের ঘরের উজ্জ্বল আলোতেও হৈমবতীর ভয় দূর হতে চায় না। বলে, বিশ্বাস করতে পারছিনা তোমার কাকা !

বিষণ্ণ হেসে সুরপতি বলে, তুমি বিশ্বাস করতে না-পারলেও উনি আমার কাকা।

তোমার কাকা আছেন কোনদিন শুনি নি তো !

এ বাড়িতে থাকেন এই পর্যন্ত—এর বেশি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

তোমরা সবাই এত ফর্সা আর তোমার কাকা এত কালো যে দেখলে ভয় করে।

তা' করতে পারে। তোমার আর দোষ কি—অন্ধকারে কাকাকে দেখলে আমারই ভয় করে। শুনেছি আগুনে ঝলসে অমনি হয়ে গেছে।

ঠাকুমা তো কোনদিন কাকার কথা বলেন নি ! অবাক হয় হৈমবতী।

বোধহয় বলতে চান নি।

ছোটবেলা থেকেই কাকা নিজের খেয়ালে চলেন। বাড়ির কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। আর আমরাও কোন সম্পর্ক রাখি নি।

বাব্‌বা, আমার যা ভয় করছিল দেখে ! তুমি না-থাকলে এবাড়িতে আমি একলা কিছুতেই থাকতে পারব না।

হেসে সুরপতি বলে, আমি বরং ছুটি নিয়ে নি। ক'টা তো মোটে দিন !

তাই নাও বাপু—নইলে বড্ড ভয় করবে!

ঝিটাকে না-হয় আরেকটু বেশি সময় থাকতে বলে দিও!

সেই রাত্রে সুরপতির বুকের কাছে মাথা রেখে কাকাবাবুর উপাখ্যান শুনেছিল হৈমবতী।

এ্যানুয়াল পরীক্ষার আগের দিন সকালে, আসছি বলে কাকা উধাও। একলা নয়। সঙ্গে আরেক জনকে নিয়ে—সেও এই পাড়ারই ছেলে। পড়াশুনো ছাড়া আর সব ব্যাপারে কাকার চৌকস বুদ্ধি। পয়সা-কড়ি কারো হাতে তেমন ছিল না; তাই সম্বলটুকু জমা রেখে বিনা টিকিটে নিরুদ্দেশ এক ট্রেনে চেপে বসল। সারা রাত ভালোই কেটেছিল। ভোরবেলা চেকারের হাতে ধরা পড়ল দু'জনে। বন্ধুটি চেকারের হাত এড়িয়ে সরে পড়ল। চেকার শিকার ফসকে যাওয়ায় মহাখাপ্পা। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কাকার উপর। শাসাতে থাকে, মোঘলসরাই গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। কাকুতি-মিনতিতে চেকারের মন গলে না। আবার পয়সা ছাড়াও অন্য কিছুতে আপোষ করতেও নারাজ! অনেক বলা-কওয়ার পর সাধের সিগারেট লাইটার দিয়ে কাকাকে রফা করতে হল। চেকার পকেট হাতড়ে পয়সা-কড়ি যা ছিল তাও নিয়ে গেল। তারপর দু'ষ্টেশনের মাঝামাঝি এক জায়গায় লাইন সারানোর জন্যে গাড়ি থেমে গেলে সেই খানেই নামিয়ে দিল। গাড়ি চলে গেলে দেখা গেল দুপাশেই জঙ্গল। কুলিরা একলা যেতে নিষেধ করল। বলল, আমরা যখন দল বেঁধে যাব তখন আমাদের সঙ্গে যেও। ষ্টেশনে পৌঁছে দেব। তোমাকে একলা পেলে দু'একটা শের দেখা করবার জন্যে এগিয়ে আসতে পারে কিংবা অনধিকার প্রবেশের জন্যে রেগে গিয়ে ভালুকও চপেটাঘাত করতে পারে।

সারাদিন কুলিদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যের অনেক পরে কাকা ষ্টেশনে গিয়ে পৌছল। অজ্ঞাত অখ্যাত এক ষ্টেশন। প্লাটফর্মে লোক নেই। শুধু একসার দেবদারুগাছ ষ্টেশন পাহারা দিচ্ছে।

যে কুলিগুলো পৌছে দিয়েছিল তারাও কোথাও উবে গেছে। শীতের রাত্। তারপর জঙ্গল এলাকায় শীত একটু বেশি। ক্রমশ শীত অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল তাই প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে কাকাকে ঘোরাঘুরি সুরু করতে হল।

একটু দূরে গাছতলায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল। কাছাকাছি বোধহয় মানুষজন আছে এই ভেবে কাকা সেদিকে পা বাড়িয়ে দিল। মানুষ না-থাকলেও আগুন তো পোহান যাবে।

আগুনের কাছাকাছি গিয়ে কাকা দেখে কাপালিকের মতো এক সাধু। লালরঙের কাপড়ে শরীর ঢাকা। চোখ দুটো আগুনের মত লাল। ভয় করছিল কাকার। একে রাত্তির তাতে কাছাকাছি মানুষের চিহ্ন নেই। কাকার মনে হল এখানে সুবিধে হবে না; বরং অসুবিধে হবার সম্ভাবনা সুতরাং সরে যাওয়াই উচিৎ ভেবে পিছু হঠছিল। সাধু বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ডরো মৎ—।

সাধুর ভরাট গলার আওয়াজ শুনে কাকা হতভম্ব। এগোতেও পারে না পেছোতেও পারে না। সাধু কাকার দিকে তাকিয়ে বলল, ইধর্ আ যাও বেটা—। অগত্যা ভয়ে-ভয়ে সাধুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হল। সাধু বলল, বৈঠ্—

আগুনের কাছে বসে আরাম পেল কাকা; অন্তত শীতের হাত থেকে বাঁচা গেল। সাধু তো সারারাত সেই আগুনের সামনে স্থির হয়ে বসে রইল। ইতিমধ্যে কাকা দু'একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল সাধু আড়চোখে দেখে চিম্‌টার খোঁচা দিয়ে বলল, যাওগে কিধর্? শের হ্যায়্ ভাল্লু হ্যায়্—পায়ের্ বাড়ানেসে তুমকো খা লেগা—

সাধুর পরামর্শ মনে ধরল কাকার—রয়ে গেল সেখানে। ভোর রাত্রে শীত যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন সাধু নড়ে-চড়ে উঠল। তারপর ঝোলা থেকে গাজা বের করে নিজেই টিপে-টুপে কলকেতে সেজে টান দিল। দু'একবার অল্প-স্বল্প টেনে লম্বা একটান দিয়ে দম আটকে বসে রইল সাধু। তারপর অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

শেষ আর হয় না। এ যেন দীর্ঘ এক সহস্রফণা সাপ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। কাকা বিহ্বল দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। সাধু তাকে চিমটির এক খোঁচা দিয়ে বলল, কেয়া দেখরহে হুঁ— একদফে খিচ্ কর্ দেখ্ ঠান্ড্ ভাগ্ যায় গা—। কাকার অবশ্য সাহস হল না।

পরদিন কাকার সারাটা সকাল সাধুকে ডলাই-মলাই করে, তেল মাখিয়ে, স্নানের জল তুলে কেটে গেল। বেলা দশটার সময় সাধু তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে বলল, নে পুরি আর ভাজা কিনে খা গিয়ে—

পয়সা পেয়ে কাকা চটপট ষ্টেশনে চলে গেল! ভেবেছিল এই সুযোগে যে-গাড়ি আসবে সেই গাড়িতেই চেপে বসবে। তখন কোন গাড়ির থামবার সময় ছিল না। পুরি আর ভাজি খেতে-খেতে বার কয়েক ষ্টেশনে পায়চারি করে কাকাকে আবার সাধুর কাছেই ফিরতে হল।

সাধু-মহারাজ তাকে আশ্বাস দিল, হিমালয় নিয়ে দীক্ষা দিয়ে একটা হিল্লে করে দেব—

সাধুর হালচাল মোটেই ভালো লাগছিল না কাকার। সারাদিন তো কেটে গেল। সন্ধ্যের আগে সাধুর ধুনি জ্বালাবার কাঠ-কুঠো কাকাকে সংগ্রহ করে আনতে হল। আর সন্ধ্যে হতেই সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেল। একটু পরে সাধু ঝুলি থেকে গাঁজা বের করে জল দিয়ে টিপে-টুপে কলকেটা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে বলল, থোড়া আগ্ লাগা দে বেটা—। আগুন ছোঁয়াতেই সাধু অল্প-স্বল্প টেনে প্রচণ্ড এক টান দিল। বোধ হয় মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছিল। একটানেই বেহুঁস। কাকা আর কি করবে গাছতলায় বসে ঢুলতে লাগল। আগুন ছেড়ে কোথায় যাবে।

চারপাশের গাঢ় কুয়াশার আস্তর যেন প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কুয়াশা ভেদ করে ষ্টেশনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ অনেক রাতে গাড়ির ঘন্টা হল। সন্ন্যাসী হাত-পা এলিয়ে

পড়ে আছে। দূরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কাকা সন্ন্যাসীর ঝুলি আর ট্যাঁক ঘেঁটে পয়সা-কড়ি যা পেল তাই সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ষ্টেশনটা দুঃস্বপ্নের মতো পিছনে পড়ে রইল। তবু কাকার ভয় যায় না। কি জানি সন্ন্যাসী যদি পিছু নিয়ে থাকে। তাই দু-তিন বার কামরা পালটে ভোরে একটা ষ্টেশনে নেমে পড়ল কাকা। হাতেও কিছু নেই। কাকাও ক্লান্ত। বোধহয় বাড়ির জন্যে মন কেমন করছিল। যা পয়সা আছে তা' দিয়ে এক-আধবেলার খাবার জুঠতে পারে। তারপর অনশন। পকেটে টিকিট কেনবার মতো পয়সাও নেই। অতএব কাকা সেখান থেকেই ষ্টেশনের ঠিকানা দিয়ে টেলিগ্রাম করল, মহীন্দ্র একস্‌পায়ার্ড কাম্‌ শার্প। তলায় অপরিচিত একটা নাম।

তার পেয়ে ঠাকুমার কান্নাকাটি। ঠাকুর্দা ব্যাপারটা বিশ্বাস করেনি। বললেন, কোন বাজে লোকের কারসাজি।

ঠাকুমা কাঁদতে লাগলেন, হায়রে আমার কপাল, ছেলেটা বেঘোরে মারা পড়ল। কোথায় ফেলে দেবে—শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম না।

জ্যাঠামশাই দৌড়লেন। ষ্টেশনে নেমে দেখেন কাকা বেঞ্চে বসে পা দোলাচ্ছে।

জ্যাঠামশাই তো অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার মহীন?

মরে গেছি বলে তার করতে হল। না—হ'লে কেউ আসতে নাকি নিতে?

এর মানে? তবু ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি জ্যাঠামশাই।

মানে খুব সোজা দাদা। কাকা বলল, বাড়ি ফেরবার উপায় করতে পারছিলাম না। তাই ভাবলাম, মারা গেছি বলে তার করলে হয়তো লাশ নিতেও কেউ আসতে পারে। তাই তার করেছি।

জ্যাঠামশাই কাকাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। দাদু বাড়ি ঢুকতে

দিলেন না। ঠাকুমা কান্নাকাটি করলেন। বাড়ির দরজা থেকেই কাকাকে ফিরতে হল। বছর পনেরো-কুড়ি তার খবর পাওয়া যায় নি। তারপর একদিন কাকা এসে হাজির। ঠাকুর্দা তখন মারা গেছেন। হঠাৎ মারা গেছিলেন বলে কোন উইল করে যেতে পারেন নি। কাকা খোঁজ-খবর নিয়ে একতলাটা দখল করে বসল।

মা। সুশান্ত এসে দাঁড়িয়েছে আবার।

কি? হঠাৎ বুঝি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে হৈমবতী।

কত রাত হয়ে গেল। কি ভাবছ বসে?

কিছু না তো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

তাই বোধহয়। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম রে খোকা।

আমিও তাই ভাবছি—এমন অন্ধকারে একলা বসে আছ কি করে!

চল্। উঠে দাঁড়ায় হৈমবতী, তোর দাদু কি করছে?

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

দ্রুত পা চালায় হৈমবতী, সত্যি কত রাত হয়ে গেল!

সকালে রাত থাকতে ঘুম থেকে ওঠে হৈমবতী। শীত-গ্রীষ্ম এই একই নিয়মে চলে। ছ'টায় ট্রেন ধরতে হয়। তার আগে চা-খাবার করতে হয়। বাবাকে খেতে দিতে হয়। সুশান্ত ঘুম থেকে উঠলে তাকেও দিতে হয়। না-হলে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়। তারপর নিজে খেয়ে বেরুতে হয়। কাজ করতে-করতে মনে হল, কাল রাত্রে সুশান্ত বলছিল, রাত্রে শীত করে মা! বড্ড শীত-কাতুরে ছেলে। লেপটা বের করে রোদে দিয়ে যেতে হবে। বিকেলে বেরুনোর আগে নিজেই সুশান্তর বিছানায় তুলে দিয়ে যাবে।

সময় আছে এখনো। আবছা একটা আলোর আভাস পুবদিকে দেখা গেলেও পৃথিবী এখন অন্ধকার।

চায়ের জল বসিয়ে গৌরমোহনের ঘরে গেল হৈমবতী। গৌর-মোহন অনেক আগেই উঠেছিলেন। সকালবেলার আলোর দিকে মুখ করে বসে আছেন তিনি। হৈমবতী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা উঠেছ?

অনেকক্ষণ গৌরমোহনের সাড়া পাওয়া গেল না। হৈমবতী ফিস-ফিস্ করে, বাবা আবার বসে-বসে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি!

বাবা—

উঁ। অনেক দূর থেকে গৌরমোহনের উত্তর পাওয়া গেল।

মুখ ধুয়ে এসো। চা হয়ে যাবে এখুনি।

তেমনি চুপচাপ বসে রইলেন গৌরমোহন। হৈমবতী গায়ে হাত দিল, বাবা শরীর খারাপ নাকি? হৈমবতী মনে-মনে ভাবে, মা মারা যাবার পর বাবা যেন কি-রকম হয়ে গেছেন।

বাবা, তোমার শরীর খারাপ নাকি? স্নেহার্ত গলায় প্রশ্ন করে হৈমবতী।

না মা।

তবে?

সকালবেলায় তোর মায়ের কথা মনে পড়ে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। এমনি কাল সারারাত ঘুম হয়নি। ভোরবেলায় স্বপ্নের ঘোরে দেখলাম, তোর মা স্নান করে চুল ছেড়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাকাতে বলল, কেমন আছ? কোন উত্তর দেবার আগেই উত্তেজনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

এতে আর মন খারাপ হবার কি আছে? সবাই অমন দেখে।

না তা' নয়। তবে সারাদিন একলা কাটাই—বড্ড কষ্ট হয় রে! ভাবলাম, তোর মা যদি বেঁচে থাকত তবে—

তবে? হৈমবতী থমকে দাঁড়ায়।

একলা বসে কাটানো যে কি কষ্টের সে তুই বুঝতে পারবি না

হৈম। সুশান্তকে সারাদিনে একবারও পাই না। অদ্ভুত ওর রকম-সকম!

কেন, ও আবার কি করল?

পরশু সকালে বলল, দাদু তুমি সারারাত ঘুমোও নাকি?

বললাম, কোন-কোন দিন ঘুমোই। রোজ কি আর হয় বুড়ো বয়েসে!

সুশান্ত বলল, আমার একদম ঘুম হচ্ছে না।

বললাম, কেন?

ও একটু থেমে বলল, মাঝরাতের জ্যোছনায় যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন দেখি অদ্ভুত একটা সাদা ধবধবে পাখি আমাদের বাড়ির উপর ঘুরে-ঘুরে উড়ছে। ডানায় এতটুকু শব্দ নেই। কতদিন তো এই বাড়িতে আছি—সেই ছোটবেলা থেকে—কখনো এমন পাখি তো দেখিনি দাদু! ও আসবে বলে ভালো করে ঘুমুতে পারি না। মাঝরাত্রের একটু আগে কি পরে আসে—আর এসে কয়েকটা পাক দিয়ে চলে যায়। জানালায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখি!

অন্ধকার রাত্রে আসে না? জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, তাও আসে। একবার তার আসা চাই। তারপর একটু চিন্তিত হয়ে সুশান্ত বলে, আমার মনে হয় ওটা বোধ হয় পাখি নয়।

তবে কি? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কি জানি ঠিক বুঝতে পারি না। অন্যমনস্ক ভাবে অনেকদূর থেকে উত্তর দিল সুশান্ত।

চুপ করে থেকে হৈমবতী উত্তর দেয়, দিন-দিন ওর কি যে মতি-গতি হচ্ছে কে জানে! তিন-তিনটে চাকরি গেল এখন বাড়িতে বসে উদ্ভট সব ভাবছে। ওকে নিয়ে তো আর পারছি না বাবা—তুমি যা হোক একটা ব্যবস্থা কর।

একটু ভেবে গৌরমোহন বলেন, চল মা হৈম আমরা আবার

সেকেন্দ্রারাও ফিরে যাই। সেখানে সুশান্তর একটা চাকরি-টাকরির ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

সেকেন্দ্রারাও আবার কেন বাবা? বিরক্ত হল বুঝি হৈম।

এখানে বড্ড একলা ঠেকে রে। সেখানে চল্লিশটা বছর কাটিয়েছি। লোকেরা চিনতো। মানতো। এখানে কেউ চেনে না। কোন পরিচয়ে লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই বুঝতে পারি না। চল মা সেকেন্দ্রারাও ফিরে যাই। সেখানে বোধ হয় এত দুঃখ থাকবে না। আমরা সবাই বেঁচে যাব। হয়তো আনন্দ শ্রীবাস্তবকে ধরে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটিতে দাদুভাইয়ের একটা কাজও জুটে যেতে পারে। তোরও মাস্টারির অভাব হবে না।

তোমার এ বাড়ি কি করবে বাবা?

থাকুক গে এসব। কি রকম যেন মুখ করেন গৌরমোহন, এসব ভাবনা ভেবে যাওয়াটা মাটি করব না। দিয়ে যাব কাউকে। দেখবে। তোরা যদি কখনো ফিরিস থাক্‌তে পারবি। সেকেন্দ্রারাও গিয়ে উঠতে পারলে দেখবি এত টানাটানি থাকবে না। আমিও যা হোক কিছু করতে পারব। ধনীরাম তো তখনই আমাকে বলেছিল, টাকা দিচ্ছি ব্যবসা কর। আনার আর সাপরির বাগিচা লিজ নাও না? মাথা দোলান গৌরমোহন, কি যে তখন হল— দেশের মোহ সারা জীবন ভুলতে পারি নি। যেখানে জন্মেছিলাম সেখানেই মরতে এলাম। তুই যদি রাজি থাকিস মা তা'হলে বাড়ি ঠিক করতে রামরাম হাজারিকে চিঠি লিখি—

এখুনি তো কিছু বলতে পারছি না বাবা। স্কুল থেকে আসি তারপর কথা বলা যাবে।

স্কুল থেকে আসবি কখন?

আজ তো শনিবার। একটু ভেবে নেয় হৈমবতী, সকাল-সকালই আসব এখন।

স্কুল থেকে আয় তারপর তোকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাব—

আচ্ছা। তরতর করে উপরে উঠে যায় হৈমবতী। সুশান্তর লেপটা রোদে দিতে হবে। চিলে-কোঠার ঘরে কাঠের বাক্সের ভিতর লেপ-তোষক জমা করা থাকে। মায়ের সময় থেকেই থাকে।

শিশিরে ভেজা ছাদে পা পড়তেই হৈমবতীর শরীর শিরশির করে ওঠে। আঁচল থেকে চাবির গোছা তুলে চাবি বের করে চিলেকোঠার দরজা খুলে দিতে ভ্যাপসা একটা গন্ধ বেরিয়ে এল। কতদিন যে এই ঘর খোলা হয় না। কারো তো দরকার হয় না। যার দরকার হত সে নেই।

আরে! চমকে ওঠে হৈমবতী। মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে হেনা শুয়ে আছে।

বাইরে আলো হলেও ঘরের ভিতর আবছা অন্ধকারে হেনাকে দেখতে পেল বুঝি হৈমবতী। আলো-আঁধারের ধাঁধাঁ-জড়ানো ঘরে হেনাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। না কেউ কোথাও নেই। মনের ভুল। হয়তো বা চোখের ভুল। জানালা খুলে দিতে বাইরের আলো ঘরের ভিতর গড়িয়ে এল।

হেনার কথা মনে হতে আনমনা হয়ে যায় হৈমবতী।

একদিন দুপুরের পর থেকে হেনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

হৈম বলল, অত ভাবছ কেন মা—কোথাও গেছে—কলকাতাও যেতে পারে। মাঝে মাঝে যায় তো—এসে পড়বে সন্ধ্যের আগে—

আমাকে তো না-বলে যায় না কখনো। মায়ের মুখে সংশয়ের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তুমি হয়তো ঘুমিয়েছিলে তাই ডাকে নি।

কি জানি। মাকে ভাবনায় ফেলেছিল হেনা।

দুপুর কখন বিকেল হল। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে। সবাই নিঃশব্দে চা খেল। মা ঠাকুর ঘরে শাঁখ বাজাতে গেল। ছ'টার গাড়ি মাঠের ওপার থেকে বেগ কমিয়ে মালতিপুর ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির তিনজনই উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বাবা স্বভাবত চাপা প্রকৃতির

মানুষ। নিঃশব্দে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। মা জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইল। আর হৈমবতী একেবারে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, আসুক আগে তারপর দেখব কি করে আর বেরোয়। লেখাপড়া শেখালেই দেখছি মেয়েদের নিয়ে মুসকিল।

মা আর হৈমবতী দুজনেই শুনেছিল। কিন্তু কেউ উত্তর দেয় নি।

গাড়িটা মালতিপুব লোকাল। এল আর গেল। সেই গাড়ি থেকে হেনা নামল না। তখন আবার পরের গাড়ির জন্যে প্রতীক্ষা। এমনি করে সব গাড়ির. সময় পার হয়ে গেল। তখন সকলে অনিশ্চিত এক ভোরের প্রত্যাশায় রইল। সকালে উঠে যা হোক করা যাবে।

সে-রাতে কেউ ঘুমোতে পারে নি।

সেদিন রাত্রে এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হৈমবতীর কিন্তু ঘুম এসেছিল। আরো আশ্চর্য সারারাতই প্রায় অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল। শেষ রাতে তেষ্টায় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেল।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে আর ঘুম আসে না। হেনার জন্যে দারুন একটা ভয় তাকে ছেয়ে ফেলে। সারারাত মেয়েটা কোথায় যে কাটালো। চিন্তা-ভাবনায় মাথাটা কি রকম ভারি মনে হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাধরা কমতে পারে ভেবে ছাদে উঠে গেল।

অনেকক্ষণ ছাদে একলাই ঘুরেছিল হৈমবতী। তারপর কি মনে করে চিলে-কোঠাব দরজাটা খুলল—আর খুলে আশ্চর্য হয়ে গেল হেনা মাদুর পেতে ঘুমিয়ে আছে।

কী মেয়েরে বাবা। মনে-মনে বলেছিল হৈমবতী, বাড়ির লোকজন চোখের পাতা এক করতে পারে নি—ভেবেচিন্তে মরছে—আর আহ্লাদি মেয়ে এখানে ঘুমিয়ে আছে। গলার স্বর নামিয়ে হৈমবতী বলে, তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে না হেনু। মা-বাবাকে কাঁদিয়ে তুই যে কি সুখ পাস কে জানে। কই উঠলি হেনু? চ নিচে গিয়ে

চা করে দি—। মনে মনে হাসে হৈমবতী, হেনু লজ্জায় ঘুমোবার ভান করে পড়ে আছে। অমনি ওর স্বভাব।

অগত্যা হৈমবতীকে চিলে-কোঠার ভিতরে ঢুকতে হল। মুখে স্বচ্ছ কৌতুকের হাসি, এখনো মেয়ের রাগ। মাদুরে বসে ধাক্কা দিল হেনাকে, এই ওঠ্—

বরফ থেকে তোলা মাছের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে হেনার শরীর। বুকের ওঠানামা নেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কি রকম মনে হল হৈমবতীর। অস্বাভাবিক গলায় সে চেঁচিয়ে ওঠে, মা—বাবা—

ঘরে ঢুকে জানালা খুলে দিতে আলো ছড়িয়ে গেল। নিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী। তাড়াতাড়ি লেপ বের করে কার্নিসের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল।

সব গুছিয়ে বের হতে গাড়ির ঘণ্টা হল। তবু একবার দাঁড়াতে হয় হৈমবতীকে, খোকা—

গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সুশান্ত, কি বলছ মা?

তোর খাবার ঢেকে রেখে গেলাম। এগিয়ে যেতে-যেতে হৈমবতী বলে, দাদুর খবর নিস মাঝে-মাঝে। যাস না কোথাও। বাড়িতে থাকিস। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে দ্রুত রাস্তায় নেমে যায় হৈমবতী। দু'নম্বরে গাড়ি দিলে তো আবার ওভারব্রীজ পার হতে হবে।

সুশান্ত এতক্ষণ একজোড়া টুনটুনি পাখির উপর নজর রেখেছিল। মায়ের ডাক শুনে বাইরে আসতে হল আর ফিরে গিয়ে পাখি দুটোকে দেখতে পেল না। অচিন পাখিরা কখন আসে কখন যায়।

টানা বাতাস বইছে সকাল থেকে। শীত এল বুঝি! নিস্তেজ সূর্যের আলোয় কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত দিনগুলো সব কেমন যেন উদাস। আকাশে আঁচড়ে দেওয়া তুলোর মত স্বচ্ছ একটা মেঘের আভাস জড়িয়ে থাকে। এই সময়টা বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হয় সুশান্তর।

কিছু ভালো লাগে না। মনের অন্ধকারে সিলুয়েট একটা মুখের উঁকিঝুকি লৌকিক ছায়া থেকে ক্রমশ অলৌকিক হয়ে ওঠে। তাকে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি আকাশের সূর্যকে নিভিয়ে দিতে পার না? দাও না চাঁদ-তারা সব নিভিয়ে। অন্ধকারে বসে এই দিনগুলো কাটিয়ে দি।

ধুর। বিরক্ত হয় সুশান্ত, সারাদিন আমি বাড়ি পাহারা দিতে পারবো না মা। পারবো না। পারবো না। পারবো না। বুড়ো দাদু আর বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে আমি জন্মেছি নাকি! অনেক কাজ আছে আমার।

গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে সুশান্ত সিঁড়ির উপর এসে বসে।

কয়েকদিন থেকে সে ভাবছে তার হঠাৎ-দেখা আগের জন্মের সেই বাড়িটার খোঁজে বেরুবে। ব্যাগে কিছু খাবার ঝুলিয়ে নেবে। ব্যস্। বাড়ি খুঁজতে বেশি অসুবিধে হবে না। আশপাশের কোন গাঁয় বাড়িটাকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। স্পষ্ট মনে আছে বাড়ির সামনেটা নারকেলগাছে ঘেরা। রাস্তার উপর ফুল-ভরা সজনে গাছ। দিনরাত সেখানে মৌমাছিদের ভিড়। আশ-শ্যাওড়ার একটা জঙ্গল অনেকখানি জুড়ে আছে। সেখানে একটানা ঝিঁঝিঁর ঝিনঝিন দিনরাত বেজে চলেছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটা নদী। ছবির মতো সুন্দর।

এই তো কয়েকদিন আগের কথা। আকাশে মেঘ করেছে। এপার-ওপার মেঘে ঢাকা। জলঝরা বিকেলে সুশান্ত কি আর করে—খাটের উপর উপুড় হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল—মাঠ যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। হঠাৎ বুকের ভিতর আশ্চর্য একটা অনুভূতি দপদপ করে উঠল—কবেকার হারানো একটা অনুভব বুকের অন্ধকারে চলাফেরা সুরু করে দিল—মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে মাঠ-ঘর-বাড়ি আকাশ-গাছপালা এই জন্মের অস্তিত্ব

লোপ পেয়ে চোখের সামনে আগের জন্মের বাড়ি মা-বাবা-ভাই-বোন সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেল। শুধু সুশান্ত নেই।

সব মনে পড়তে লাগল তার। সুকুর কথা মনে পড়ল। সুকু ছাড়া কোন খেলাই জমতো না তার। সে নদীতে ঢিল ছোড়াই হোক আর শেয়ালকে তাড়া করাই হোক।

সেখানে গিয়ে প্রথমে সুকুর খোঁজ করতে হবে। এ'জন্মের সুশান্তকে আর-জন্মের সুকু বোধহয় চিনতে পারিবে না। কি করে চিনবে! সেই চেহারাটাই যে হারিয়ে গেছে! সুকুর এখন অনেক বয়েস হয়েছে আর তার নিজের নাম কি ছিল সুশান্তর তা মনে পড়ছে না। মাথা চুলকোয় সুশান্ত!

আচ্ছা তখন যদি সুশান্ত বলে, বাড়ির সামনে গর্ত করে খরগোস রেখে শেয়াল ধরা ফাঁদ পেতেছিলাম। শেয়াল ধরা পড়ল না। মাঝখান থেকে আমার ধবধবে সাদা খরগোসের বাচ্চা শেয়াল ধরে নিয়ে গেল। মনে পড়ছে না তোর?

না, আমার মনে পড়ছে না। হয়তো সুকু বলবে, এসব কথার মানে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই তো কবেকার কথা! কে আর মনে রাখে!

তখন সুশান্ত বলবে, সুকু তুই তোর মামাবাড়ি থেকে এসে বলেছিলি, আমার মামাবাড়ির দেশে বাগ্‌দিরা ব্যাঙ দিয়ে মাছ ধরে—

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে সুকু। নিশ্চয়ই একথাটা মনে পড়বে তার। সুকুর যে মাছ ধরার ভয়ানক বাতিক ছিল। এখনো হয়তো আছে।

আমি বললাম, চ' আমরাও ব্যাঙ দিয়ে মাছ ধরি—তারপর তুই আর আমি সারাদিন খুঁজে-পেতে মস্ত একটা সোনাব্যাঙ জোগাড় করে বড়শিতে গেঁথে জলে ফেলে এলাম। ভেবেছিলাম, কাল সকালে প্রকাণ্ড একটা চিতল কি বোয়াল মাছ ধরা পড়বে।

সারারাত উত্তেজনায় কেউ ঘুমোতে পারি নি। ভোরে উঠে নদীর ধারে গিয়ে দু'জনে দাঁড়ালাম।

আমি বললাম, সুতোটা ডাঙায় ছড়ানো কেন রে সুকু ?

তুইও আশ্চর্য হয়ে বললি, কেউ হয়তে-সুতো টেনে মাছ ধরে নিয়ে গেছে।

শেষে সুতো টানতে শুকনো খটখটে ব্যাঙটা ঘাসপাতার আড়াল থেকে হাতে এসে ঠেকল।

তুই বললি, ব্যাটা বোধহয় মাছের ভয়ে সন্ধ্যে থেকে ডাঙায় উঠে বসে আছে।

আমি দুঃখ করে বললাম, এমন আস্ত একটা সোনা ব্যাঙের গন্ধে কত মাছ কাল সন্ধ্যে থেকে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

হঠাৎ সুশান্তর ভাবনাটা এইখানে এসে বিহ্বল হয়ে গেল। মালতিপুরের দশ-বিশ মাইলের মধ্যে কোন নদী নেই তো! তা'হলে........দারুণ একটা সংশয় সুশান্তকে বিকল করে দিল। তা'হলে সে বাড়ি কোথায়।

আরে। হঠাৎ চমকে ওঠে সুশান্ত, এসব ব্যাপার তো তার এ জন্মেই ঘটেছে। সেই যখন নীলমণিগঞ্জে ছিল—তখনই তো সে আর সুকু এই সব কাণ্ড করেছে!

কতক্ষণ হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসে থাকে সুশান্ত। সকালের শিশির শুকিয়ে লতা-পাতায় আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একঝাক রোদ্দুরের মতো শালিক নেমেছে মাঠে। তাদের কথা শোনা যাচ্ছে। একবার মাথা তুলে সুশান্ত সেদিকে দেখে তারপর আবার তেমনি করে বসে থাকে। রোদ এসে লাগছে গায়। তাদের আঙুল দিয়ে সুশান্তকে ছুঁয়ে রয়েছে। উত্তপ্ত। অলস স্পর্শ!

একটু বাদে নীল তিমির মতো একটা প্লেন আকাশ পাড়ি দিয়ে গেল।

তবু বসে থাকে সুশান্ত। জন্মান্তরের ভাবনাটাকে নেড়ে-চেড়ে

পরখ করে। শুধু একটা নদীর জন্যে সমস্ত ব্যাপারটা মিথ্যে হয়ে যাবে!

উঠে পড়ে সে। দাদুর ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়, দাদু—

গৌরমোহন সে-দিনকার খবরের কাগজটা বার চারেক রিভিসন্ দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিস্‌সু্য নেই কাগজে। শুধু বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন!

তোমার চোখ ভালো আছে তো?

এই শীত পড়ার পর থেকে তো দেখছি ভালোই আছি।

প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত, তারপর গুণেগুণে পা ফেলে দরজার কাছে গিয়ে ফেরে, আচ্ছা দাদু—

আবার কাগজে ডুবে গিয়েছিলেন গৌরমোহন, উঁ—

আমাদের এই জায়গাটায় কোন নদী আছে?

নদী! চোখের চশমা খুলে গৌরমোহন বলেন, নদী মানে?

যা পাহাড় থেকে বেরিয়ে সমুদ্র গিয়ে পড়ে।

না তো!

তা'হলে ধরো, এক নদী থেকে বেরিয়ে অন্য নদীতে বা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে তেমন কিছু?

তেমন নদীও তো দেখছি না।

নদী জাতীয় কিছু?

খাল-টাল তো আছে অনেক—তেমন নদীর খোঁজ জানি না।

হুঁ। দাঁত দিয়ে নিজের নখ কাটতে থাকে সুশান্ত।

এই সকালে তোর নদীর দরকার হল কেন?

উত্তর না-দিয়ে চলে যাচ্ছিল সুশান্ত।

গৌরমোহন ডাকলেন, আজকের ষ্টেটস্‌ম্যান্ দেখেছিস?

দাদুর দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে সুশান্ত বলে, এই তো সকাল হল। দেখব এখন পরে—

কাগজটা সুশান্তর দিকে তুলে ধরে গৌরমোহন বলেন,

সিচুয়েশন্ ভ্যাকাণ্টের কলাম্ দেখিস—আজ অনেক চাকরির খবর দিয়েছে—

ধুর্। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে সুশান্ত, ওসব জায়গায় দরখাস্তে কি কাজ হবে দাদু? কর্পোরেশনে মাষ্টারির জন্যে যা দরখাস্ত করেছি একটা কুলি লাগবে বয়ে নিতে—আখেরে মাত্র দুটো ইণ্টারভিউ জুটেছে—

তা'বলে বসে থাকলে তো চলবে না ভাই চেষ্টা করে যেতে হবে।

কি হবে চেষ্টা করে। আমার দ্বারা আর চেষ্টা-ফেষ্টা হবে না। গটগট করে দরজার বাইরে চলে গেল সুশান্ত। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে একবার আকাশের দিকে তাকায়।

সবে শীত পড়তে সুরু করেছে। অদেখা কোন তেপান্তর থেকে বেদে-পাখিরা ডানা মেলে ভেসে পড়েছে। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছে নীলশিরা রাঙামুড়ি সিল্লি-হাঁসের ঝাঁক। আকাশের বিচ্ছুরিত নীল অন্ধকার ভেঙে নিরুদ্দেশের এপারে-ওপারে যাতায়াত করছে।

কাগজটা পাশে রেখে গৌরমোহন রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আজ রোদটা হঠাৎ কি-রকম ভালো লাগছে। মাটি থেকে ওঠা ঠাণ্ডা একটা আভায বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

শীত তা'হলে এল। চোখটাকে দূরবীনের মতো ঘোরালেন গৌরমোহন।

সেকেন্দ্রারাওয়ের কথা মনে পড়েছে। নবেম্বরের শেষের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস উপর থেকে নিচে নেমে আসত। মুসৌরি নৈনিতাল ডোরাডুন সবই তো এক রাতের পথ। সেখান থেকে শীতের বাতাস নেকড়ের পালের মতো নহরের পথ ধরে সেকেন্দ্ররাওয়ে হাজির হত। কী ঠাণ্ডা সেই বাতাস। বাংলাদেশের মানুষ গৌরমোহনের পক্ষে সে শীত সহ্য করা কঠিন। চাকরেরা ঘরে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখত। তবু শেষরাতে পায়ের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

পৌষমাসে ফি-বছর তিন-চারদিন মেঘ করত। বৃষ্টি নামত। তখন আর বাইরে বের হবার উপায় থাকত না। দমবন্ধ ঠাণ্ডা ভারি ওজনের মতো মাথার উপর ঝুলে থাকত। মাথায় মংকি ক্যাপ গায় অলস্টার চড়িয়ে অমৃতপ্রসাদের বাড়ি যেতেন। গৌরমোহনকে দেখে অমৃতপ্রসাদের চাকর ব্রিজ্‌নাথ কফি এনে হাজির করত।

রিটায়ারমেণ্টের পর অমৃতপ্রসাদ বললেন, গৌর কোথায় যাবে সেকেন্দ্রারাও ছেড়ে?

ভাবছি দেশে যাব।

কে আছে সেখানে? চল্লিশ বছর আগে যাদের ছেড়ে এসেছ তাদের কি আর খুঁজে পাবে! গিয়ে দেখবে বুদ্বুদের মতো সব মিলিয়ে গেছে। এখানেই থেকে যাও—জমিজমা সস্তা—খাবার-দাবারও সস্তা। তোফা কাটিয়ে যেতে পারবে। হাতের পাখিটাই ভালো গৌর।

চাকরি করতে এখানে আসা। চাকরি যখন রইল না কি হবে এখানে থেকে? কতদিন থেকে আশা করে আছি রিটায়ার করে দেশে ফিরে যাব। আজ আর মনকে মানাতে পারছি না দাদা!

হুঁ। একটু থেমে অমৃতপ্রসাদ উত্তর দিলেন, সে কথা তুমি বলতে পার। আমার ঠাকুর্দা আলায়োর রাজস্টেটের বৈদ্য হয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। বাবার জন্ম আলায়োরে। আমি জন্মেছি বারাণসীতে। সাবেক আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছেন খোঁজ রাখি নে। এখন গিয়ে হাজির হলে কেউ চিনতেও পারবে না। বিশ-বাইশ বছর বয়েসে একবার কলকাতায় গেছিলাম তখনই অনেক তকলিফ্‌ করে নিজেকে চেনাতে হয়েছিল। তখনকার প্রবীণেরা এখন কেউ বেঁচে নেই। যারা আছে কি আর লাভ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে! এলাহাবাদের ওপারে যে দেশটা বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে আমার এতটুকু চেনা নেই। তুমি চলে গেলে কি হবে তাই ভাবছি। সারাজীবনই প্রায় একসঙ্গে রইলাম—এখন একলা থাকতে হবে।

সেকেন্দ্রারাও ছেড়ে আসার পর প্রথম দিকে বেশ চিঠি লেখালিখি চলত। অনেকদিন আর যোগাযোগ নেই। কয়েকদিন ধরে ভাবছেন আবার চিঠি লিখবেন অমৃতপ্রসাদকে। আর বাংলা ভালো লাগছে না। কেবলই মনে হচ্ছে নির্বাসনে আছেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের সেই মানুষেরা যেন আপনজন ছিল। এখানে থাকা পরবাসে থাকা। এখন মন সব সময় সেইসব আত্মীয়দের মধ্যে ফিরে যেতে চায়।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসে প্রথম যখন বাড়ি ছেড়েছিলেন তারপর সামান্য দু'একবার দেশে ফিরেছেন।

হৈমর মা যদি একটু বাধা দিত তা'হলে এই ভুল করতেন না। সারাজীবন তিনি নিঃশব্দে স্বামীর অনুগমন করে গেলেন। শেষে তিনিও ফাঁকি দিলেন! তারপর থেকে নিঃসঙ্গ এই জীবনে আর স্বাদ নেই। এখন মনে হচ্ছে সেকেন্দ্রারাও চলে গেলেই ভালো হয়। সেখানে ব্রিজনন্দন দড়্গড়্, রূপকিশোর বারহ্সেনি, শিবনারায়ণ কুলশ্রেষ্ট্, কেদারনাথ গুপ্তে যৌবনের সব বন্ধুরা আছেন।

না, চলেই যাবেন। নড়েচড়ে বসেন গৌরমোহন। হৈম আসুক। তার সঙ্গে কথা বলে যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন। আর বাংলা দেশে নয়! সুখের আশায় এসেছিলেন। হিসেব করতে গেলে এখানে এসে লোকসান। শুধু লোকসান। হেমুর জীবনটা গেল। আর হৈম জীবনভোর তুষের আগুনে জ্বলছে। ওদের মা বেঁচে থাকতে এসব এতটা বোঝা যেত না। গৃহিনীর অবর্তমানে এমন একটা শূন্যতা এই ছন্নছাড়া সংসারকে আশ্রয় করেছে যে সেদিকে তাকালে বেদনায় বুক ভরে ওঠে। তার সাধের হৈমর দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারেন না কত সুখে আর স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে মানুষ করেছিলেন! এখন চাকরি আর রান্নাঘর ঠেকিয়ে এতটুকু বিশ্রাম পায় না। কষ্ট হয় দেখলে। সামান্য যা পেনসন্ পান তাতে হৈমকে চাকরি ছাড়তেও বলতে পারেন না। দিনদিন রোগা হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। কণ্ঠার

হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চেহারায় এতটুকু লাবণ্য নেই। সেই ঘটনার পর থেকে মেয়েটার এই অবস্থা—অথচ কত দেখে-শুনে সাধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন!

বাবা।

ভাবনা থেকে জেগে উঠে গৌরমোহন দেখেন, হৈম সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হাতের ব্যাগটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, একলা বসে আছ বাবা?

এত দেরি!—সেই কোন সকালে গেছিস?

বাঃ-রে! হাসে হৈমবতী। ছোটবেলার আদুরে মেয়ের গলা শোনা যায় বুঝি, দেরি কোথায়? আজ তো সকাল-সকাল এসেছি—শনিবার যে—

কি জানি ঘড়ি-টড়ি দিয়ে তো সময় মাপিনে। মনে হচ্ছিল অনেক বেলা হয়ে গেল—হৈমর তো এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

চা করে দেব বাবা।

দিবি? খুশি বেজে ওঠে গৌরমোহনের গলায়, দে দিকি মা একটু গলা ভিজিয়ে নি। এ' সময় একবার চা চিরকালই খেয়েছি! আজকাল আর সময় পাস না বলে বলতেও পারি না! তোর বড় কষ্ট হয়। লোক রাখলে হয় না হৈম?

পয়সা কোথায় বাবা?

এদিক-ওদিক থেকে খরচা বাঁচিয়ে যদি—ইতস্তত করেন গৌরমোহন, তা ইয়ে তুই কি বলিস?

আমি তো পারি না। দেখ তুমি যদি পার। হৈম ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

হৈমকে চা করতে বলে সঙ্কোচ বোধ করেন গৌরমোহন। তা' সঙ্কোচ হয় বৈকি—কোন ভোরে উঠে বেরিয়েছে! এই ফিরল। তিন-শ' পঁয়ষট্টি দিন একই নিয়মে চলে! একদিনও কামাই নেই।

স্কুল ছুটি তো টিউশনি আছে। হায় রে, এই মেয়েকে কেমন করে মানুষ করে ছিলেন গৌরমোহন! বাড়িতে পাঁচ-ছ'-টা চাকর। কী আদুরে মেয়ে ছিল হৈম!

আট-দশ মাইল দূরের গাঁ থেকে ফিরতেন গৌরমোহন। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেখলেন। না, এই সময়ের একটু পরে ফিরতেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়া না-থাকলে গাঁয়ের কোন রহিস আদমি ইক্কা কি টঁঙগায় করে পৌঁছে দিত। সেকেন্দ্রারাওয়ের চারপাশে মাঠ জুড়ে এখন রোদের তাঁবু পড়েছে। বাতাসে কাঁপছে পত্‌পত্‌ করে। হেমন্তের এই সময়টা ভারি ভালো লাগত। নির্জন মাঠের কোথাও একঝাক ময়ূর নেমেছে। এই সময়েই নরম খয়েরি রঙের ফ্লেমিংগো দম্পতিকে মাঠের নিভৃতে দেখা গেছে। গরু কি ঘোড়াকে তাদের ভয় নেই। এই সব দেখতে-দেখতে ফিরতে বেলা হয়ে যেত। বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখতেন কিশোরী হৈম দাঁড়িয়ে।

এত দেরি হল বাবা?

অফিসের কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল রে—

বাঃ-রে, আমি কতক্ষণ থেকে তোমার জন্যে চা নিয়ে বসে আছি।

ঘোড়া থেকে নেমে গৌরমোহন বলেন, দে চা দে—

এই চা নাও বাবা। হৈমবতী এসে দাঁড়ায়।

ভাবনা থেকে জেগে উঠে গৌরমোহন বলেন, চা এনেছিস দে মা দে—চায়ে চুমুক দিয়ে গৌরমোহন স্বগতোক্তি করেন বুঝি, তোর একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

ভাবছি, ছুটি নেব আর পেরে উঠছি না।

রবিবার একটু দেরিতে ওঠে হৈমবতী। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি আলসেমি হয়ে জড়িয়ে ধরে! অন্য দু'জনেরও আজ তাড়া নেই জানে, দেরিতে চা হবে। আর হলেই চা ঘরে এসে হাজির হবে। তাই

তারাও বোধহয় ঘুমের আমেজে ডুবে আছে। আকাশ মেঘে ঢাকা! একটানা বিষ্টি নেমেছে। ঝিরঝিরে বিষ্টি।

কয়েক দিন আগে থেকেই বেতারে সাবধান করা হয়েছিল। অন্ধ্রের উপকূল থেকে একরাশ কালো মেঘ খ্যাপাটে বাইসনের মতো গঙ্গার অববাহিকার দিকে ছুটে আসছে। গতরাত্রে হয়তো এসে পৌঁচেছে। আর ভোর থেকে ঝিরঝির করে জল ঝরার শেষ নেই। বর্ষা এসে হেমন্তের অন্দরে ঢুকে পড়েছে।

বেশ একটু বেলায় হৈম ওঠে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, কত বেলা হয়ে গেল আজ! তারপর সুশান্তর ঘরে উঁকি মেরে বলে, খোকা এখনো উঠিস নি?

চাদরের তলা থেকে সুশান্ত চোখ দুটো একটু বের করে বলে, চা হয়নি মা?

এই তো উঠলাম।

আর আমি ভাবছি তুমি চা নিয়ে আসছ!

সিঁড়িতে পা দিয়ে হৈম বলে, বেশি দেরি হবে না। নিচে এসে মুখ ধুয়ে নে। আমি বাবাকে ডাকি।

একটু পরে বিষ্টি-ঝরা হাড়-কাঁপানো শীতের দিনে হৈমবতী সকলকে চা খেতে ডাক দিল।

বড় একটা কেক এনেছিল হৈমবতী সেটা কেটে সাদা পোর্সিলেনের পাত্রে রেখেছে। একছড়া কলা সোহারা আপেল পেস্তা কাজু সাজিয়ে দিয়েছে। সবদিন পারে না। আজ রবিবার তাই একটু বিশেষ করে আয়োজন করেছে।

খুব খুশি দেখাচ্ছিল সুশান্তকে, তুমি এনেছ নাকি মা?

হ্যাঁ।

আমি কিন্তু দু'টুকরো নেব।

নাও না। গৌরমোহনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হৈমবতী বলে, বাবা তুমি ডিম খাবে না?

ভাবছি আজ আর ডিম খাব না।

এখানে দুধ-দই নেই কি দিয়ে শরীর রাখবে! সেকেন্দ্রারাওয়ে কি রকম খেতে তুমি মনে আছে? হৈমবতী গৌরমোহনকে আরেকখানা কেক তুলে দিয়ে সুশান্তর দিকে এগিয়ে যায়, খোকা তোকে আজ বাজারে যেতে হবে।

এই বিষ্টিতে! সুশান্তর মুখখানা কি রকম হয়ে যায়।

বিষ্টি আবার কোথায়?

তা হলে আরেকবার চা দিতে হবে কিন্তু—

দেব 'খন।

কি আনতে বল? সুশান্ত চা শেষ করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ছাতা কোথায় মা?

দেখ কোথায় আছে।

ছাতা নিয়ে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত।

গৌরমোহন জড়সড়ো হয়ে বসেন, ঠিক সেকেন্দ্রারাওয়ের মতন ঠাণ্ডা পড়েছে।

দরজার বাইরে অন্য কারো গলার আওয়াজ পেয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কেরে খোকা?

সুশান্ত উত্তর দেবার আগে দরজায় সত্যপ্রসাদের মুখ দেখা গেল, আমি।

গৌরমোহন প্লাস-পাওয়ারের চশমাটা কপালে তুলে বললেন, কে?

এগিয়ে এসে প্রণাম করে সত্যপ্রসাদ, আমি—

ভ্রূ-কুঁচকে গৌরমোহন বলেন, চিনতে পারলাম না তো।

হৈমবতী বলে, জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে সতুদাদা।

সেকেন্দ্রারাওয়ের সত্যপ্রসাদ। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান গৌরমোহন।

হ্যাঁ বাবা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে।

মানে, দাদা অমৃতপ্রসাদ ভট্চাযের ছেলে? তুমি কোথা থেকে আসছ এখন সতু?

এখন তো কলকাতাতেই আছি কাকা।

তোমার বাবার খবর কি ?

বাবা। ইতস্তত করে সত্যপ্রসাদ বলে, বাবা তো মারা গেছেন।

মারা গেছেন ? গৌরমোহনের গলার স্বর কেঁপে গেল।

অনেকক্ষণ সেই ঘরে স্তব্ধতা নেমে থাকে।

সত্যপ্রসাদ বলে, তখন আমি বিদেশে। অনেক ঘুরে আমার হাতে চিঠি পৌঁচেছিল। আমি বাড়ি গিয়ে দেখি ফাঁকা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে।

সেইজন্যে তাঁকে লেখা আমার চিঠির উত্তর আমি আর পাই নি। আনমনা হয়ে গেলেন গৌরমোহন। তার বুকের ভিতরটা হু-হু করে। কতদিনকার কত স্মৃতি তুচ্ছ সুখ-দুঃখ সজীব হয়ে ওঠে।

দাদা হাতরাস ষ্টেশনে আমার হাত ধরে বললেন, আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না গৌর। তাই হল। তাই হল। আমাদের আর দেখা হল না! আনমনা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন গৌরমোহন।

সুশান্ত আগেই বাজারে চলে গেছে। ঘরের মধ্যে শুধু হৈমবতী আর সত্যপ্রসাদ।

হৈমবতী বলে, বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বসবো বলেই তো এসেছি। একটু হাসতে চায় সত্যপ্রসাদ, আমি এসেছি বলে তুমি রাগ করনি তো হৈম ?

রাগ করব কেন সতুদা ?

আমি হয়তো আসতাম না। তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা সে-ই আসতে বলল।

ওসব কথা থাক সতুদা। এখন চা খাবে এস।

অসুবিধে হবে না তো ? বেশ ঠাণ্ডা—এক কাপ চা এখন দরকারও বটে—

তা' হলে কফি খাও না। আগে তো তুমি কফি ভালো. বাসতে ? জিজ্ঞাসু হয়ে সত্যপ্রসাদের দিকে তাকায় হৈমবতী।

মনে আছে তোমার ?

হাসে হৈমবতী, মনে থাকবে না কেন ? তুমি বরং বাবার ঘরেই বস আমি কফি করে আনি।

হৈমবতী চলে যাবার পর চারদিকে চোখ ফেলে সত্যপ্রসাদ।

দেয়ালে গৌরমোহনের যৌবনের একটা ছবি। ঘোড়ার উপর বসে আছেন। বোধ হয় সেকেন্দ্রারাওয়ে তোলা। কী স্বাস্থ্য ছিল তখন ! আজকের এই বৃদ্ধের সঙ্গে মিল পাওয়া দায়।

হঠাৎ ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন গৌরমোহন, ক'বছর আগে দাদা মারা গেছেন ?

তা' বছর তিনেক হবে।

তিন বছর ! চেয়ারে বসে পড়েন গৌরমোহন, সে কি আজকের কথা ! অথচ ভাবলে মনে হয় সেদিনের—। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বসে গৌরমোহন বললেন, আমার বয়েস তখন বাইশ-চব্বিশ বছর ওঁর তখনো তিরিশ্ ছোঁয় নি। আমারই এখন ছিয়াত্তর। আমাদের দু'জনকে প্রায়ই আখনুরে যেতে হত। ফিরতে অনেকদিন রাত হয়ে গেছে। তখন বাস ছিল না। ইক্‌কা টঁঙ্গা আর ঘোড়াই ছিল বাহন।

নবেম্বরের বিকেলে ফিরছি দুজনে। জানতাম সন্ধে হয়ে যাবে। তাড়া নেই কিছু। ঘোড়ায় চড়ে গল্প করতে-করতে ফিরছিলাম। বিকেলের মরা আলোয় সবুজ মাঠে ময়ূর নেমেছে। লম্বা হয়ে গেছে তাদের ছায়া। পেখমে রঙের কী বাহার !

মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে। উঁচু-নিচু পথ। পথের দু'পাশে মাঠ-জলা-জঙ্গল। ছত্রোভঙ্গ বকেরা এক-একবার আকাশে উড়ে আবার নেমে পড়ছে মাটিতে।

আমরা সেকেন্দ্রারাওয়ের পথ ধরে মন্থর গতিতে এগোচ্ছিলাম। আমাদের চারপাশে শান্ত এক পৃথিবী।

দিনটা বোধহয় কার্তিকের শুক্লা ষষ্ঠী কি সপ্তমী। দুপুরের পর

থেকেই আকাশে চাঁদ আছে। তাই দিনের পর সন্ধে আসার অবকাশ পায় না। হঠাৎ বুঝি রাত্তির এসে হাজির। মাথার উপর অপরূপ এক আকাশ। হঠাৎ ঘুমন্ত জোছনার আলো ভেঙে-চুরে বুনো হাঁসের দল নহরের নিরাপদ জলে নেমে এল। তাদের সহস্র পাখার শব্দ বিষ্টি হয়ে মাথার উপর ঝরে পড়ে।

আমি আর দাদা একটা অর্জুন গাছের তলায় ঘোড়ার উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম! মনে হল নির্জনতা বুঝি পাখার শব্দে কথা বলে উঠল। ক্ষীণ একটা শীতের বাতাস জোছনার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। দুজনেই বুঝি বিহ্বল হয়ে গেছিলাম।

দাদা বললেন, পৃথিবী কি সুন্দর!

আমি কোন উত্তর দি নি!

তিনি আবার বললেন, চিরকাল এই পৃথিবীতে থাকব না। তবু কখনো-কখনো মনে হয় চিরকাল ধরে এই পৃথিবীতে বুঝি বেঁচে আছি। চিরকাল বুঝি বেঁচে থাকব।

তারপর থেকে যতবার সেই পথ দিয়ে গেছি—আমার কানে স্পষ্ট বেজেছে: পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে আছি। চিরকাল বেঁচে থাকব!

হৈমবতী কফি নিয়ে এল, বাবা তুমি কফি খাবে নাকি?

না। গৌরমোহন কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে হৈমবতী বলে, আজ আর সারাদিন বাবার মনে শান্তি নেই। শুধু জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাববেন! জ্যাঠামশাইয়ের ভরসায় সেকেন্দ্রারাও ফিরে যেতে চাইছিলেন। খুব নিরাশ হলেন।

তাই নাকি?

ঠোঁট উলটে হৈমবতী বলে, বড্ড দমে গেছেন বাবা।

দমবার কি আছে? ইচ্ছে করলে তো আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারেন। আমি তো যাযাবর হয়ে পথে-পথে বেড়াচ্ছি। উনি থাকলে ভালো হয়। বাড়িটা ভালো থাকবে।

আরেক কাপ কফি দেব সতুদা ?

আমার আপত্তি নেই। তবে একটু পরে দিও। হ্যাঁ, ভালো কথা হেনুর খবর কি ? বিয়ে হল কোথায় ?

ফ্যাকাসে একটা হাসির আভাস হৈমবতীর মুখে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, হেনুর তো বিয়ে হয়নি সতুদা।

তবে সে এখন কোথায়—দেখা করতাম একবার—হয়তো আমাকে চিনতেই পারবে না হেনু।

কি করে দেখা করবে সতুদা! আঁচল দিয়ে চোখ মোছে হৈমবতী, সে তো মারা গেছে।

মারা গেছে! কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে নামিয়ে কৌতূহলী চোখ দুটো হৈমবতীর মুখের উপর ধরে রাখে সত্যপ্রসাদ।

হেনাকে তোমার মনে আছে সতুদা ?

মনে নেই আবার—ছোট্ট মেয়েটা নহরের ধার থেকে রসভরি তুলে মুখে ফেলে পিটপিট করে হাসত!

একদিন আয়নায় নিজের মুখ দেখে হেনু বলেছিল, আমার বিয়ে হবে না দিদি—

কি যেন করছিলাম আমি। বললাম, কেন রে ?

আমি যে বড্ড কালো দিদি!

ধুর্।

সত্যি। সবাই তাই বলে। হাতরাসের বাড়ুয্যে মশাইয়ের ফর্সা মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছিল, কি কালো মেয়ে বাবা।

কালো! অবাক হল সত্যপ্রসাদ, হেনুকে তো আমার কোনদিন কালো বলে মনে হয় নি। নকনকে সবুজ বলে মনে হত।

সেই থেকে কি রকম একটা সংশয় হেনুর মনে জমা হয়েছিল। কোথাও নেমন্তন্নে যাবার আগে সেজেগুজে এসে আমাকে বলত, দেখতো কেমন দেখাচ্ছে ?

আমি বলতাম, সুন্দর!

হেনু উত্তর দিত, সুন্দর না ছাই। কালো আবার সুন্দর হয় নাকি!

গাল টিপে দিয়ে বলতাম, এই কালো মেয়ের ভালোবাসার জন্যে কতজন পাগল হয় দেখিস!

ধ্যেৎ! ভেংচি কেটে সরে যেত হেনু।

বাবা সেকেন্দ্রারাও থেকে রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর ছিলেন। তারপর পাকিস্তান হলে সব হারিয়ে প্রায় যথাসর্বস্ব দিয়ে মালতিপুরে এই বাড়ি কিনলেন। হেনু তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য যেন উবছে পড়ছে।

মা বললেন, এবার বিয়ে দিয়ে দাও।

মায়ের তাগিদে অস্থির হয়ে বাবা খোঁজ-খবর নিতে সুরু করলেন। কতজন দেখতে আসে। কালো বলে কেউ পছন্দ করে না। পাত্রপক্ষের সামনে সেজেগুজে হাজির হতে আপত্তি করত হেনু।

ওমা সে কথা বললে কি হয়! মা আদর করে হেনুকে কাছে টেনে নিতেন, অমনি করেই সবার বিয়ে হয়—

মাথা নাড়ত হেনু, যাব না মা। বারবার এই রকম লোক হাসাতে ভাল্লাগে না।

লোক তুই পেলি কোথায়! আমরা তো সব নিজেরাই—

বড্ড খারাপ লাগে মা! সারারাত ঘুমোতে পারি না—নিজের এত হেনস্তা হয়—

হেনস্তা আবার কি। এমনি ধারাই তো চলে আসছে—আমার মা—তার মা—

সে তোমরা পারতে—আমি পারছি না। বিকেলের রোদে হেনুর চোখ ছলছল করত!

মা হেনুর চোখ মুছিয়ে দিতেন, অমন করতে নেই!

আবার কেউ এলে মা হেনুকে ধমক দিয়ে বসাতেন। হেনু রাগ করত! জোর করত না। আমি সাজিয়ে দিতাম। সময় লাগত একটু।

হেমু বলত, অত ভালো করে সাজিয়ে কি হবে! চেহারার যা' ছিরি—

এই রকম দেখা-শোনার পালায় হেমুকে একজনের পছন্দ হয়ে গেল। দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে বউ মরেছে। চেহারাটা ভালো। অন্তত হেমুর পছন্দ হয়েছিল।

বাবার সন্দেহ ছিল দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র বলে হেমু হয়তো অপছন্দ করবে। নিজের সম্পর্কে হেমুর এমন অবিশ্বাস জন্মেছিল কেউ যে তাকে পছন্দ করতে পারে এমন বিশ্বাস আর ছিল না।

আমি ছুটে গিয়ে খবর দিলাম, হেমু একটা খবর আছে—কী খাওয়াবি বল?

তেমন-তেমন খবর হলে যা' চাইবি! হেমুর মুখে দুষ্টু হাসি।

সত্যি তো? হেমুর হাত আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলাম।

সত্যি—মাইরি!

তোকে পছন্দ হয়েছে! এই মাত্র বাবার কাছে চিঠি এল।

কি জানি বাবা। একটু আনমনা হয়ে হেমু বলে, আমাকে কি কারো পছন্দ হবে!

হবে—হবে—হবে। চেঁচিয়ে উঠলাম আমি আর হেমুকে বাগানে টেনে নিয়ে গেলাম।

সবে তখন শরতের সুরু। ল্যাণ্টেনা গাছের ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম দুজনে। রক্তবিন্দুর মতো অসংখ্য ফুলে গাছ ভরে আছে। আমি একটা ফুলের গোছা ভেঙে হেমুর খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে বললাম, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে!

হেমু আমাকে জড়িয়ে মুখ লুকোল বুকে। আমি হেমুকে জড়িয়ে চুমু খেলাম। তার মাথায় হাত বোলালাম। দুজনে গভীর সুখে কাঁদলাম। আমার সুখ তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হেমুর সুখ এখন যেন আমারই সুখ!

সন্ধের পর ঘরে ফিরলাম আমরা।

মা বললেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

এই একটু ঘুরে এলাম বাগান থেকে। উত্তর দিলাম আমি।

মা বললেন, চায়ের দেরি হয়ে গেল আজ।

অনেকদিন পর আমাদের চায়ের আসর হাসি-খুশিতে ভরে উঠল।

মায়ের মুখে হাসি। বাবার মুখে হাসি। আমার মুখে হাসি। হেনুর মুখের হাসিও সেদিন চাপা ছিল না। শুধু মাঝে-মাঝে মধুর লজ্জা তার হাসিকে ঢেকে দিচ্ছিল।

মা বললেন, দেখ বাপু এই আমার শেষ কাজ—সবাইকে নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু—

বাবা হাসি-হাসি মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মা বলে চললেন, এবার আগে থাকতে সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হবে। একলা মানুষ তুমি, এখানে-সেখানে নেমন্তন্ন করতে যাবে। কেনাকাটা সবই এক হাতে করতে হবে। তা' হ্যাঁ-গা মাসের কথা-টথা কিছু লিখেছে ?

বাবা বললেন, না সে সব কিছু লেখেনি। বোধহয় আমাকে গিয়ে সব ঠিক করে আসতে হবে।

একটা ভালো দিন-টিন দেখে যাও।

দেখি। বাবার গলার স্বর একটু ভারি হয়ে গেল, ভাবছি কি আবার চেয়ে বসবে! হৈমর বিয়ের সময় চাকরি ছিল। দরকারে চাইলে ধারও পেতাম। এখানে চেনেই না কেউ।

মা একথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না!

আমি বললাম, আমার কিছু টাকা আছে বাবা, সেটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নাও—

বাবা আমার দিকে তাকালেন।

মৃদুকণ্ঠে বাবাকে বললাম, তুমি তো আমার জন্যে কিছু কম কর নি!

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। অঘ্রাণের প্রথম দিকে বিয়ে। বাবা পাকা দেখতে যাবেন। মেসোমশাই আর মেজমামা সঙ্গে যাবেন।

হঠাৎ ছেলের বাড়ি থেকে একটা চিঠি এল—ছেলে নিরুদ্দেশ। সম্ভবত সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। অতএব বিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই!

বাড়ির আর সকলের সঙ্গে হেনুও খবরটা পেল। আমাকে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করল, দিদি আমার জন্যেই সন্ন্যাসী হয়ে গেল নাকি?

কেন, তোর জন্যে সন্ন্যাসী হবে কেন?

আমি যে বড্ড কালো!

ধুর পাগলি! আমি ধমক দিলাম তাকে।

কি জানি! নিজের মধ্যে ডুবে গেল হেনু। কালো রঙটাই তার মনের ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াল। বোধহয় ভাবত যে কালো মেয়েকে বিয়ে করতে হবে সেই ভয়ে পাত্র সন্ন্যাসী হয়ে গেল!

বিয়ে ভেঙে যাবার পর কি যে হল হেনুর কে জানে! আমি বাবা-মা কেউ ওর মনের নাগাল পেতাম না। ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিল!

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর বাবা আবার হেনুর বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে সুরু করলেন। কোন রকম দেখা শোনার আগেই—

সুশান্ত এসে দাঁড়ায়, মা—

বাব্বা, কতক্ষণ বাজারে গেছিস! সুশান্তর হাত থেকে বাজারের থলিটা নিয়ে হৈমবতী বলে, সুশান্তর সঙ্গে গল্প কর সতুদা—আমি ওদিকে গোছাই গে। আজ কিন্তু তোমাকে খেয়ে যেতে হবে—

হৈমবতী বাইরে যাবার পর সত্যপ্রসাদ সিগারেট ধরায়। চল সুশান্ত তোমাদের বাড়িটা একটু ঘুরে দেখা যাক—

এই বিষ্টিতে!

ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে নাকি তোমার?

একটুও না।

চল তবে তোমাদের গাছপালার ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসি। দু'জনে বাইরে নেমে গেল।

একটু বাদে বৃদ্ধ গৌরমোহন এসে দরজায় দাঁড়ালেন, সতু চলে গেল নাকি! নিজের মনে স্বগতোক্তি করেন, কি জানি সত্যপ্রসাদ হয়তো চলে গেল! সত্যপ্রসাদকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যে ছটফট করছিলেন। না পেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন।

দাদা আর বৌদি তখন থাকতেন যমুনার ধারে একটা গাঁয়ে। নাম সোনেঙ্গ। অমৃতপ্রসাদ তখন সোনেঙ্গ হাই স্কুলের একজন এ্যাসিটাণ্ট্ টিচার। কয়েক বছর হল স্কুলে ঢুকেছেন। কাশীর এক অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করে এনে সংসার পেতেছেন। আশ্চর্য সুন্দরী ছিলেন বৌদি! ডালিমের দানার মতো টলটল করত গায়ের রঙ। দেবীপ্রতিমার মতো মুখ। স্নেহে-লাবণ্যে ঢলঢল। তার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দেশ থেকে ফেরার পথে-বেড়ান এই ছেলেটিকে স্নেহ দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন।

চাকরির জন্যে তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গৌরমোহন। সেই সময় একদিন সাইকেলে যেতে-যেতে মথুরার পথের মাঝখানে থেমে গেলেন অমৃতপ্রসাদ, বাঙালি নাকি?

গৌরমোহনের চেহারায় পোষাকে বাঙালিত্ব একটু বেশি রকমে প্রকট ছিল। সময়টা ছিল আধির আর সে সময় গৌরমোহন রাস্তায় বেরিয়েছেন কান আর মাথা না ঢেকে। অবাক হয়ে অমৃতপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরমোহন বললেন, হ্যা বাঙালি।

তা' হলে চটপট গাড়ির পিছনে উঠে পড়। গৌরমোহনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমৃতপ্রসাদ পিছনে বসিয়ে এক কাপড়ের দোকানে গিয়ে হাজির। সেখানে লম্বা বহরের মলমল কিনে গৌরমোহনের কান আর মাথা-জোড়া পাগড়ি বেঁধে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

কড়া নাড়তে হাজির হলেন আলগোছ লক্ষ্মীশ্রী একটি বধূ ঘোমটা দেওয়া নয় তবু লজ্জা ছলছল করছে সারা মুখে।

দেখ কাকে এনেছি! অমৃতপ্রসাদ হেসে বৌদির দিকে তাকালেন।

চিনতে পারছি না তো!

আমার ভাই সবে বাংলা থেকে এসেছে। পথ থেকে ধরে নিয়ে এলাম।

তোমার ভাই। বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বৌদি।

তুমি আগে একটু সরবৎ কর। বেচারা ঠাণ্ডা হোক। রোদে তেতে-পুড়ে এসেছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে গৌরমোহন সেই ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পান। তার কতদিন বাদে অমৃতপ্রসাদই টাকা দিয়ে সেকেন্দ্রারাওয়ে ডালিম আর পেয়ারার বাগান কিনে দিয়েছিলেন। যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন ভার্মাজী। অমৃতপ্রসাদের বন্ধু রাধাশ্যাম ভার্মা। ব্যবসার পরিকল্পনাটা অমৃতপ্রসাদের। ইচ্ছে ছিল নিজেই করেন। কিন্তু সাপড়ি আর আনারের বাগিচা লীজ নিলে ফুল আসবার সময় থেকেই তাঁবু ফেলে বাগানে থাকতে হয়। ছেলে-বৌকে কার কাছে রেখে যাবেন। তাই ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি। এমন সময় গৌরমোহনকে পেয়ে অমৃতপ্রসাদের মনে সেই বাসনাটা জেগে উঠল। বললেন, চাকরি করে কি হবে?

তবে? বিস্মিত হয়ে তাকালেন গৌরমোহন।

ব্যবসা কর!

ব্যবসা! কথা জোগায় না গৌরমোহনের, টাকা কোথায় পাব? তা' ছাড়া আমার অভিজ্ঞতাও নেই।

তুমি যদি রাজি থাক তবে লেগে যাওয়া যায়। গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকালেন অমৃতপ্রসাদ, সেকেন্দ্ররাওয়ের কাছে নওরঙ্গের রাজাবাহাদুরের সাপড়ি আর আনারের মস্ত বাগিচা।

সখ করে করেছিলেন! বোধহয় টাকার টান পড়াতে লীজ দিচ্ছেন। সবটা আমরা নিতে পারব না। খানিকটা নেওয়া যায়। ফি-বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ডাক হয়, তুমি আর আমি যাব। কি বল? একটু থেমে অমৃতপ্রসাদ বলে চললেন, কষ্ট একটু হবে। শীতের কামড় সহ্য করতে হবে। তবু দেখবে আশ্চর্য জীবন! গাছপালা আর নীলকণ্ঠ পাখির ডানার মতো আকাশের বিস্তার তোমার উপর ঝুকে আছে।

পৃথিবীতে তো লড়াই করতে বেরিয়েছ—দু'টো সিজ্‌ন তাঁবুতে থাকলে দেখবে রোদে-জলে ভিজে-পুড়ে শরীর তৈরি হয়ে গেছে। তোমার কাজ হবে শুধু পাহারাদারদের খবরদারি করা। এখানকার লোকেরা অবশ্য সৎ পরিশ্রমী আর বিশ্বাসী।

রাজি হয়ে গেলেন গৌরমোহন। রাজি না হয়ে উপায়ই বা কী! বিধবা মা কোন রকমে লেখা পড়া শিখিয়েছেন। মাকে একলা বাড়ি রেখে বেরিয়েছেন। কিছু উপায় না হলে ফেরেন কী করে। মাস তিনেক ধরে আত্মীয়-স্বজনদের দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাদের কাছ থেকে অনুকম্পা আর সহানুভূতির ছিটে-ফোঁটা ছাড়া অন্য কিছু জোটে নি। তাই একদিন নিরুদ্দেশে পাড়ি দিলেন।

পিছনে পড়ে রইল মা, গ্রাম আর আশৈশব পরিচিত মানুষ-জনেরা। এখানে-সেখানে ভাসতে-ভাসতে শেষে দিল্লিতে গিয়ে ঠেকলেন। পরিচিত একজন ছিলেন সেখানে। গ্রাম সুবাদে আত্মীয় হন। গৌরমোহনের মাকে কাকীমা বলতেন। তারি ভরসায় দিল্লী আসা। ভারত সরকারের দেড়-হাজারি মনসবদার। গ্রামেই শোনা গেছে সরকারে নাকি অগাধ প্রতিপত্তি। হয়তো কিছু একটা হয়ে যেতে পারে তাই রাজধানীতে হাজির হওয়া।

দেখা হতে ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। সুদূর বাংলা থেকে কেউ চাকরির জন্যে দিল্লীতে হাজির হতে পারে এটা তার ধারণার অতীত। কিছু টাকা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে বললেন।

সবিনয় সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন গৌরমোহন।

তখন গরমকাল। কাশ্মিরী গেটের কাছে ফুটপাথে রাত কাটিয়ে পথে-বিপথে ভাসলেন গৌরমোহন। দিল্লী থেকে গাজিয়াবাদ হয়ে মথুরা। কেন গেলেন কে জানে! প্রায় না-খেয়েই কাটাচ্ছিলেন তবু জলের মতো পয়সা খরচা হচ্ছিল। খবর পেলেন বৃন্দাবনে অনেক বাঙালি থাকে। তাই মথুরা থেকে পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন যাচ্ছিলেন। পথে অমৃত প্রসাদের সঙ্গে দেখা—সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন।

আগষ্টের শেষাশেষি লোকজন নিয়ে বাগান পাহারা দেওয়া সুরু হল। ডালিম গাছের তলায় তাঁবু ফেলে থাকতেন গৌরমোহন। কী ঠাণ্ডা ঢেউ বয়ে যেত তাঁবুর ভিতরে! বাইরে সারারাত আগুন জ্বলত। রাত জেগে সেই আগুন পোহাত তাঁবু।

লোকজনের সঙ্গে তাকেও চোর তাড়াতে বেরুতে হত। ফল পাকলে হাতরাস লক্ষ্ণৌ আলিগড় দিল্লির ব্যবসায়ীরা এসে বাগানশুদ্ধু ফল কিনে নিত। তেমন দরকার হলে বাজারেও পাঠানো হত; লাভ মন্দ হত না। শুধু কি মানুষ, পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গের হাত থেকেও ফল ঠেকাতে হয়। গাছের পাতায় ছায়া স্নিগ্ধ হত বলে সাপেরাও এসে আশ্রয় নিত। কখনো ফেরার গুলবাঘা বরেলির জঙ্গল থেকে এসে হাজির হত। তারপর যেদিন তোতার ঝাঁক নামত সেদিন তো আর সারাদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। এর উপর বাঁদর হনুমানের উৎপাত তো লেগেই ছিল।

তবু কখনো-কখনো মুগ্ধ হয়ে গেছেন গৌরমোহন। শেষরাতের জোছনাকে ভোর মনে করে ময়ুর-মিথুন মাঠে নেমে পড়েছে। ঘুমন্ত মাঠের নির্জনতায় নিঃশব্দ তাদের আনাগোনা; কখনো তাদের কাংস্য কণ্ঠের তীব্র তীক্ষ্ণ কেকা-ধ্বনি নিশুতির নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে-চুরে খান-খান করে দিয়েছে।

সারারাত ধরে শিশির পড়েছে—টুপটাপ-টুপটাপ। খাটিয়ার উপর শুয়ে উত্তর-কাশীর কোন গাঁয়ে-বোনা মোটা কম্বল জড়িয়ে কান পেতে সেই শব্দ শুনেছেন গৌরমোহন। সঙ্গে ঝিঁ-ঝিঁর একটানা ঝিঁঝিঁ। পাতার মর্মরে হাজার-হাজার অশরীরী মুখ বুঝি ফিসফিস করে কথা বলত সারারাত। সেইসব রোমাঞ্চিত বিনিদ্র রাত্রি আজ আর অনুভব করবার উপায় নেই!

এক-একদিন রাতভোর জেগে ভোরের দিকে ঘুমুতে গিয়ে উঠতে বেলা হয়ে গেছে। লোমরিকে চা আনতে বলে খাটিয়ায় বসে ঝিমুতে-ঝিমুতে গৌরমোহন চোখ খুলে অবাক। টগর ফুলের মতো ধবধবে রোদে ছায়া ফেলে অসংখ্য হলুদ কি বাসন্তী রঙের প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে; নিঃশব্দ। অথচ রৌদ্র তাদের পাখার শব্দে বুঝি ভরে গেছে। যে-সব ডালিম-গাছে ফল আসেনি, ফিকে সবুজ পাতার রঙে ভরে গেছে তাদের গায় প্রজাপতি বসে ফুল হয়ে উঠেছে।

বিকেলের আবছা আলোয় খরগোসেরা শেয়াল কি অন্যকিছুর তাড়া খেয়ে লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে পেয়ারার বনে পালিয়ে আসত।

তাঁবুর দরজায় বসে দেখতেন গৌরমোহন। আজকাল চোখে ভালো দেখেন না বটে তবু সে-সব মনে মনে ছবি যেন স্পষ্ট।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে গাছের পাতা ঝরে যেত। অমন যে অমলতাস ফুলের হলুদ টোপর হেমন্ত পর্যন্ত শীতের হাওয়ায় দুলত—পৌষে তার চিহ্ন থাকত না! এমন ঠাণ্ডা বয়ে যেত বাগানে যে এখানে-সেখানে পাখিরা মরে পড়ে থাকত।

সহ্য করতে পারতেন না গৌরমোহন। আগুনের পাশে বসেই খাওয়া সারতেন। মকাই-বাজরার রুটি ভাজি আর মাসকলাইয়ের ডাল। কখনো মুখ পালটাতে গুরচনী রুটি।

যখন নিরামিষ অসহ্য হয়ে উঠত তখন নহরের জলে নেমে যেতেন মাছ ধরতে। হাত দিয়ে ব্রীজের তলা থেকে সর-পুঁটি লাচি মিরগেল ধরতেন। ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করলে সেরখানেক

মাছ ধরা যেত। নিজেকেই রাঁধতে হত। অবশ্য কাশেম আলি কেটে-কুটে দিত।

লোমরিব সঙ্গে নবেম্বরের অন্ধকার রাত্রে জল-মোরগার সন্ধানে কতোদিন জলার ধারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনো গাছপালার ভিতরে ভাঙা-জোছনায় হরিণের চকিত মুখ দেখা যেত।

প্রথমবার বাগিচা লীজ্ নিয়ে ভালোই লাভ হয়েছিল। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে যা ছিল গৌরমোহন অমৃতপ্রসাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বৌদি আর দাদার মুখে কী হাসি!

অমৃতপ্রসাদ বললেন, তুমি তো রেকর্ড ব্রেক করলে হে! দূরদেশে কষ্ট সহ্য করে মূলধনই তুলে আনো নি; লাভের টাকাও ঘরে এনেছ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষোভ দূর করলে!

যেদিন বাগান থেকে টাকা নিয়ে গেলেন সেদিন কত রকম রান্না করেছিলেন বৌদি। হেসে বললেন, ঠাকুর-পোকে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিৎ।

দাদা বললেন, কী দেওয়া যায় বলত?

টুকটুকে একটা বৌ! খুশি একটা কুঁড়ির মতো বৌদির মুখে পাঁপড়ি মেলেছিল।

তা' বটে! দাদাও খুসি হয়ে উত্তর দিলেন।

বিকেলে দাদা জিজ্ঞেস করলেন, আবার ব্যবসা করবে নাকি গৌরমোহন?

আমার তো তাই ইচ্ছে! জায়গাটাও বেশ ভালো লেগেছে!

বেশ তাহলে লেগে যাও আবার। তার আগে একবার দেশে যাবে না?

কার কাছে যাব!

কেন তোমার মা-বাবার কাছে?

ম্লান হেসে গৌরমোহন বলেন, বাবা নেই মা আছেন।

মাকে কে দেখেন?

কে আবার দেখবেন—ভগবান!

চলছে কি করে?

কি জানি!

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অমৃতপ্রসাদ, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না গৌর।

গৌরমোহন বুঝে উঠতে পারেন নি কি উত্তর দেবেন।

তুমি যে এখানে আছ সে কথা জানিয়েছ?

মাথা নাড়েন গৌরমোহন, তা' জানিয়েছি।

টাকা কড়ি কিছু পাঠিয়েছ?

না তা' পাঠাই নি।

ঘরে উঠে গেলেন অমৃতপ্রসাদ। একটু বাদে বেরিয়ে এসে বললেন, এই টাকাটা টেলিগ্রাম মনি-অর্ডারে পাঠিয়ে দিয়ে এস।

এই রাত্রে!

তা'হলে কাল সকালে পাঠিয়ে দিও।

গৌরমোহন সকালে পোস্ট-অফিসে গিয়ে একশ' টাকা মনি অর্ডার করে পাঠালেন। সেই প্রথম মাকে টাকা পাঠানো। সে আনন্দ এখনো তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

মা বলতেন, তুই বড় হলে আমার সব দুঃখ ঘুচবে গৌর!

পৃথিবীতে গৌরমোহন ছাড়া তার বিধবা মায়ের আর কে ছিল!

চাকরির শেষদিন পর্যন্ত গৌরমোহন সেকেন্দ্রারাও সহরেই ছিলেন। আর কোথাও নড়েন নি। সেকেন্দ্রারাও একদিন সত্যিকারের সহর হল। বিজলি এল। জল এল। মিউনিসিপ্যালিটি হল। পার্ক হল। টকি এল। সবই গৌরমোহনের চোখের সামনে গড়ে উঠল।

তার আগের একটা ঘটনার কথা গৌরমোহনের স্পষ্ট মনে আছে।

অমৃতপ্রসাদ তখন সোনেঈ স্কুলের শিক্ষক। মথুরার কাছাকাছি

সোনেঙ্গী রায়া এই সব সমৃদ্ধ গ্রামগুলো বর্ষার সময় প্রায়ই ডুবে যায়। জুলাই মাস নাগাদ যমুনার অপরিসর খাত বরফ গলা জলে বোঝাই হয়ে যায়। তারপর জল একটু বাড়লেই খাত ছাড়িয়ে দু'পাশের মাঠ-গ্রাম জলে ভরে যায়। তেমনি একবার বর্ষায় যমুনার জল বেড়ে আশপাশের মাঠ-ক্ষেত সব ডুবে গেল। দিন-পনেরো থেকে সেই জল নেমে গেল। চারদিক স্যাতসেঁতে—কাদায় ভর্তি।

ছোট্টু তখন পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে। ছাড়া পেলেই মায়ের চোখ এড়িয়ে জমে-থাকা খানা-খন্দের জলে মাছের খোঁজে ব্যাঙের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়।

স্কুলের হিন্দি-টিচার শর্মাজী সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ছেলেকে সাবধান রাখবেন।

কেন? অবাক হলেন অমৃতপ্রসাদ।

এসব কিচ্ড়্ বহোৎ খারাপ আছে?

তার মানে?

দানো-পিরেত এই সব জায়গায় থাকে আর মানুষ গেলে হজম করে দেয়।

অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন অমৃতপ্রসাদ। তবু বাড়ি ফিরে বৌদিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

দুপুরের পর সেদিন বৃষ্টি থেমে গেল। হঠাৎ আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ঢলে-পড়া সূর্যের আলোয় জলে-ভেজা সোনেঙ্গী অপরূপ।

ছোট্টু বৃষ্টির জন্যে বেরুতে পারছিল না। ছটফট করছিল। অমৃতপ্রসাদ স্কুল থেকে ফেরেন নি। বৌদি সংসারের কাজে ব্যস্ত।

ছোট্টু বারান্দা থেকে নেমে কি যেন খুঁজছিল।

বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, কি খুঁজছিস রে ছোট্টু?

লাঠি। কত বড় ব্যাঙ মা।

তা' লাঠি দিয়ে কি করবি?

ব্যাঙকে মারব।

দূরে যাসনে। ডাকলেই যেন সাড়া পাই।

আচ্ছা। ব্যস্ত ছোট্টুর গলা পাওয়া গেল।

বৌদি নিজের মনে সংসারের কাজে ডুবে রইলেন।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অমৃতপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, ছোট্টু কোথায় ?

কি জানি! দেখ আছে কোথায়—এই তো ব্যাঙ মারবে বলে লাঠি খুঁজছিল।

ছোট্টু! অমৃতপ্রসাদ ডাকলেন। একবার। দু'বার! তিনবার। চারবার। অসংখ্যবার। ছোট্টুর সাড়া পাওয়া গেল না।

গেল কোথায় ছেলেটা! স্বগতোক্তি করেন অমৃতপ্রসাদ। তারপর খুঁজতে বেরুলেন। পাড়া-প্রতিবেশিরাও এগিয়ে এল। বাড়ির উঠোন থেকে ছোট্টু একটা পায়ের ছাপ কাদার উপর এগিয়ে গেছে। সেই ছাপ ধরে এগিয়ে যায় সবাই। একটু দূরেই যমুনা।

ততক্ষণে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। ঝকঝকে আকাশে সূর্য অস্ত গেল। যমুনার জলে সেই আলো একটু-একটু করে নিভে এল। নির্বিকার একটা অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে।

ছোট্টুর পায়ের ছাপ ইতস্তত এদিক-ওদিক এগিয়ে জলের সামনে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

সবাই থেমে গেল। মাঠের চারদিকে তাকিয়ে কোথাও ছোট্টুর চিহ্ন দেখা যায় না। দাদা পাগল হয়ে গেলেন। থানায় খবর গেল। খবর পেয়ে শর্মাজীও এসেছিলেন। সব শুনে মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন। একটিও কথা বলেন নি।

যমুনার ধারে দলদলায় হারিয়ে গেল ছোট্টু। মৃতদেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

দাদা তবু সামলে নিয়েছিলেন। অন্তত বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। বৌদি সহ্য করতে পারেন নি। কি রকম যেন হয়ে গেলেন। তার মনে একটা অপরাধবোধ সৃষ্টি হল—যেন তারই অবহেলায়

ছোট্টু চোরাবালিতে ডুবে গেল। সারাদিনে কখনো তার চোখের জল শুকোত না। সংসারের কাজকর্মের ভিতরেও সব সময় আঁচল দিয়ে চোখ মুছতেন। কোন সান্ত্বনাই তার শোক নিরাময় করতে পারে নি।

বৌদি মাঝরাতে ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠতেন।

কী—কী হয়েছে? জেগে যেতেন অমৃতপ্রসাদ।

ছোট্টু কাঁদছে—ওগো, আমার কাছে আসবে বলে কাঁদছে!

কি বলছ তুমি?

ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম ছোট্টু বলছে, মা তোমার কাছে যাব—

হাত বাড়িয়ে দিলাম, এসো সোনামনি—এসো আমার কোলে—

ছোট্টু বলল, মাটির নিচে বড় অন্ধকার মা—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

ছুটে গেলাম আমি, ছোট্টু কোথায় তুই?

এই যে আমি—এই অন্ধকার মাটির নিচে—আমার বড্ড কষ্ট মা—

দাদাকে দুহাতে জড়িয়ে হু-হু করে কাঁদতেন বৌদি, ছোট্টু—আমার ছোট্টুকে এনে দাও না—

যমুনার ধারে জলাজমির চোরাবালিতে যে-ছোট্টু হারিয়ে গেছিল তাকে আর ফিরে পাবার আশা কোথায়!

ছোট্টুর শোকে পাগল হয়ে গেলেন বৌদি। মাষ্টারি ছেড়ে বৌদিকে নিয়ে বেনারস চলে গেলেন দাদা। সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করেও অমৃতপ্রসাদ বৌদিকে ভালো করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন বৌদি। দাদাও কেমন যেন বিবাগী হয়ে গেলেন। সারাদিন বাড়ি থাকতেন। সন্ধের পর গঙ্গার ধারে গিয়ে বসতেন। ফিরতেন অনেক রাতে। কোনদিন হয়তো সারারাতই গঙ্গার ধারে বসে কাটিয়ে দিতেন। নিঃশব্দে প্রবহমান গঙ্গার ধারার দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে কি ভাবতেন তিনিই জানেন!

খবর পেয়ে গৌরমোহন বেনারস চলে গেলেন। তারপর অমৃত-প্রসাদকে জোর করে নিয়ে এলেন! কী রকম যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলেন তিনি। চোখে তীব্র একটা সংশয়ের জ্বালা। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন তাঁর সন্দেহ!

বাগান লীজ নেরার দরুন দু'তিন বছরের মধ্যে হাতে কিছু টাকা এসে গেলে নিজের জন্যে বেশ বড় একটা তাঁবু কিনে ছিলেন গৌরমোহন। সেই তাঁবুতে আরেকটা খাটিয়া পেতে নিলেন। গৌরমোহনের পাশে অমৃতপ্রসাদের জায়গা হল। কখনো সেই তাঁবুর মধ্যে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বসে থাকতেন অমৃতপ্রসাদ কখনো বা নিজের মনে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। জিজ্ঞাসা না-করলে কখনো কথা বলতেন না।

চিড়্‌গাছের তলায় কাছিমের মতো উবু হয়ে থাকা তাঁবুর পেটের ভিতর দু'জনে একসঙ্গে কতদিন কাটিয়েছেন! রাতে-দিনে গৌরমোহনের কাজের অন্ত ছিল না। তাই শুলেই ঘুমিয়ে পড়তেন। রাত প্রহর-দুই হলে লোমরি ডেকে দিয়ে যেত, সরকার উঠিয়ো—

একদিন উঠে দেখেন খাটিয়া খালি। অমৃতপ্রসাদ নেই। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখা গেল অবসন্ন চাঁদ সেকেন্দ্রারাওয়ের প্রান্তর-ভূমির উপর ঝুকে পড়েছে। লুকাট গাছের ছায়া অনেকখানি লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

চারিদিকে চোখ ফেলে জোছনার ধু-ধু কুয়াশায় আর কিছু দেখা গেল না। চোখ দু'টো দূরবীনের মতো চারদিকে ঘুরিয়ে হতাশ হলেন।

সাপড়ির ঝাকড়া ছায়া শীতের অলৌকিক চাঁদের আলোয় জীবন্ত মনে হচ্ছিল।

ভয় পেয়েছিলেন গৌরমোহন। শীতের সময় উত্তরে বাতাসের সঙ্গে পাহাড় থেকে যেমন পাখি নামে—তেমনি ভাল্লুক চিতাও নিচে

নেমে আসে। সেকেন্দ্রারাও অবধি তারা আসে না। তবু বলা যায় না গতবার তো একজোড়া চিতা এসে নহরের জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছিল। খিদের সময় মুখোমুখি পড়ে গেলে তারা সহজে ছেড়ে দেয় না।

তখনই হাঁক-ডাক করে বাগানের কয়েকজন পাহারাদারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গৌরমোহন। সেই আদিগন্ত জোছনার আলো-আঁধারির বিভ্রান্তিতে বারংবার পথ ভুল করে অবশেষে আক্রাবাদ যাবার পথে বোম্বার কালভার্টের উপর অমৃতপ্রসাদকে বসে থাকতে দেখা গেল।

গৌরমোহন ডাকলেন, দাদা—

অমৃতপ্রসাদের কোন সাড়া নেই। স্তব্ধ হয়ে কালভার্টের উপর বসে আছেন।

গৌরমোহন আবার ডাকলেন, দাদা—

সাড়া না-পেয়ে গৌরমোহন গায় হাত দিতে অমৃতপ্রসাদ চমকে উঠলেন।

অবাক হলেন গৌরমোহনকে দেখে, কি ব্যাপার গৌব ?

আমিও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি ?

একটু তন্দ্রা এসেছিল। কি রকম একটা শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, তোমার বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে; অবাক হয়ে গেলাম। জোছনায় তার চুল উড়ছে। কী তীব্র তার চোখ। স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

হাত দিয়ে ইশারা করল, এস আমার সঙ্গে—।

তাঁবুর দরজার কাছে পৌছে দেখি অনেকদূরে সরে গেছে। চাঁদের ঘোলাটে আলোয় সব দেখতে পাচ্ছিলাম না। তীব্র আকর্ষণ বোধ করলাম। কী মনে হল জানি না আমি তার পিছনে হাঁটতে শুরু করলাম। কতদূর হেঁটেছি জানি না। বোম্বার কালভার্টের উপর কখন এসে বসলাম তাও জানি না।

গৌরমোহন বললেন, কাল শোনা যাবে। এখন বাড়ি চলুন।

পরের দিন সকালে উঠে গৌরমোহন জামা কাপড় গুছিয়ে হিসেব-পত্তর আর টাকা-কড়ি অমৃতপ্রসাদের সামনে রেখে বললেন, অনুমতি করুন দাদা।

গৌরমোহনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে অমৃতপ্রসাদ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এর মানে ?

আপনার ব্যবসা আমি আর কতদিন দেখে মরব। এবার আপনি বুঝে নিন।

তুমি চলে যাবে নাকি ?

কি করি বলুন! আপনি বিবাগি হয়ে বেড়াবেন আর আমি আপনার ব্যবসা দেখব সে হয় না।।

আমার ব্যবসা।

তবে কার। আমি করি চাকরি। আজ আছি কাল নেই ;

তুমি চাকরি কর। গৌরমোহনের দিকে তাকিয়ে অমতপ্রসাদ বললেন, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না গৌর।

অমৃতপ্রসাদ দাঁড়িয়ে হাত ধরলেন গৌরমোহনের, আমি চেষ্টা করছি। পারছি না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না তারা নেই। শুধু মনে হয় তারা আছে—আর এখুনি হয়তো এসে হাজির হবে। সেই অধৈর্য প্রতীক্ষা আমাকে সব কাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। গৌর এসময়ে তুমি যদি চলে যাও আমাকে দেখবাব কেউ থাকবে না। হয়তো আমি আর বাঁচব না।

তা'হলে বসে না-থেকে কিছু কাজ করতে হবে আপনাকে--

বেশ তাই করব।

সেই থেকে অমৃতপ্রসাদ ফলের বাগানের কাজে হাত দিলেন।

গৌরমোহন নিজে ছিলেন একটু ছটফটে স্বভাবের—বসে থাকতে পারতেন না। বাগানের কাজ থেকে অবকাশ পেলেই লোমরিকে নিয়ে শিকারে যেতেন। জলমোরগাই মারতেন বেশি।

কখনো হরিণ। শিকারের আশায় পুবে এগোতেন। দু-একদিন জঙ্গলে থাকতেন তারপর পাখি কি হরিণ নিয়ে ফিরতেন।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন গৌরমোহন। অতীত ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো সরে যাচ্ছে। .

অমৃতপ্রসাদ একদিন বললেন, গৌর এই নির্জনতা আমাকে পেয়ে বসেছে। তোমার বৌদি আর ছোট্টুর স্মৃতি আমাকে বড্ড বিব্রত করে। এই গাছপালা মাঠ প্রান্তর পাখি-পাখালির জগৎ ছেড়ে আমি মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে চাই। এখানে থাকলে ওদের কিছুতেই ভুলতে পারব না।

সে তো খুব ভালো কথা দাদা। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—

গৌরমোহন সেকেন্দ্রারাও সহরের লট্‌কা-কুয়া এলাকায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে অমৃতপ্রসাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। বন্ধুদের দেখবার জন্য বলে দিলেন। একজন কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড রেখে দিলেন। অমৃতপ্রসাদের খিদ্‌মতের দায়িত্ব রইল তার হাতে।

সহর থেকে মাইল পাঁচেকের মতো পথ। আক্রাবাদ আর সেকেন্দ্রারাওয়ের মাঝামাঝি ফলের বাগানে গৌরমোহন থেকে গেলেন। সময় পেলেই অমৃতপ্রসাদকে দেখে আসতেন। একদিন গৌরমোহন যেতে অমৃতপ্রসাদ বললেন, ভাবছি আবার স্কুলে মাস্টারি করব। তোমার কি মত গৌর ?

কোথায় ?

এই সেকেন্দ্রারাও সহরে। আমাকে দড়্‌গড়্‌জী কয়েকদিন ধরে বলছেন, ইংরিজি-জানা লোকের বড় অভাব—ভট্‌চায্‌সাব আপনি যদি পড়ান ! আমি বলেছি, গৌরমোহনকে জিজ্ঞাসা করি—দেখি সে কি বলে—

এতে আর জিজ্ঞাসা করার কি আছে।

তোমার আপত্তি নেই তো ?

একটুও না।

সেই থেকে অমৃতপ্রসাদ স্কুলে পড়িয়ে গেছেন। মাঝখানে অবশ্য দিল্লিতে রংটাদের স্কুলে হেড্‌মাষ্টারির একটা অফার পেয়েছিলেন। তাও যান নি। শেষে উত্তর প্রদেশের স্কুলগুলো যখন এগারো ক্লাস হয়ে ইণ্টারমিডিয়েট্‌ কলেজ হল তখনো তিনি সেকেন্দ্রারাও স্কুলের প্রিন্সিপাল সাব। বোধ হয় সে বছর কি পরের বছর রিটায়ার করেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের একালের মানুষের কাছে প্রিন্সিপাল সাব বলেই পরিচিত।

স্কুলে কাজ নিয়েও অমৃতপ্রসাদ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বারান্দায় পাতা ক্যাম্পখাটে আশ্রয় নিতেন। আর ঘুমোবার আগে পর্যন্ত দিশি-বিদেশি মাসিক সাপ্তাহিকের মধ্যে ডুবে থাকবেন।

ইচ্ছে হলে অমৃতপ্রসাদ লটকা-কুয়া থেকে কখনো তাবুতে চলে আসতেন। একদিন গৌরমোহন তাবুতে ফিরে দেখেন অমৃতপ্রসাদ বসে আছেন। চারপাইটাকে তাবুর বাইবে টেনে এনেছেন। অমৃত-প্রসাদেব পাশে বসে গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, কখন এলেন দাদা?

অনেকক্ষণ। অমৃতপ্রসাদের মধ্যে কথা বলার আগ্রহ ছিল না। কেমন উদাসীন ভাব। লোমরি চা নিয়ে এল।

চা খেতে-খেতে অমৃতপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, গৌর তুমি কি কাউকে আমার বিয়ের কথা বলেছ?

না তো। অবাক হলেন গৌরমোহন।

মনে করে দেখ।

বিয়ে বলে তো কাউকে কিছু বলিনি।

যা হোক হাতরাস থেকে দুজন এসেছিলেন।

তা'হবে। অবাক হলেন গৌরমোহন, বাড়ুজো মশাইয়ের ওখানে যাই নানা রকম কথা হয়। তা' ওঁরাই বিয়ের কথা বলছিলেন। আমি কিছু বলিনি। আসতেও বলিনি।

চুপ করে রইলেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহনও চুপ করে রইলেন।

হু-হু করে বাতাস বইছে। গাছপালার উপর তখনো মরা আলো ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে আছে।

শেষাহ্নের স্তব্ধতার মধ্যেই একাকার অন্ধকার সেকেন্দ্রারাওয়ের মাঠ ঢেকে দিল।

ওদের আমি কিছু বলিনি। তুমি বলে দিও, আমি আর বিয়ে করব না।

অন্ধকারে অমৃতপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন গৌরমোহন।

একটা চিড়চিড়ে পাখি মাঠের উপর দিয়ে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে গেল।

যারা মারা গেছে তাদের শরীরী অস্তিত্ব নেই বটে। মৃদুস্বরে বলে চলেন অমৃতপ্রসাদ, তবু আমার মনে তারা তেমনি সজীব। চোখ বুজলে তাদের দেখতে পাই—কানে তাদের কথা ভেসে আসে। তাদের আমি ভুলতে পারছি না। হয়তো অন্ধমোহ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু স্থির হতে পারছি না।

তবু অমৃতপ্রসাদের মন একদিন ফিরল।

লটকা-কুয়া এলাকায় সেবার শীতের আগে লক্ষ্ণৌ থেকে এক বাঈজী এল। নওরঙ্গাবাদের রাজবাড়িতে কী একটা উৎসবে তাকে নিয়ে আসা হল। বেশ কয়েকদিনের বন্দোবস্ত। বাসা পড়ল হুরমতগঞ্জের একটা বাড়িতে। দড়্গড়্জীর বাড়ির কাছেই। বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে জেল্লা-জৌলুযে ভারি খুব্সুরৎ। মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতে হয়। মোহিনী মায়ার সম্মোহ ছিল তার শরীরে। চাদনি ফুলের মতো গায়ের রঙ। চোখদুটো যেন আধফোটা চামেলির কুঁড়ি!

রাজবাড়ির বায়না সারা হলে দড়্গড়জী একদিন সখ করে বাড়িতে একটা গানের আসর বসালেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের সব রহিস আদমিদের নেমন্তন্ন হল সেই আসরে। সেখানে গুলরুখবাঈয়ের সঙ্গে অমৃতপ্রসাদের প্রথম পরিচয়।

সেই শীতের রাত্রে দড়্‌গড়জীর বাড়ির প্রশস্ত আসরে লক্ষ্ণৌ-ওয়ালির ঠুম্‌রির বাহার হয়তো মোহিত করে থাকবে। গুলরুখের গলায় সোনার আওয়াজে গাঁথা মুক্তোর মতো ঠুমরির দানা অমৃত-প্রসাদের মনে কী মায়া সৃষ্টি করেছিল কে জানে! স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন অমৃতপ্রসাদ।

বিরতির অবকাশে দড়্‌গড়জী হঠাৎ বললেন, গান-টান আপনার আসে নাকি মাষ্টারসাব? কথাটা অমৃতপ্রসাদের কানে বেসুরো ঠেকে থাকবে। তার মনে হয়েছিল দড়্‌গড়জী তাকে ঠাট্টা করছেন। বোধহয় এতগুলো মানুষের সামনে তার সম্মানকে বিপন্ন করেছেন।

মৃদুকণ্ঠে অমৃতপ্রসাদ বললেন, বাঈসাহেবা যদি অনুমতি করেন শোনাতে পারি।

মিষ্টি হেসে অনুমতি দিল গুলরুখবাঈ।

গান ধরলেন অমৃতপ্রসাদ। সারেঙ্গি সঙ্গী হল। তবলচি নড়ে চড়ে বসল।

গৌরমোহনের মনে আছে, এক একদিন অমৃতপ্রসাদের সোনেঈর বাড়িতে আসর বসত। অমৃতপ্রসাদ গাইতেন। শ্রোতা গৌরমোহন আর বৌদি। একটানা গেয়ে যেতেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহন মিঠেচালের গানের ভক্ত ছিলেন। অমৃতপ্রসাদ গাইতেন সবই তবু ঘুরে ফিরে তার গলায় গজগামিনী ধ্রুপদের ধ্রুবপদ এসে ভর করত। গাইতে-গাইতে রাত হয়ে যেত। বৌদি তাড়া দিতেন। দাদা গানের মাঝখানে থেমে গিয়ে বলতেন, সত্যি অনেক রাত হয়ে গেল। গাইতে বসলে আমার খেয়াল থাকে না। চল গৌর।

বৌদি মারা যাবার পর অমৃতপ্রসাদের গলায় আর গান শোনা যায় নি। চিরকালের মতো বুঝি নীরব হয়ে গেছিল।

সেদিন আসরের মাঝখানে এই ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে হঠাৎ সেই বন্ধ গানের দরজা গেল খুলে। অমৃতপ্রসাদের তাজা গলায় সতেজ কণ্ঠের দাপট শুনে গুলরুখবাঈকে বোধহয় আশ্চর্য হতে হয়েছিল।

গান থামতে সবাই উচ্ছ্বসিত।

অনেক রাতে আসর ভাঙল।

বাঈসাহেবা যাবার সময় অমৃতপ্রসাদকে বলে গেল তিনি যদি একদিন মেহেরবানি করে তার গরীবখানায় যান।

অমৃতপ্রসাদ ভদ্রতা করে বলেন, যাব একদিন। এ আর এমন কি—

তারপর সে-কথা অমৃতপ্রসাদের মনেও ছিল না। একদিন বাঈসাহেবার মোকাম থেকে একজন চাকর এসে অমৃতপ্রসাদকে সেলাম জানিয়ে নেমন্তন্নর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল।

অমৃতপ্রসাদ ভৃত্যকে বলে দিলেন, যাব—আজই যাব।

একলাই গেলেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহন সেদিন লটকা-কুয়ার বাড়িতে ছিলেন। যাবার সময় অমৃতপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, গৌর যাবে নাকি?

সবিনয় প্রত্যাখ্যান করলেন গৌরমোহন।

রাত প্রায় শেষ করে ফিরলেন অমৃতপ্রসাদ। গৌরমোহন দরজা খুলে দিয়ে বললেন, এত দেরি?

হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল। অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিয়ে অমৃতপ্রসাদ উপরে উঠে গেলেন।

গৌরমোহন পরদিন সকালেই বাগিচার তাঁবুতে ফিরে গেলেন। কয়েকদিন পর তার কানে এল অমৃতপ্রসাদ প্রায় নিয়ম করে সন্ধেবেলা গুলকণ্ঠবাঈয়ের আস্তানায় যাচ্ছেন। ব্যাপারটাকে প্রথমে আমল দিতে চান নি গৌরমোহন। ক্রমশ যেন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। বাঈয়ের বাড়ি যেন অমৃতপ্রসাদের বাড়ি হয়ে উঠল। স্কুল থেকে বাড়ীতে না ফিরে বাঈয়ের মহলে যেতে লাগলেন। তখনই গৌরমোহনের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে।

এদিকে বাঈসাহেবার চলে যাবার দিন পার হয়ে গেল তবু যাবার নাম নেই। বাঈজীর লোকেদের কাছ থেকে শোনা গেল,

জায়গাটা বাঈসাহেবার ভাল লেগেছে। তা'ছাড়া তবিয়ৎ ভালো নেই তাই দিনকয়েক এখানে থেকে একটু বিশ্রাম নেবে।

এরপর বাঈসাহেবার মা সারেঙ্গী আর তবলচিকে নিয়ে চলে গেল। কী ব্যাপার কেউ বলতে পারল না। তবে কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারা বলল, বাঈসাহেবার সঙ্গে তার মায়ের অনেক রাত পর্যন্ত কথা কাটাকাটি হয়েছে।

তখনও সেকেন্দ্রারাও সহর অমৃতপ্রসাদ আর গুলরুখবাঈয়ের সম্পর্ক নিয়ে ফিসফিস করত। তারপর সেই নিঃশব্দ ভাষণ ক্রমশ মুখর হয়ে উঠল।

অমৃতপ্রসাদ বুঝি মোহগ্রস্থ হয়েছিলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

গৌরমোহনের ইচ্ছে ছিল অমৃতপ্রসাদকে ডেকে কথা বলেন। কী জানি সাহস পান নি। শেষে সেই ভয়ংকর কথাটি ইতস্তত অনেক ঘোরাঘুরির পর গৌরমোহনের কানে এসে পেঁাছল। অসম্ভব এই ঘটনাকে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি। তার নিজের লজ্জা করতে লাগল। বুঝে উঠতে পারেন না কি করে অমৃতপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করা যায়।

একদিন অমৃতপ্রসাদই এসে হাজির। তাঁবুর সামনে বসে হিসেব-পত্তর দেখছিলেন গৌরমোহন।

আসুন দাদা।

তুমি অনেকদিন লটকা-কুয়ায় যাও নি গৌর।

সময় করে উঠতে পারছি না। কাজকম্ম সামলে উঠে দেখি রোজই সন্ধে হয়ে যায়।

তোমার সঙ্গে কথা আছে। এসো আমার সঙ্গে—

দু'জনে মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

আমি বিয়ে করছি গৌর।

বিয়ে! দাঁড়িয়ে গেলেন গৌরমোহন, কিছু জানি না তো।

অমৃতপ্রসাদ হাসলেন, সহর শুদ্ধু লোক জানে আর তুমি জানো না!

পাত্রী?

গুলরুখবাঈ। আমি ভেবেছি নামটা পালটে সুচরিতা রাখব।

বৌদির নাম!

ওর মধ্যে তোমার বৌদিকে আমি পেয়েছি গৌর।

কিন্তু—। অমৃতপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন গৌরমোহন।

এর মধ্যে আর কিন্তু নেই।

অপরাধ ক্ষমা করবেন। তবু না-বলে পারছি না—ব্যাপারটা বোধ হয়—

জানি কিন্তু উপায় নেই! নিদারুণ অবসন্ন মনে হচ্ছিল অমৃত-প্রসাদকে, গুলরুখ গর্ভবতী।

চমকে উঠেছিলেন গৌরমোহন। অসহ্য একটা স্তব্ধতা দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সেই নীরবতার মধ্যেই চলে গেলেন অমৃত-প্রসাদ। মাঠের অন্ধকারে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

একাই দাঁড়িয়ে রইলেন গৌরমোহন। তারপর কখন যেন তাঁবুতে ফিরে এলেন। অস্থির এক চিন্তায় স্থির হয়ে আর বসতে পারলেন না। সেই রাত্রেই লোমরিকে নিয়ে চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে সেকেন্দ্রারাও গেলেন। সেই ছোট্ট সহরের যাঁরা প্রধান তাঁদের সবিনয় অনুরোধ জানালেন, তাঁরা যেন অমৃতপ্রসাদকে এ বিয়ে থেকে নিবৃত্ত করেন।

সব চেষ্টা বিফল হল। অমৃতপ্রসাদ গুলরুখবাঈকে বিয়ে করে লটকা-কুয়ায় সংসার পাতলেন। গৌরমোহন সেই বাড়িতে কখনো যান নি। অমৃতপ্রসাদও কখনো যেতে বলেন নি। সেই বাড়িতেই সত্যপ্রসাদের জন্ম।

কতদিন আর এই অলীক সংসার চলেছিল! বছর দুয়েক হবে বোধহয়।

অমৃতপ্রসাদ একদিন সকালে উঠে দেখেন সত্যপ্রসাদ কাঁদছে। তার মা কাছাকাছি কোথাও নেই। সারাবাড়িতে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। হতভাগ্য সত্যপ্রসাদকে কোলে তুলে নিলেন অমৃতপ্রসাদ। ফুলকুমারীর মাকে বুকের দুধের জন্য বহাল করা হল। সেই সত্যপ্রসাদ আজ বড় হয়েছে। ছেলেবেলায় বড় চঞ্চল বড় দুরন্ত ছিল!

গৌরমোহনের মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, কোন প্রয়োজনে গুলরুখবাঈ ঘর বেঁধেছিল—আর কোন প্রয়োজনে সেই ঘর তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে রেখে চলে গেল!

অমৃতপ্রসাদ কি ভাবতেন কে জানে। হয়তো বেদনায় হয়তো যন্ত্রণায় অনুতপ্ত মানুষটি নিজের অতল অনুভব চিরকাল নিঃশব্দে বহন করে গেছেন। তার সে ব্যথা তো কাউকে বলবার নয়!

একটু বড় হয়ে সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনের কাছেই মানুষ হয়েছে। ইচ্ছে ছিল হৈমবতীকে সত্যপ্রসাদের হাতে তুলে দেন! অমৃত-প্রসাদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা চিরকালের সম্পর্কে বাঁধা পড়বে। কতদিন ধরে এই আকাঙ্ক্ষাকে লালন করেছেন। অমৃতপ্রসাদেরও আপত্তি ছিল না। হৈমর মা মৃণ্ময়ীর দৃঢ় অনিচ্ছাকে কিছুতেই পার হতে পারেন নি গৌরমোহন।

সেকালের সেই দিনগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন গৌরমোহন। নানা রঙের দিন। সুখ-দুঃখের দিন। যৌবনের গৌরমোহন আর অমৃতপ্রসাদকেও দেখতে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন সাপ্ড়ি আর আনারের ক্ষেত! নওরঙ্গের রাজাবাহাদুরের বাড়ি। সেকেন্দ্রারাওয়ের চারপাশে আদিগন্ত বনভূমি। অহল্যা মাঠ—নহর আর বোম্বার মসৃণ জলধারার সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া। স্পষ্ট—সব যেন স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে। শুধু নিজে ক্রমশ বিবর্ণ ধূসর হয়ে যাচ্ছেন।

ভালোই কাটছিল দিন। হঠাৎ কি যে হল, পোকা লাগল

আনার গাছে—সেই পোকা সাপ্‌ড়ির পাতা আর ফুলও জীর্ণ করে তুলল। পর পর দু'বছর ভালো ফল হল না। ডাহা লোকসান মেনে নিতে হল। জমার টাকা দিতে পুঁজিতেও টান পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও ব্যবসা ঠেকান গেল না। শেষকালে ছেড়ে দিতে হল। গৌরমোহন একেবারে বেকার হয়ে গেলেন। এতদিন তবু ভবিষ্যতের আশ্বাস ছিল সেটুকুও আর রইল না।

গৌরমোহন অমৃতপ্রসাদকে জানালেন, এখানে আর বসে থেকে লাভ কি—অন্যত্র চেষ্টা করে দেখি—যদি কিছু করা যায়।

কেউ আশা দিয়েছে নাকি ?

না, তেমন কিছু নয়।

তবে ?

ভাবছি কতদিন আর বেকার বসে থাকব।

সে ভাবনাটা আমাকে বরং ভাবতে দাও গৌর।

এসময় একটা বিলিতি কোম্পানি নহরের জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কারখানার জন্যে লোক নিচ্ছিল। পলেরা সুমেরা আর ভোলায় তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হল। অমৃতপ্রসাদের এক বন্ধু সেই কোম্পানীর এক্‌জিকিউটিভ্ পোষ্টে ছিলেন। তাকে ধরলেন অমৃতপ্রসাদ। বেশি বেগ পেতে হয় নি। কুলি সুপারভাইজারের পোষ্টে কাজ হয়ে গেল। পরে পরীক্ষা দিয়ে ইনস্‌পেক্টার হয়েছিলেন গৌরমোহন। মাঝখানে গোয়াতুমি করে চাকরি ছেড়ে না-দিলে আরো উপরে উঠতে পারতেন।

অমৃতপ্রসাদই তোড়জোড় করে গৌরমোহনের বিয়ে দিয়ে হুরমতগঞ্জের বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

পায়ের শব্দ হতে চোখ তুলে তাকালেন গৌরমোহন, কে ?

আমি সতু—কাকা।

এসো-এস সতু। মনটা আজ বড় খারাপ লাগছে।

কেন ?

দাদা চলে গেলেন জানতেও পারলাম না। তুমি না-এলে হয়তো জানতেও পারতাম না। দাদা চলে যাবার কত বছর বাদে খবর পেলাম! সারা জীবন আমরা নিজেদের আলাদা ভাবিনি।

রক্তের সম্পর্ক আমাদের ছিল না। কিন্তু তার থেকেও বেশি কিছু আমাদের মধ্যে ছিল। যারা জানতেন তাদের কেউ আজ আর বেঁচে নেই।

সে তো আমরাও জানি কাকা।

নিজের মনেই বলে চলেন গৌরমোহন, বাংলা দেশে ফিরে এসে বড্ড ঠকে গেছি সতু। এখানে কোন পরিচয় নেই। কেউ চেনে না। চল্লিশ বছরের বিচ্ছেদে মনের ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে ছিল সেকেন্দ্রারাও ফিরে যাব! ভেবেছিলাম জীবনের শেষ দিনগুলো দাদার সঙ্গেই কাটাব। এমন জড়িয়ে গেছি যে ছিঁড়ে যাওয়া মুসকিল। যাই-যাই করেও যেতে পারিনি। তবু আশা ছিল দাদা সেখানে আছেন একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ তোমার কাছে যখন শুনলাম দাদা নেই— পৃথিবীতে আশা করবার কিছু আর রইল না। গৌরমোহনের গলা ছলছল করে।

সত্যপ্রসাদ বাধা দিল, এখন ওসব কথা থাক কাকা।

তোমাকে দেখে দাদার কথাই মনে পড়ছে সব চেয়ে বেশি। যৌবনে দাদার চেহারা অবিকল এমনি ছিল। পাশের ঘরে যখন কথা বলছিলে মনে হল দাদাই কথা বলছেন বুঝি!

হৈমবতী ঘরে এল, বাবা তুমি তো আজ স্নান করবে না? যদি কর তো গরম জল করে দি'—

ঠাণ্ডা জলেই স্নান করি আজ—কি বলিস? জিজ্ঞাসু হয়ে তাকান গৌরমোহন।

না-না। আপত্তি করে হৈমবতী, অসুখ হলে তো আমারই ভোগান্তি!

স্নেহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গৌরমোহনের মুখ। হৈমবতীর দিকে তাকিয়ে হাসেন।

অনেকদিন বাদে গৌরমোহন সান্যালের বাড়ি সহজ হাসি-খুসিতে অথৈ হয়ে ওঠে।

বিকেলে চা খাবার সময় সত্যপ্রসাদ বলে, কিমা-মটর তুমি চমৎকার রেঁধেছিলে হৈম! খেতে গিয়ে কাকিমার হাতের রান্নার স্বাদ পেলাম বুঝি।

বাঃ-রে, তা পাবে না কেন! খিলখিল করে হেসে ওঠে হৈম, এতো আমার মায়ের কাছেই শেখা।

গাজরের হালুয়া তৈরি করতে পার এখনও?

জিনিষপত্তর পেলে পারি বৈকি—তেমন খোয়া-ক্ষীর আর ঘি এখানে পাওয়া যায় না। আখরোট আর পেস্তা-কিসমিসের যা দাম!

আজকাল বড্ড খেতে ইচ্ছে করে হৈম। এইসব শীতের দিনে সেকেন্দ্রারাওয়ে গাজরের হালুয়া আর ঘিয়ে-ভাজা অমৃতি খেতাম। হীরালাল রসুইওয়ালার অমৃতির স্বাদ এখনো জিভে লেগে আছে!

দু'জনে কথা বলতে-বলতে সন্ধে নেমে আসে

সত্যপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায়, আজ চলি হৈম। সুশান্ত গেল কোথায়? তাকে দেখছি না যে—

ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

এই সন্ধে-বেলা!

অমনি ওর স্বভাব। ম্লান হাসে হৈমবতী, আবার এস সতুদা! বাবার সঙ্গে দেখা করে যেও কিন্তু।

গৌরমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সত্যপ্রসাদ তার পালঙ্কে বসে, আমি যাচ্ছি কাকা।

আবার আসবে তো?

যাবার আগে একবার চেষ্টা করব। কাজের যা ভিড় কথা দিয়েও হয়তো রাখতে পারব না। সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনকে প্রণাম করে বলে, কাকা যাচ্ছি—

গৌরমোহন বলেন, এখন তো কলকাতায় কিছুদিন থাকবে?

সে'টা কর্তাদের ইচ্ছে—

ভাবছিলাম—। চুপ করে থাকেন গৌরমোহন।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কী ভাবছিলে বাবা?

সত্যপ্রসাদ যদি আমাদের সঙ্গে এসে থাকে—। কথাটা বলতে একটু যেন সঙ্কোচ বোধ করেন গৌরমোহন, তুই কি বলিস মা হৈম?

ভালোই তো। হৈমবতীর গলার স্বরে উৎসাহ-অনুৎসাহ কিছুই বোঝা গেল না।

যে-ক'দিন কলকাতায় আছ তুমি বরং আমাদের সঙ্গে এসে থাক সতু। দাদা নেই। তোমাকে দেখলে দাদার দুঃখ অনেকটা ভুলতে পারব। ক'দিন আর বাঁচব জানিনে—তবু সেই-কয়েকটা দিন যাদের ভালোবাসি তাদের একটু কাছে পেলে ভালো লাগবে বোধহয়। মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে মনও বুড়ো হয়ে যায়। তখন বড় অসহায় লাগে।

বেশ তো আমি আসব। কাজ শেষ করে এখানকায় দিনগুলো এখানেই না-হয় কাটিয়ে যাব।

সতু যদি আসে, দেখিস মা হৈম ওর যেন কষ্ট না-হয়। দাদা আমার জন্যে যা' করেছেন সে কথা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না।

সত্যপ্রসাদকে এগিয়ে দিতে ঘরের বাইরে যায় হৈমবতী।

গৌরমোহন ইজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

এক-একবার ঠাণ্ডা বাতাস পথ-ভুলে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে।

গৌরমোহন হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেন কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। নিজের মনে স্বগতোক্তি করেন, হৈম এখনো আলো জ্বেলে দিয়ে গেল না তো!

অনেকক্ষণ বসে থেকেও কারো সাড়া না-পেয়ে গৌরমোহন ডাকেন, হৈম—অ-হৈম—

কী বাবা। হৈমবতী ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে দিল, ওমা এখনো ঘরের আলো জ্বালা হয়নি।

বলছিলাম, সেই জামিয়ারটা কোথায় ?

আমার কাছে আছে বাবা। বের করে দেব ?

একবারটি বার করে দে তো মা। গায় দেব। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

একটু পরে হৈমবতী জামিয়ারটা এনে গৌরমোহনের হাতে দিল, এই নাও বাবা—

জামিয়ার হাতে নিয়ে গৌরমোহন আনমনা হয়ে যান দাদাকে আজ বড্ড মনে পড়ছে। আমার বিয়ের সময় দাদা এটা আমাকে দিয়েছিলেন। গাঁদাফুলের পাপড়ির মতো রঙ—তেমনি সব ঝাঁকিবুকির নক্সা। ভেবেছিলাম সত্যপ্রসাদের সঙ্গে তোর যদি বিয়ে হয় তবে তাকে দেব।

জামিয়ার গায় দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন গৌরমোহন।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় হৈমবতী।

কয়েকদিন পরে ভোরে উঠে হৈমবতী সদর খোলা দেখে ভাবে সুশান্ত বোধ হয় বাগানে গেছে। পাগল ছেলে। রোজ এই সময় ফুলের বাগানে ঘোরে। মরশুমি ফুলের ঋতু আসছে—সকালে উঠেই ঋতুর অতিথিদের তদারকে লেগে যায়।

গৌরমোহন দরজা খুলে বাইরে এলেন।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, খোকা আবার গেল কোথায় বাবা ?

কি জানি। বেরিয়েছে নাকি ?

সদর খোলা পড়ে রয়েছে। বাগানে গেছে বোধ হয়।

ক'দিন আগে বিষ্টি হয়ে গেল। গৌরমোহনকে চিন্তিত মনে হয়, জাঁকিয়ে শীত এসেছে। ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ডেকে নিয়ে আয়।

হৈমবতী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে, খোকা—অ-খোকা—

ফিকে অন্ধকার-ঢাকা গাছপালার ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগান পেরিয়ে গেট পর্যন্ত চলে গেল হৈমবতী। রেল লাইনের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে এপাশে-ওপাশে সুশান্তর কোন চিহ্ন নেই। আবার ফিরে এল হৈমবতী।

গৌরমোহন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, পেলি?

না বাবা।

সকালেই হয়তো বেরিয়েছে কোন অকাজে। ঘরের দিকে ফিরেও থেমে গেলেন গৌরমোহন, এডুকেশন্ কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি যায় নি তো খিদিরপুরে?

এত সকালে!

বলছিল, চেয়ারম্যানমশাইকে মর্নিংওয়াকের সময় ধরতে না-পারলে কথা বলা যায় না।

কেন?

দাদুভাই বলে, কতলোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে দাদু। তাদের বড়-বড় কাজ। সেখানে সামান্য চাকরির উমেদার হয়ে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে!

কি জানি, আমাকে তো প্রায়ই বলে, মা পয়সা দাও কাগজ কিনতে হবে দরখাস্তের জন্যে—

আমি বলি, রোজই তো কাগজের জন্যে পয়সা নিচ্ছিস?

খোকা বলে, রোজই প্রায় লিখতে হয়। কাউন্সিলর্ বলেন, খুঁজে পাচ্ছি না। আরেকটা লিখে দাও। চেয়ারম্যান বলেন, ব্যাক ডেটেড্ হয়ে গেছে। আরেকটা দিয়ে যেও। আমি তো মাত্র একজন কাউন্সিলর দু'জন চেয়ারম্যান পার করেছি। এমন একজন ক্যাণ্ডিডেটের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তিনজন কাউন্সিলর সাতজন চেয়ারম্যানের রাজত্ব-ভোর দরখাস্ত করে গেছে তবু ভাগ্যে কিছু জোটে নি।

আমি বলি, সত্যি কি ওরা লোক নেয় ?

খোকা বলে, না-হলে স্কুল চলছে কি করে।

তবে সে কারা ?

ও ঠোঁট উলটে দেয়, কে জানে কারা! কারো-কারো হয় দেখেছি। তবে কাদের হয়—কেমন করে হয়—কোন কোয়ালি-ফিকেশনে হয় সে খবর বাইরের কারো জানবার উপায় নেই! একটু থেমে হৈমবতী বলে, আজ স্কুলে যাব বাবা ?

তা যা' না।

ভাবছি, তুমি একলা থাকবে।

দাদু-ভাই হয়তো এসে যাবে এর ভিতর—

দুশ্চিন্তা নিয়ে স্কুলে গেল হৈমবতী। ফিরে এসে দেখে গৌর-মোহন একলাই রোদে পিঠ ডুবিয়ে বসে আছেন। আর কারো সাড়া নেই। শুধু বারান্দায় ঝোলান বাঁশের খাঁচায় বসন্তগৌরি পাখিটা একটানা শিস দিচ্ছে।

বাবা, খোকা এখনো ফেরে নি ?

না তো। ক'টা বাজে এখন ?

এগারোটা তো বেজে গেছে।

এসে যাবে এখুনি। হাই তোলেন গৌরমোহন, রোদটা বেশ লাগছে।

তবু হৈমবতীর দুশ্চিন্তা দূর হয় না। দুপুরে বাবাকে খাইয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসে। দোতলার জানালায় বসে বাড়ি থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত সবটুকু পথ দেখা যায়। সেইখানে বসে মা হৈমবতী ছেলে সুশান্তর জন্যে অধীর আগ্রহে অধৈর্য অপেক্ষা হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে একটা মালগাড়ি পার হয়ে গেল। তার একটানা একঘেয়ে শব্দ বাতাসে কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে যায়।

অসহায় একটা অনুভব হৈমবতীকে ঘিরে রাখে। পৃথিবীতে ভরসা করবার মতো কিছু নেই। বারবার মনে হচ্ছে, কি যেন

হারিয়ে গেল! চোখ জলে ভরে উঠছিল। জানালার গায় মাথা রেখে ফিসফিস করে, ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ, আরো কি সাধ তোমার আছে!

ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈমবতী। গৌরমোহনের গলা শুনে জেগে ওঠে।

দাদু এসেছে?

উপর থেকেই হৈমবতী জবাব দিল, না বাবা। আশঙ্কায় তার গলা থমথমে। হৈমবতী নিচে নামতে গৌরমোহন বলেন, লাঠিটা দে তো মা একবার খোঁজ-খবর করে আসি।

তুমি আবার কোথায় যাবে বাবা!

দেখি একবার—কাছে-পিঠে কোথাও খোঁজ পাওয়া যায় কি না! এদিকে তো দিন গড়িয়ে বিকেল হল—

দেখ। উদাস হয়ে জবাব দেয় হৈমবতী, তেমন ছেলে আর কি যে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে!

লাঠি হাতে নিয়ে গৌরমোহন গেটের দিকে এগোলেন।

বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল হৈমবতীর কিন্তু বসে থাকলে তো চলে না। সংসারের কাজে মন দিল। কাপড় গোছ-গাছ করা, ঝাটপাট দেওয়া—বিছানা পেতে রাখা বিকেলে এখন অনেক কাজ।

মা। যে-মুহূর্তে সুশান্তর ভাবনা ছেড়ে হৈমবতী অন্যমনস্ক সেই মুহূর্তে তার গলার স্বর ভেসে এল।

হৈমবতী বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে চোখে পড়ে সুশান্ত উপরে উঠে আসছে?

কী ছেলে তুই!

সুশান্ত সামনে রাখা গৌরমোহনের চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলে, চা হবে মা?

সারাদিন তুই ছিলি কোথায় শুনি একবার?

বলছি, একটু জিড়িয়ে নিতে দাও আগে। প্রায় দশ মাইল পথ হেঁটে আসছি। একটু জল গরম করে দাও—সারাদিন স্নান করিনি

হৈমবতী দ্রুত পায় রান্না ঘরে চলে গেল। বুকের ভিতরটা এখন হালকা হয়ে গেছে।

সুশান্তকে চা এনে দিয়ে হৈমবতী বলে, সারাদিন বাইরে থাকিস একবার বলেও যাস না! জানিস তো আমার বুক কাঁপে—কী করে যে দিন কাটে আমিই জানি? কোথায় গেছিলি তুই?

বললে বিশ্বাস করবে না তাই বলি নি।

কী এমন ব্যাপার শুনি—

তোমাকে তো বলেছি মা কয়েকদিন আগে বিকেলে মেঘ করেছিল। সেই সময় বিছানায় শুয়ে কেমন তন্দ্রা এসে গেল—আর হঠাৎ আমি আগের জন্মের বাড়ি বাবা-মা ভাই-বোন সবাইকে দেখতে গেলাম! তোমাকে যেমন দেখছি তেমনি দেখলাম।

চোখ বড় হয়ে ওঠে হৈমবতীর, বলিস কি খোকা!

সত্যি মা, আর জন্মের খেলার সঙ্গীর নামটাও মনে পড়ে গেল। সবটা ভালো করে দেখার আগে মিলিয়ে গেল। অনেকবার চেষ্টা করেও আর দেখতে পেলাম না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। ক'দিন ধরে তাই ভাবছিলাম একবার বেরিয়ে পড়ি। আমার আগের জন্মের গ্রামটা হয়তো কাছাকাছি কোথাও পেয়ে যেতে পারি।

কিন্তু নদী না পেলে তো হবে না। তাই যেতে পারিনি। সেদিন একজন লোকের কাছে খবর পেলাম মালতীপুর থেকে আট দশ মাইলের মধ্যে ছোট্ট একটা নদী আছে। গাঁয়ের লোক কালো জলের জন্যে তাকে আদর করে যুমনি বলে ডাকে। নদীর দু'পাশে অনেক গ্রাম। কুঁদগা চণ্ডীমাপুর গৌরীগ্রাম চালতে-ডাঙা। আগে মার্টিনের ট্রেনে যাওয়া যেত। এখন ট্রেন নাই। চলে গেলাম হেঁটে। বললে বিশ্বাস করবে না মা প্রায় মিলে গেছিল!

হৈমবতী অবাক হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

মুসকিল হল সে বাড়িতে আমার মতো কেউ মারা যায় নি। মনে-মনে বাবার যেমন ছবি এঁকে রেখেছিলাম তেমনি একজন সেই

বাড়ির কর্তা। স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। আমাকে বললেন, তুমি তো আমার ছাত্রের মতো—।

হেড্‌মাষ্টার মশাইয়ের বৌ বললেন, ঠিক যেন আমার বড় ছেলে স্থহাসের মতো! থাক না ক'দিন এখানে—

আমি বললাম, থাকতে পারব না। আমি আমার আগের জন্মের বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছি।

শুনে তারা তো অবাক।

হেড্‌মাষ্টার মশাইয়ের বৌ বললেন, খুঁজছ কেন? সে সম্পর্ক তো চুকে-বুকে গেছে!

ইচ্ছে করছিল বলি, এ-জন্মে আমাদের বড় কষ্ট। বাবা নেই। হারিয়ে গেছেন। তাই আগের জন্মের স্থখ-শান্তি ফিরে পেতে চাই। ভদ্রমহিলাকে আমার মা বলে ডাকতে বড্ড ইচ্ছে করছিল।

তা' ডাকলেই পারতিস—

কি জানি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে না। চলে আসবার সময় ভদ্রমহিলা বললেন, আগের জন্মের ভাই-বোনদের যদি না পাও এখানে তোমার দুটো ভাই-বোন আছে! তাদের সঙ্গে এসে থাক না।

তোমাকে কি বলব মা সেই সকালে একবাটি দুধের সঙ্গে পুরু সর আর বড় বড় বাটা মাছ দিয়ে ভাত খেতে দিল। কতো যত্ন করে খাওয়ালেন। শেষে বললেন, আগের জন্মের মাকে যদি খুঁজে না পাও আমার কাছে এসো। আমি তোমার আগের জন্মের মা হব।

বেরিয়ে এলাম সেই বাড়ি থেকে—পথে চলতে-চলতে অনেকক্ষণ চোখ ছলছল করছিল। কতক্ষণ হেঁটে গেলাম সেই যুমনির পাশ দিয়ে—নির্লিপ্ত এক জীবন এপারে-ওপারে জলের সঙ্গে সমানে বয়ে চলেছে।

একবার বসলাম সেই নদীর ধারে—তারপর কখন ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম মনে নেই। উঠে আবার খুঁজতে লাগলাম। গাঁয়ের পর গাঁ পার হয়ে গেলাম। বাড়ি হয়তো মিলে যাচ্ছে—আশ-পাশ মিলছে না।

পথের ধারে জানালার কাছে বসে থাকা একটা মেয়ে বলল, মা এই পথ দিয়ে একজন যাচ্ছিল ঠিক বড়দার মতো—

শুনে গাছপালার আড়ালে থমকে দাঁড়ালাম।

তোর বড়দা হবে কি করে!

সত্যি মা—দাদার মতোই হাটবার ভঙ্গী। মুখটা দেখলে দাদার কথাই মনে হয়।

কোথায় রে?

এই তো দেখলাম পথে। তারপর কোথায় চলে গেল—

হতে পারে। বাড়ির মায়া তো ত্যাগ করতে পারে না তাই আসে। একবছর হল চলে গেছে—হয়তো সেখানে গিয়েও ভুলতে পারে নি তাই হয়তো এসেছিল; আর তোকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

তাই হবে বোধহয় মা। মেয়েটি উত্তর দিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হৈমবতী বলে, কেন যে এমন পাগলামি করিস বুঝতে পারি না। এক জন্মের সম্পর্ক থাকে না তুই আগের জন্মের সম্পর্ক খুঁজে মরিস।

কি জানি মা। মিনমিন করে সুশান্ত, এ বাড়িতে এত দুঃখ এত খেদ জমে আছে এখানে আর একটুও ভালো লাগে না। বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুশান্ত, আজ কিছুতেই খুঁজে বের করা গেল না—আরেকদিন বেরুতে হবে।

এ সব পাগলামি যদি ছাড়তে না পারিস তো ভুগে মরবি খোকা।

একে তুমি পাগলামি বল মা?

কী বলব তবে?

মনে-মনে যেন উত্তর দিতে গিয়ে সুশান্ত মৃদুকণ্ঠে বলে, কি জানি।

সারাদিন অনেক ঘুরেছ এখন খেয়ে নেবে চল। রান্নাঘরে যেতে-যেতে হৈমবতী বলে, কাল কেরোসিন তেল এনো—না-হলে পরশু থেকে আর খাবার হবে না কিন্তু—

সুবোধ ছেলের মতো সুশান্ত হৈমবতীর পিছনে উঠে যায়।

খেয়ে-দেয়ে ছেলে উপরে উঠে গেলে হৈমবতী সেলাইয়ের টুকিটাকি নিয়ে বসে। বড় ভয় করে হৈমবতীর—সুশান্ত হয়তো এমনি একদিন বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। আর হয়তো ফিরবে না। ঠিক জলজ্যান্ত দুটো মানুষ ঠাকুমা আর জ্যাঠামশাই যেমন চিরকালের মতো ফেরার হয়ে গেলেন। কেদার-বদরি করতে গেছিলেন তারা। মাঝে মাসখানেক খবর ছিল না। মথুরা আর বৃন্দাবনে দিনকয়েক থেকে ফিরবেন কথা ছিল। ভাবনার কিছু ছিল না। তবু হঠাৎ একদিন খবর এল। সুরপতিই সেই ভয়ঙ্কর খবর নিয়ে এল।

বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে খোলা জানালার ধারে চুল বাঁধতে বসেছিল হৈমবতী। সুরপতি অফিস থেকে আসবার আগে সেজে-গুজে তৈরি হতে হবে। সুরপতি এলে চা চড়িয়ে দেবে।

সুরপতি একদিন বলেছিল, তুমি রোজই একরকম খোঁপা বাঁধ কেন ?

ওমা, কে বলল ?

দেখি যে—

না তো।

তা'হলে আমি মিথ্যে বলছি।

হৈমবতী উত্তর দিয়েছিল, তিনশ' পঁয়ষট্টি রকম চুল বাঁধতে জানি না বটে তবে মাঝে-মাঝে পালটে দি তো—

সুরপতি আর কিছু বলে নি। তবু হৈমবতী রোজ খোঁপা বাঁধায় বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করত। কুটিটুকু ফুল জড়িয়ে পরিপাটি করত। তেমনি চুল বাঁধছিল। সামনে আয়না। কালো ফিতে দাঁত দিয়ে ধরা ছিল।

সেদিন সুরপতি একটু আগেই এল। দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমবতীর দিকে নিস্তেজ চোখে তাকিয়ে খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ে।

অন্যমনস্ক হৈমবতী সুরপতির শুয়ে পড়া প্রথমে খেয়াল করে নি। পরে চোখে পড়তে জিজ্ঞাসা করল, শুয়ে পড়লে যে ?

সুরপতির সাড়া নেই। চোখের উপর হাত তুলে ঝিম মেরে শুয়ে থাকে।

হৈমবতী উঠে গিয়ে সুরপতির গায় হাত দিয়ে বলে, চুপ করে শুয়ে পড়লে যে—শরীর খারাপ নাকি ?

সুরপতি পকেট থেকে কাগজ বের করে বলল, থানা থেকে খবর দিয়ে গেল।

কিসের খবর ? হৈমবতীর গলা কেঁপে যায়।

পড়ে দেখ —

তুমি পড়। আমার হাত কাঁপছে—পড়তে পারছি না।

কেদার-বদরি যাবার পথে খাদে বাস পড়ে ঠাকুমা আর জ্যাঠামশাই মারা গেছেন।

প্রথমটা ভালো করে বুঝতে পারে নি হৈমবতী। তারপর সুরপতিকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অল্প পরিচয় স্বল্প সান্নিধ্য-- তবু তারা যেন আপন করে নিয়েছিলেন হৈমবতীকে। ঠাকুমার সকৌতুক হাসিমুখটা যেন বারবার চোখের সামনে ভাসছিল। কতদিন আদর করে বলতেন, শাশুড়ি নেই দিদিভাইয়ের কত কষ্ট ! যে-কদিন ছিলেন বুঝতে দেননি কিছু। সব দিকেই কড়া নজর ছিল তার। সন্ধের আগেই নাতিকে ডেকে পাঠাতেন, দিদিভাইকে নিয়ে বেড়াতে যাও—

সুরপতি আপত্তি করত, কাজ আছে ঠাকুমা—

ঠাকুমা ধমক দিতেন, এত যদি কাজ তবে বিয়ে করতে গেলি কেন শুনি ? বৌমাকে আমি বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দি বরং—

নরম হয়ে যেত সুরপতি, বড্ড দরকারি কাজ ছিল ঠাকুমা—

এইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কাজ। হৈমবতীকে ডেকে ঠাকুমা বলতেন, যাও একটু বেড়িয়ে এস দিদিভাই। লেখাপড়া-জানা মেয়ে তোমরা—আমাদের মতো সারাদিন বাড়ি থাকতে পার নাকি!

সুরপতি এক-একদিন নিজেই হৈমবতীকে ঠাকুমার কাছে পাঠিয়ে দিত, যাও গিয়ে বল, ঠাকুমা তোমার নাতি বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে না।

নড়বড়ে কোমর নিয়ে ঠাকুমা দরজায় এসে দাঁড়াতেন, কী ভেবেছিস তুই?

সুরপতি উত্তর দিত, ভেবে তো রেখেছ তুমি—

কি করে!

বাঃ, সকালবেলাই তো জর্দা আনতে বললে বড়বাজার থেকে—বল কি করব এখন? তোমার নাত-বৌকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরুব না জর্দা আনতে যাব?

হাসতেন ঠাকুমা, তুই বড্ড লায়েক হয়েছিস আজকাল!

বিয়ের পর একটা-কি-দু'টো গ্রীষ্ম ঠাকুমাকে পেয়েছিল হৈমবতী। সেই ঠাকুমা নেই। জ্যাঠামশাই নেই। কিছুতেই ভাবতে পারছিল না। সময় লেগেছিল সামলে উঠতে। সুরপতি সহজে সামলাতে পারেনি। একমাস ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসেছিল। হৈমবতীকে প্রায়ই বলত, চল দিনকয়েক বাইরে ঘুরে আসি। এ বাড়িতে আর থাকতে পারছি না।

ঠাকুমার একটা পোষা ময়না ছিল। দিনরাত ডাকত, রাধে-কেষ্ট—রাধেকেষ্ট—

সুরপতি একদিন খাঁচার দরজা খুলে দিল।

হৈমবতী বলল, করলে কী?

উড়িয়ে দিলাম—বেচারিকে আটকে রেখে কী হবে! ডেকে-ডেকে সবসময় ঠাকুমার কথা মনে পড়িয়ে দেয়—এত মন খারাপ

হয়ে যায় কী বলব! মাকে তো দেখিনি, মা-ঠাকুমাকে মিলিয়ে আমার ঠাকুমা—

এতবড় দুর্ঘটনার পর যৌবনের উচ্ছল দিনগুলো যেন নিরর্থক হয়ে গেল।

সেই সময়ে একদিন বিকেলবেলা ছাদে একজনকে দেখে হৈমবতী অবাক! তখনো স্পষ্ট আলো। মাথায় একরাশ চুল এলিয়ে আছে। কী সুন্দর মুখ! লালপেড়ে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে। আচমকা অপরিচিত একজনকে ছাদে দেখে চমকে উঠেছিল হৈমবতী। জানালার কপাট টেনে সুরপতির কাছে সরে গেছিল।

কী হল তোমার! উঠে এলে যে?

কাকে যেন দেখলাম ছাদে—! হৈমবতী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল!

দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় সুরপতি, রাঙা-মা তুমি উপরে কেন?

ফিসফিসে গলা শোনা গেল রাঙা-মার, নিচে বড় গরম তাই হাওয়া লাগাচ্ছি।

না। সুরপতির গলার স্বর স্বাভাবিক ভারি, তুমি উপরে এস না। হৈম ভয় পায়।

ছোট মেয়ের মতো হেসে উঠলেন রাঙ-মা, আচ্ছা। তারপর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটু থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুত নেমে গেলেন, আমায় দেখে ভয় পায়!

সুরপতির পিছনে হৈমবতী দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, কে?

উনি যে কে আমিও ঠিক জানি না। একতলায় থাকেন— ছোটবেলা থেকেই রাঙা-মা বলে ডাকি, কে শিখিয়েছিল আজ আর মনে নেই।

হৈমবতী অবাক হয়ে সুরপতির মুখের দিকে তাকায়, আগে তো কখনো দেখিনি!

দেখা দেন নি তাই দেখ নি। এখন ঠাকুমা নেই—জ্যাঠামশাই নেই—তাই হয়তো—

ও। তবু কৌতূহল থামানো গেল না। হৈমবতীর মনে প্রশ্ন জেগে থাকে। কোথায় যেন রহস্য অনুচ্চারিত হয়ে রইল।

একতলার অন্ধকার সম্পর্কে হৈমবতীর কৌতূহল সহসা সজাগ হয়ে ওঠে। সময় পেলেই তিনতলার রেলিংয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকত।

জল-বোঝাই এক চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে কাকা মন্ত্রোচ্চারণ করতেন :

মেঘাঙ্গী শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীম্।
পাণিভ্যাম্ভয়ং বরঞ্চ বিকষদ্ রক্তারবিদ স্থিতাম॥

শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গেছিল হৈমবতীর। কাকাকে দেখে কিন্তু ভয় করত। রোগা কালো। কষ-পাথরের চেয়েও বুঝি কালো। গোঁফ-দাঁড়িতে আচ্ছন্ন মুখে স্পষ্ট শুধু শিরা-ওঠা জ্বলজ্বলে দু'টো চোখ। তার কানায়-কানায় হিংস্র একটা হলুদ ছায়া।

সুরপতি বলে, নিচে নেম না—

কেন ?

ভয়-টয় পেতে পার।

কীসের ভয় ? অবাক হয়েছিল হৈমবতী।

কাকা ওই সব তন্ত্রসাধনা করেন—পিশাচ-প্রেতাত্মারা ঘোরাঘুরি করে হয়তো।

ধুর্ তাই আবার হয় নাকি !

সত্যি।

আমি বিশ্বাস করি না।

সে তোমার ইচ্ছে। তবে ভয় পেতে পার। সুরপতি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতে পারে।

ঈস্! দর্পিত ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল হৈমবতী, এ তোমাদের

বাংলাদেশে ললিত-লবঙ্গলতা নয়। উত্তর ভারতের পাথুরে দেশের মেয়ে। পাথরের মত শক্ত!

ঠাকুমা মারা যাবার পর সংসারের কাজ হালকা হয়ে গেল। ঠাকুমা থাকতে কাজের যেন অন্ত ছিল না। রান্না চুকল তো ঠাকুমার সঙ্গে থেকে আচার নিয়ে বসতে হত। লংকা থেকে লেবুর আচার। শীতকালে বড়ির পাট—হিংয়ের বড়ি কুমড়োর ফুল-বড়ি। ঠাকুমা বলতেন, কষ্ট হবে তোমার দিদিভাই তবু শিখে নাও—চিরকাল তো থাকব না। বয়েসের তো আমার গাছ-পাথর নেই—আজ আছি কাল নেই।

কোমরে ব্যথা ছিল ঠাকুমার। তেল মালিস করে দিতে হত। হেসে বলতেন, তোমার হাতের সেবা পাবার জন্যেই হয়তো বেঁচে আছি—

দু'বার করে পান সেজে ডিবে ভরে হাতের কাছে রেখে দিতে হত! চুণ জর্দা-খয়ের আর সুপুরি তৈরি রাখতে হত কাছাকাছি। বলা তো যায় না কোনটে কম হবে! ঠাকুমা বলতেন, পানগুলো একটু থেঁতলে দাও তো দিদিভাই। মাড়ির দাঁতে আর জোর পাইনে। সংসারের কাজ আর এইসব ফাই-ফরমাস খাটতেই দিন চলে যেত হৈমবতীর। দিদিমা মারা যাবার পর সময় যেন যেতে চায় না। সুরপতি অফিস যাবার পর অনন্ত অবসর!

একদিন বেড়াতে বেরিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তোমাদের এই রাঙা-মা কে?

জানি না। সুরপতি একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

সারাদিন একতলার ঘরে কি করে?

কি জানি।

এক বাড়িতে থাক অথচ জান না!—আশ্চর্য তো।

জানতে চাই না তাই জানি না। সুরপতি বিরক্ত হল বুঝি।

হৈমবতীর মনে হত, একতলার স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে কুয়াসার

মতো রহস্য জমে আছে। তাকে ধরা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। চারদিকে চায়ের বাকসের মতো সাজানো ঘর। মাঝখানে মস্ত এক শ্যাওলাধরা চৌবাচ্চা—সেখান থেকে জল উবছে পড়ে সারাটা উঠোন পিছল হয়ে আছে। সকালে সেখানে একটু যা' আলোর ছিটেফোঁটা থাকে ; দুপুরের পর থেকেই অন্ধকার।

তিনতলার বারান্দা থেকে হৈমবতী কখনো উঁকি দিয়ে দেখেছে, কাকা সেই ভিজে উঠোনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে ঘুম ভেঙে কাকার উৎকট চিৎকার শুনেছে। অন্ধকারে চোখ মেলে চিৎকারের মানে বুঝতে চেয়েছে। সুরপতি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাকামশাইয়ের কথা একটুও বোঝা যেত না—রাঙা-মার কান্না স্পষ্ট হয়ে উঠত।

একদিন রাত্রে রাঙা-মার কথা স্পষ্ট শোনা গেল, আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাব—সারাবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাব!

রাত্রির স্তব্ধতায় কথাগুলো যেন আহত সাপের মতো ফুঁসে উঠছিল।

ঘুম ছিল না হৈমবতীর চোখে। অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করছিল। ইচ্ছে করছিল একবার রেলিংয়ের উপর গিয়ে ঝুঁকে পড়ে। সাহস হয় নি। সুরপতি জেগে যেতে পারে।

একদিন রাঙা-মা নিজে থেকে আলাপ করতে এলেন। টুকটুকে মানুষটি—বয়েস কত বলা কঠিন। পঁয়ত্রিশ হতে পারে। পঞ্চাশ হলেও হৈমবতী আশ্চর্য হত না। পানের রসে ঠোঁট লাল। আট-সাঁট গাঁথুনি শরীরে। চাপা একটা হাসির আভাস ঠোঁটের গায় ফুল হয়ে আছে। নাকচাবিতে ছোট্ট একটা চুনী ঝিকমিক করছে।

কী করছ বৌমা?

আসুন রাঙা-মা, বই পড়ছি—

তুমিও রাঙা-মা বলছ! খিলখিল করে হাসেন রাঙা-মা।

হৈমবতী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, তবে কি বলব বলুন?

কিছু-না কিছু-না। তারপর নিজের মনে বলেন রাঙা-মা, মা হতেই তো চেয়েছিলাম—

বসবেন না ?

রাঙা-মা উত্তর না-দিয়ে খোলা ছাদের দিকে চলে গেলেন। যেখানে বসে ঠাকুমা রোদ পোয়াতেন বড়ি দিতেন আচার বানাতেন সেইখানে বসে চুল আঁচড়াতে থাকেন তিনি। জানালার আড়ালে বসে লক্ষ্য করে হৈমবতী। নিজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন রাঙা-মা।

বাতাসে রদ্দুর নিভে আসে। পশ্চিমের আকাশ রঙে-রঙে ছয়লাপ। সন্ধের অনতিপরিসরে টবে-বসানো বেলি আর বোগেন-ভিলিয়ার পাতা বাতাসে ফিসফিস করে কথা বলত তখন।

একটু বাদে পায়ের শব্দ পাওয়া যেত সিঁড়িতে। পরক্ষণে দরজায় সুরপতির মুখ উঁকি দিত—মুখে অসামান্য হাসি। এরই জন্যে সারাদিন বুঝি প্রতীক্ষা করে থাকত হৈমবতী।

কি করছ ?

চায়ের জল বসাচ্ছি।

যদি দেরি করে আসতাম ?

তোমার পায়ের শব্দ শুনে চাপিয়েছি মশাই।

তাই নাকি ? খাটের ধারে বসে সুরপতি বলে, সারাদিন তোমাকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হয় হৈম।

সত্যি ?

বিশ্বাস কর। কাজ করতে-করতে শুধু ঘড়ির দিকে তাকাই কখন পাঁচটা বাজবে। সুরপতি উঠে জামাটা হ্যাংগারে রাখতে গিয়ে বলে, আজ কি খাবার বানাবে ?

তুমি বল ?

সিঙ্গাড়া খাওয়াও না।

পুর নেই যে—অন্য কিছু বল—

বড্ড সিঙ্গাড়া খেতে ইচ্ছে করছে।

তা'হলে বাইরে থেকে নিয়ে আসি ?

আনতে গিয়ে হারিয়ে যাও যদি ?

গেলামই বা—

সিঙ্গাড়ার বদলে তোমাকে হারানোর লোকসান আমার সইবে না।

হাসে হৈমবতী, তা'হলে আজ তোমাকে দুধ-পাউরুটি খেতে হবে —কাল সিঙ্গাড়া—

শুধু দুধ-রুটি নয় আরেকটা জিনিস খাব—

কি ?

কাছে এস। হৈমবতীকে কাছে টেনে নিয়ে সুরপতি তার ঠোঁট হৈমবতীর অধরে চেপে ধরে।

হঠাৎ হৈমবতী দেখে দরজায় কার ছায়া পড়েছে। চমকে উঠে বলে, কে ?

সুরপতি দরজার কাছে ছুটে যায়, কে ?

দেখে রাঙা-মা মুখ ফিরিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন। রেলিংয়ের গায় দাঁড়িয়ে সুরপতি রাগে ফোঁসে। হৈমবতী জোর করে সুরপতিকে ভিতরে টেনে আনে।

সুরপতি জিজ্ঞাসা করে, রাঙা-মা কি করছিল ?

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে দরজার চৌকাঠ থেকে হাত নামিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে সরে গেলেন।

রাঙা-মা উপরে এসেছিল তুমি জানতে না ?

স্বামীর কাছে সেই প্রথম মিথ্যেকথা বলে হৈমবতী, না—নাতো—তারপর কতবার ভেবেছে হয়তো এই মিথ্যেকথার পাপে তার জীবন ছারখার হয়ে গেল।

আমি নিষেধ করেছি তবু কেন যে ছাদে আসে!

আসুক না। আমাদের কি—সারাদিন হয়তো একতলার অন্ধকার ভালো লাগে না।

না। সুরপতির গলার স্বর বে-মানান ভাবে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, উপরে আসা আমি একদম পছন্দ করি না।

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারে না হৈমবতী।

পরদিন সকালে সুরপতি অফিস যাবার পর রাঙা-মা এলেন, কি করছ বৌমা ?

দরজার দিকে পিছন ফিরে রান্না করছিল হৈমবতী।

রান্না করছ বুঝি ?

হ্যাঁ

কাল কি সুরপতি খুব রাগ করেছে ?

আপনি আর আসবেন না রাঙা-মা, আমার স্বামী রাগ করেন।

কেন ? অবাক হলেন রাঙা-মা, সুরপতি রাগ করে কেন ?

জানি না তো।

আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। স্বগতোক্তি করেন রাঙা-মা, ক্ষতি যা সে তো আমারই হয়ে গেছে—

হৈমবতী একথার উত্তর দেয় নি।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রাঙা-মা আবার বলেন, আর আসব না। কথাটা বোধহয় নিজেকে বলে নিচে নেমে গেলেন রাঙা-মা। অনেকখানি নেমে গিয়ে রাঙা-মা আবার উঠে এলেন, আর কিছু না শুধু তোমাদের সংসার দেখতে আসি সুখ দেখতে আসি—দেখে ভাবি, সংসারের এই সুখ থেকে আমি এ-কোন নরকে পড়ে আছি। আমাকে ভয় করো না—আমিই সবাইকে ভয় পাই।

সন্ধেবেলা সুরপতি বাড়ি ফিরতে হৈমবতী গরম সিঙ্গাড়া খাইয়ে খুশি করে।

কেমন হয়েছে বল ?

চমৎকার হয়েছে !

একটু চাটনি দেব ?

দাও। তারপর হেসে সুরপতি বলে, আমাকে হিন্দুস্থানী করে ফেললে যে!

বিয়ে তো করেছ হিন্দুস্থানী! হৈমবতীও হাসে।

খেতে-খেতে সুরপতি জিজ্ঞাসা করে, রাঙা-মা এসেছিল?

হ্যাঁ। একটু বুঝি ভয় পায় হৈমবতী।

কিছু বলছিল?

বললেন, বৌমা আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। করতেও চাইনি। ক্ষতি যা-কিছু সে তো আমারই হয়েছে। আমাকে এত ভয় কিসের?

চুপ করে থাকে সুরপতি।

অনেকক্ষণ বাদে হৈমবতী বলে, আচ্ছা রাঙা-মাকে তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় যে পাই তা'নয় তবে ভয় করে। ওই সব তন্ত্র-টন্ত্র বুঝি না। ওসব নিয়ে যারা থাকে তাদের ভয় করে। বিশ্বাসও করা যায় না। কাকা সারারাত ঘুমোয় না। উৎকট চিৎকার করে। রাঙা-মাকে মারে। রাঙা-মার সেই কান্নার শব্দে ভয় পাই। তাই ওদের সরিয়ে রাখতে চাই—কাছে আসতে দিতে চাই না।

গৌরমোহন স্টেশন থেকে এলেন, দাদু ফিরেছে?

এই তো খানিক আগে এল।

শুয়ে পড়েছে নাকি?

খেয়ে তো উপরে গেল।

গৌরমোহন ঘরে গেলেন।

হৈমবতী উঠে গৌরমোহনের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন, বাবা খাবে নাকি এখন?

তোর তাড়া আছে নাকি?

না, তাড়া আর কি—তোমার দেরি থাকলে টুকিটাকি সেলাইয়ের কাজগুলো সেরে নিতাম।

বেশ তো সেরে নে। আমি একটু বই-টই দেখি।

নিজের জায়গায় এসে বসে হৈমবতী।

বিয়ের পর দিনগুলো যেন বাতাসের মতো সহজ আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

সেই সব দিনে সুরপতি বুঝি হৈমবতীকে নিয়ে ছাদের নিভৃতে দিনরাত্রির প্রহরে-প্রহরে মালা গেঁথে তুলছিল। ছুটির দিনে দু'জনে বেরিয়ে পড়ত কাছে-দূরে। কখনো দূরে-অদূরে।

রাঙা-মার উপস্থিতি মাঝে-মাঝে ছন্দোপতন ঘটাচ্ছিল।

সুরপতি অফিসে গেলে রাঙা-মা উপরে আসতেন, কি করছ বৌমা?

ওমা, আপনি কতক্ষণ?

এই এলাম।

বসুন।

বসতেই এলাম।

রাঙা-মা ভিতরে বসতেন না। রান্নাঘরের বাইরে দরজার গোড়ায় বসতেন পিঁড়ি পেতে। সঙ্গে পানের ডিবে থাকত। পুরো পান খেতেন না। আধখানা ছিঁড়ে মুখে দিতেন—সঙ্গে খানিক জর্দা। দূর থেকেও গন্ধ পেত হৈমবতী। পানের রসে রাঙা-মার ঠোঁট টুকটুকে লাল হয়ে থাকত।

রাঙা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনটাকে ছুঁতে চাইত হৈমবতী। মনে হত গভীর কিছু রহস্য বুঝি লুকিয়ে আছে তার অতীতের অন্ধকারে। মাঝে-মাঝে রাত্রে তার যে চাপা কান্না গুমরে ওঠে সেকি অতীতের অনুশোচনা! না, তার থেকে আরও কিছু বেশি?

রাঙা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার কিছু উপায় নেই। রাত্রির কোন সংবাদ লেখা নেই তার চোখের পাতায়। মুখের বিস্তারে।

পান মুখে দিয়ে রাঙা-মা বলেন, কি ভাবছ বৌমা?

কিছু নাতো রাঙা-মা। তরকারিতে নুন দিলাম কিনা মনে করতে পারছি না।

পানের বোঁটা থেকে দাঁতে চুন কেটে নিয়ে রাঙা-মা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথায় যেন থাকতে বৌমা ?

সেকেন্দ্রারাও সহর—আলিগড় জেলায়। হাতরাশ জংশনে নেমে বাসে যেতে হয়।

বৃন্দাবনের কাছে নাকি ?

খুব বেশি দূরে নয়।

তবু ?

ট্রেনে যেতে একটু সময় লাগে। বাসে ঘণ্টা তিনেকের বেশি নয়।

তুমি গেছ নাকি সেখানে ?

কতবার। শ্রাবন মাসে ঝুলনে গেছি। মায়ের অসুখের সময় তো তিন-চার মাস ছিলাম। আপনি যাবেন নাকি রাঙা-মা ?

ইচ্ছে তো করে।

যদি যান তো বলবেন। হাতরাশ ধর্মশালার ম্যানেজার মুখুজ্জে মশাইকে চিঠি লিখে দিলে আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন।

আমি চিরকালের মতো যেতে চাই।

চিরকালের মতো। সেই-বয়েসের হৈমবতী অবাক হয়েছিল, কেন রাঙা-মা ?

এখানে আর থাকতে পারছি না। অথচ এ বাড়ির দরজা পেরুলে মাথা গোজবার ঠাঁই আর নেই।

তবে কি ঘর ভাড়া নেবেন ?

পয়সা পাব কোথায়।

তা' হলে—

শুনেছি নাম-গান করলে কারা যেন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেয়।

যারা করে তাদের দেখেছি রাঙা-মা। বড্ড কষ্ট তাদের। যারা

নামগান করায় বড় নিষ্ঠুর তারা। শরীরের আধি-ব্যাধি কিছুই মানে না। সকালে চারঘণ্টা বিকেলে চারঘণ্টা। ঠিক অফিসের মতো—কামাই হলে রেশন দেয় না। দু'একমাস পড়ে থাকলে দল থেকে বের করে দেয়। সকালে মাকে হাসপাতাল থেকে দেখে ফেরবার সময় নামগান শুনতে যেতাম। দেখতাম, একতলার অন্ধকার ঘরে অসহায় বিধবারা দলবেঁধে নামগান করছে। মিনিট ঘণ্টা মেপে তাদের গান করতে হয়। বেশি হলে ক্ষতি নেই—কম হলেই মুসকিল। সে কি আপনি পারবেন রাঙা-মা ?

হয়তো পারব না।—তবু এ বাড়ির দরজা ভেঙে বেরুতে চাই। ঘর তো নেই তবে ঘরের ছলনাকে কেন মানব ?

কাকাবাবুর নাম না-করে রাঙা-মা বলতেন, মানুষ থাকে না। রাক্ষস হয়ে ওঠে। আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে কি সুখ পায় কে জানে।

একটা কথাও রাঙা-মা হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন না। কোনদিকে তাকিয়ে থাকতেন কে জানে। হয়তো দূরে কোন বাড়ির ছাদের দিকে হয়তো আকাশের দিকে তাকাতেন ; আবার এমনও হতে পারে জীবনের অতীত কি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কথা বলতে বলতে চুপ করে যেতেন রাঙা-মা। কী যেন ভাবতেন। বুকের ভিতর থেকে সন্তর্পণে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসত।

সুরপতি যাকে কাকা বলত এক-একদিন নিচে তার গর্জন শোনা যেত, মেরে ফেলব—খুন করে ফেলব—

রাঙা মার উত্তর শোনা যেত না। একতলার ঘরের এক চিলতে আলো বাইরে এসে পড়েছে—সেই আলোয় কাকার উত্তেজিত ছায়া নড়াচড়া করতে দেখা যেত।

রেলিংয়ে ঝুকে দেখতে চাইত হৈমবতী।

সুরপতি এসে ধমক দিত, কি হচ্ছে হৈম ?

দেখছি।

রোজই তো দেখ। নতুন কোন ব্যাপার কি ?

রাঙা-মার বড় কষ্ট!

কপালে থাকলে উপায় কি বল? চেয়ারে বসে সুরপতি উত্তর দেয়, এখন এক কাপ চা দিয়ে আমার কষ্ট দূর কর দেখি।

আমার বড্ড খারাপ লাগে—

আমারও খুব ভালো লাগে না। ঠাকুমা নেই জ্যাঠামশাই নেই তাই বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

দিনের বেলায় তো কারো সাড়া পাই না।

কাকা রাত্রে ওইসব খায় আর চেঁচায়! তখন বেসমাল হয়ে রাঙা-মাকে সন্দেহ করে—

কেন? সন্দেহ আবার কিসের?

কাকা বোধ হয় ভাবে, যেমন করে রাঙা-মাকে ভুলিয়ে এনেছে তেমনি করে কেউ হয়তো রাঙা-মাকে আবার ভুলিয়ে নিতে চাইছে।

তেমন কেউ আছে নাকি সত্যি?

পাগল—কাকা তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে। বাইরের কারো পক্ষে ভিতরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব।

তবু এমন করেন কেন?

মনের পাপ মনে আরো অনেক পাপ আনে।

এক-একদিন রাত্রে রাঙা-মা কাঁদেন—সারাবাড়িতে সেই কান্না মাথা কুটে মরে—আমি একলা জেগে থাকি। চোখে এতটুকু ঘুম থাকে না।

ঠাকুমা একটা উইল করে গেলে এ-ব্যাপারে যা' হোক কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম। এখন কাকাও আমার সঙ্গে এ বাড়ির সমান অংশীদার। এখন বললে শুনবে কেন?

মাঝে-মাঝে রাঙা-মার মাথায় বোধহয় দোষ দেখা দিত। সোজা ছাদে উঠে আসতেন। আর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ছাদময় ঘুরে বেড়াতেন। তখন নিজের মনে বিড়বিড় করতেন রাঙা-মা, পুড়িয়ে দিয়ে যাব—আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দেব—

আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখত হৈমবতী। কি যে ভয় করত তার! দরজা দিতেও সাহস হত না—পাছে রাঙা-মার চোখে পড়ে যায়।

রাঙা-মার চোখ-দু'টো অস্বাভাবিক লাল—কি রকম তেরছা চোখে চাইতেন। হৈমবতীর মনে হত তার দিকে বুঝি চাইছেন। বুকের ভিতর দুরদুর করত।

কখনো চেঁচিয়ে উঠতেন রাঙা-মা, তোমার ভণ্ডামী শেষ করে দেব। ঘরে দরজা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেব। আগুনের আঁচে সেদ্ধ হয়ে মরবে।

একবার এই রকম ঘুরতে-ঘুরতে রাঙা-মা হৈমবতীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখাচোখি হতে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, রাঙা-মা একটু চা খাবেন?

না-না-না। তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন রাঙা-মা, বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলে দিতে চাও—সে কিছুতে হবে না। আমাকে আগুন লাগাতে হবে আর মহীন্দ্র সান্যালকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

দরজা থেকে সরে গেলেন রাঙা-মা। তার এলোমেলো চুলের রাশ মুখের উপর পড়েছে। মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না।

মাস মনে নেই। মাথার উপর নীল আকাশ যেন ঝুকে পড়েছে। ছাদের স্তব্ধতায় কয়েকটা চড়াই কিচির-মিচির করে সমীচীন নির্জনতা বারবার ভেঙে দিচ্ছিল।

অপলক রৌদ্রে বিষন্ন খিন্ন রাঙা-মার মুখটা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। মাঝে-মাঝে কী তীব্র আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত তার গলা! সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠতেন। অদৃশ্য এক জ্বালার স্রোত ফেনিয়ে-ফেনিয়ে ছড়িয়ে যেত চারপাশে।

রাঙা-মার মুখের অনর্গল অসংলগ্ন কথা থেকে অতীতের কিছুটা আঁচ করা যেত।

দুপুরে রাঙা-মা এলে বড্ড বিরক্ত হত হৈমবতী। কাজকর্ম সেরে আলসেমিতে গা ভরে উঠেছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে

উঠেছে এমন সময় রাঙা-মা হয়তো দরজার গায় এসে দাঁড়ালেন, কি করছ বৌমা ?

এই কাজ সারা হল।

ও।

মরিয়া হয়ে হৈমবতী বলত, এবার একটু শোব ভাবছি।

দুপুরে ঘুমানো ভালো নয়। রাঙা মা বলতেন, বড্ড খারাপ অভ্যেস। শরীরের ছাঁদ নষ্ট হয়ে যায়। তার থেকে এস গল্প করি।

অগত্যা ঘুমের পাট চুকিয়ে বসতে হত। ঘরের ভিতর বসত হৈমবতী। রাঙা-মা বাইরে। দরজা গোড়ায় বসতেন। রাঙা-মা দিন-দিন কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। তার মুখে আগেকার সেই উজ্জ্বলতা ছিল না। একটা কালচে আভাস বুঝি স্পষ্ট। খুব আস্তে কথা বলছিলেন রাঙা-মা।

শরীর খারাপ নাকি রাঙা-মা ?

না। একটু থামলেন রাঙা মা, খুব খারাপ আর কি—অই একরকম। আজকাল নিঃশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হয়। বারবার গলার কাছটা ঢেকে দিচ্ছিলেন রাঙা-মা। অন্যমনস্ক হতে কাপড় পড়ে যাচ্ছিল। এমনি একবার কাপড়টা পড়ে যেতে রাঙা-মার গলার দিকে তাকিয়ে হৈমবতীর মনে হল আঙুলের মতো কালো দাগ।

আপনার গলায় কিসের দাগ ?

গলায় হাত বুলিয়ে রাঙা-মা বলেন, দাগ হয়েছে নাকি ?

একটু বুঝি ফুলেও আছে।

আবার হাত বুলিয়ে রাঙা-মা বলেন, তা হবে।

রাঙা-মা আর বসলেন না। আচমকা উঠে গেলেন। দুপুরের রোদের মধ্যে ছাদে বেরিয়ে পড়লেন। সেইদিনই তার মুখ সবচেয়ে বিষণ্ণ আর করুণ মনে হল।

নির্জন রৌদ্রাতুর পৃথিবীতে তখন বিরাম এনেছে। পাখিরা হয়তো গাছের ছায়ায় ডুব দিয়েছে। সকালের ফুল মধ্যদিনের তাপে

ঢলে পড়েছে। কশ্চিৎ দুরন্ত বাতাসে পাশের বাড়ির ছাদে মেলে দেওয়া চিত্র-বিচিত্র ছাপা শাড়িগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঘর-বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে নিঃসঙ্গ এক চিমনি গলগলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে।

দরজার কাছে বসে রাঙা মার কথা ভাবতে গিয়ে এইসব চোখে পড়ত হৈমবতীর।

বাতাসে চুল মেলে রোদে ঘুরে বেড়াতেন রাঙা-মা। কখন বিকেলে নেমে আসত।

হৈমবতীর মনে ভয়ের ছায়া চমকে-চমকে উঠত। রাঙা-মার গলায় নৃশংস একটা অভিলাষ স্পষ্ট হয়ে আছে। গতরাত্রের অন্ধকারের তলায় প্রায় ঘটে-যাওয়া কী ভয়ানক একটা রক্তাক্ত আখ্যান আজ দিনের আলোয় ধূসর হয়ে আছে।

হৈমবতীর সেই ঘরের উপরে অসীম এক আকাশের বিস্তার —কতদূর যেন ছড়িয়ে থাকত। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক হৈমবতী ভাবত, জীবনটা কি। সবাই বুঝি রাঙা-মার মতো দিকচিহ্নহীন চোখের জলে নৌকা ভাসিয়ে অসহায় হয়ে বসে আছে। কোথায় পৌঁছে দেবে কে জানে।

এই সব অলীক ভাবনা ভাবতে গিয়ে ঘুমে চোখ ভেঙে আসত। রোদ কখন সামনের বাড়ির ওপাশে নেমে গেছে। ছাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে হৈমবতী দেখে রাঙা-মাও নেই। দিনের তৃষ্ণার্ত সময় ছায়ায় স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

আজ রাঙা-মা কোথায় হৈমবতী জানে না। তবু তার কথা মনে পড়ে। দেখা হলে বলত, রাঙা-মা কত আমার দুঃখ। চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। সংসারের দায় বইতে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে মরছি। মনের সব রঙ মুছে গেছে। কথা বলার কেউ নেই। কথা জমে বুকের ভিতর পাহাড় হয়ে উঠেছে—সেই পাহাড়ের তলায় আমি চাপা পড়ে আছি। সংসারের সব দুঃখ আড়াল হয়ে আছে।

রাঙা-মা, মথুরা-বৃন্দাবনের কথা ভেবে তুমি প্যার পেতে চেয়েছিলে। আমি তো তেমন কোন জায়গার কথা ভাবতে পারছি না।

পেলেও কি যেতে পারব! নিজেই যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছি—বেরিয়ে যাব তেমন উপায় কোথায়!

ভাবনা থেকে হঠাৎ মুখ তুলে হৈমবতী দেখে সুশান্ত, তুই এখনো ঘুমোস নি ?

ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। নিচে আলো জ্বলতে দেখে নেমে এলাম—তুমি একলা বসে আছ যে মা ?

বসে নেই রে—সেলাইয়ের টুকি-টাকি কাজগুলো সেরে রাখছি। সময় তো পাই না।

কাল স্কুল নেই ?

থাকবে না কেন ?

তবে ?

শেষ করে রাখলাম। এবার খেয়ে শুয়ে পড়ব। ও খোকা তুই যদি কাল আগে উঠিস ডেকে দিস বাবা। হৈমবতী উঠে পড়ে।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে গৌরমোহন বারান্দায় বসে খবরের কাগজ রিভিসন্ দিচ্ছিলেন।

সুশান্ত কখনো বই এনে দেয় বটে তবে সে অনেক বলতে-বলতে। নইলে খবরের কাগজই একমাত্র ভরসা। ঘুম থেকে উঠে তাই আবার কাগজ নিয়ে বসেছেন। কি জানি দরকারি খবরটা যদি ফস্‌কে যায়! প্রথম পাতা থেকেই আবার সুরু করেন। কর্মখালি, ব্যক্তিগত, টেণ্ডার নোটিস, অকশন্ নোটিস সকালে যা বাদ থাকে বিকেলে তাই শেষ করেন। হৈমবতী বেরোবার আগে এক কাপ চা দিয়ে যায়।

কোনদিন সুশান্ত কাছাকাছি থাকলে গৌরমোহন তার ইংরিজি

জ্ঞান পরখ করেন। বলেন, বলো তো দাদু জ্যাকোমার্সিয়াডাস্ মানে কি?

জানি না। সুশান্ত উত্তর দেয়, এমন কঠিন শব্দ তুমি খুঁজে পাও কোত্থেকে দাদু?

হাসেন গৌরমোহন, আমাদের কালে পড়াশুনোর ধাৎ ছিল আলাদা। ফাকি দিয়ে কিছু হবার উপায় ছিল না।

গৌরমোহন সেক্সপীয়র্ নিয়েও টানাটানি করেন। সেক্সপীয়রের লেখা না-পড়লেও ল্যামের লেখা সেক্সপীয়রের গল্প পড়েছিলেন। তাই নিয়ে তর্ক জুড়ে দেন। মার্চেন্ট অব্ ভেনিসের প্রথম দশ-বারো লাইন গড়গড় করে বলে যান।

সুশান্ত অবাক হয়, বুড়ো হয়ে দেখছি তোমার মেমরি বেড়ে যাচ্ছে!

গৌরমোহন বলেন, এ আর এমন কি! লালবিহারী দের বেঙ্গল্ পেজান্ট'স্ লাইফ্ আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। হেড্মাষ্টার রাধিকা বাড়ুয্যে কত খাতির করতেন। পয়সা ছিল না তাই পড়াশুনো হল না।

সেদিনকার কাগজ পড়া হয়ে গেছিল—গৌরমোহন সুশান্তকে ডাকবেন কিনা ভাবছিলেন। এমন সময় কাগজের উপর ছায়া পড়তে মাথা তুলে তাকালেন, কে?

আমি সতু।

আরে, এস এসো। খুশি হয়ে ওঠেন গৌরমোহন, হৈম মা হৈম সতু এসেছে—

ঘুম ভাঙা চোখে সুশান্ত এসে দাঁড়ায়, মা তো বাড়ি নেই দাদু—

গেল কোথায়?

স্কুলের মিটিং-এ গেছে।

ও। একটু বুঝি হতাশ হলেন গৌরমোহন! তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, তা' এসে পড়বে এখুনি। তুমি বোস সতু। দাদু তুমি সুটকেশটা ঘরে নিয়ে যাও—

স্যুটকেশ হাতে নিয়ে সুশান্ত বলে, উপরে নিয়ে যাব?

ওপরেই নিয়ে যাও। সতু এখানে থাকবে ক'দিন।

সত্যপ্রসাদ বলে, হৈম আগে আসুক না কাকা।

সুশান্ত স্যুটকেশটা উপরে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যের আগেই হৈমবতী এল।

বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন গৌরমোহন আর সত্যপ্রসাদ।

কখন এলে সতুদা?

এই তো দুপুরের পরে।

একটু ব্যস্ত হয়ে হৈমবতী বলে, আগে চা করে আনি তারপর গল্প করা যাবে।

হৈমবতী খর-পায় বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়।

একটু পরে কাপে চা ঢালবার সময় সুশান্ত রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, চা করছ নাকি মা?

এই যে হয়ে গেল। দাঁড়া দিচ্ছি।

দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সুশান্ত বলে, তোমার সতুদা স্যুটকেশ এনেছে কেন মা?

জানিস নে তুই! কয়েকদিন থাকবে যে—

ও। নেপথ্যভাষণের মত উচ্চারণ করে সুশান্ত, তা আমাদের বাড়িতে কেন—পৃথিবীতে আরো তো থাকবার জায়গা আছে—

ছি-ছি, কি যে তুই বলিস খোকা।

আমার বড্ড ভয় করে মা।

ভয়। অবাক হয়ে থেমে গেল হৈমবতী, ভয় আবার কিসের?

কি জানি।

নে চা নে। যত্তো সব আজেবাজে ভাবনা তোর। আমি ওঁদের চা দিয়ে আসি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। অদ্ভুত সব ভাবনা অন্ধকারের মতো ঘিরে ধরেছে তাকে।

জানালার ওপাশে মাঠের ঘাসবনে এখনো ফড়িং ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে।

অন্ধকার। অন্ধকার! অন্ধকার। সুশান্ত যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই যেন অন্ধকার হানা দিচ্ছে। ক্ষুধার্ত প্যান্থারের মত নিঃশব্দ তার হাঁটা!

They ever fly by twilight! ফিসফিস করে সুশান্ত, এমনি অন্ধকারের মধ্যেই তারা ওড়ে! সংশয় আর সন্দেহ প্রেতাত্মার মতো মনের অন্ধকারে আনাগোনা করে।

হাতের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। জানালা দিয়ে ঢেলে ফেলে টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখে সুশান্ত। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে নেমে ঘাসে-ডোবা সিঁড়ির উপর বসে থাকে। তার মনের মধ্যে দারুণ একটা জ্বালা অস্থির হয়ে উঠেছে। স্থির হয়ে বসতে পারছে না। ইচ্ছে করে মাঠ পেরিয়ে ছুটে যায়। আর রাতভোর মাঠজোড়া হলুদ সরষেক্ষেতের মধ্যে পথভুলে নিশি-পাওয়ার মত ঘুরে বেড়ায়!

হৈমবতী রান্নাঘরে ফিরে দেখে সুশান্ত নেই! জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, খোকা অ-খোকা উপরে আয়। তোর জন্যে বিট-গাজর আর কড়াইশুঁটি সিদ্ধ করে রেখেছি। খাবি আয়।

আমার ভালো লাগছে না মা। সিঁড়ি থেকে সুশান্তর গলা ভেসে আসে। একটু বুঝি ভারি।

কেন? স্নেহে উৎকণ্ঠিত হয় হৈমবতী। ভাবে, ছেলেটা কি পাগল?

ওসব সেদ্ধ খাবার আর খেতে ভাল লাগে না।

ছোটবেলা থেকেই তো খাচ্ছিস! আজ মেটে দিয়ে সিদ্ধ করেছি।

এত বিরক্ত কর। উঠে ঘরের ভিতর গিয়ে সুশান্ত বলে, কি বলছ বল?

হৈমবতী সুশান্তর মুখটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে অনুযোগ করে তোর শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে রে খোকা।

তাই নাকি ?

আয়নায় একবার দেখিস তো—কী চেহারা হয়েছে তোর! ছোটবেলায় কী রকম মোটাসোটা ছিলি। কোলে নিতে কষ্ট হত।

কী যেন একটা বিষ আমার ভেতরটা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে মা!

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না খোকা।

আমি নিজেই কি বুঝতে পারি।

তা'হলে ?

সুশান্ত মায়ের দিকে মাথা হেলিয়ে উত্তর দেয়, Suspicions amongst thoughts are like bats amongst birds they ever fly by twilight.

খোকা, এ কথার মানে ?

মনে এল তাই বললাম। কার যেন লেখায় পড়েছিলাম—নামটা কিছুতেই মনে আসছে না!

তুই কিছু বলতে চাস খোকা? হৈমবতী গম্ভীর হয়ে যায়, কি আছে তোর মনে স্পষ্ট করে বল দেখি শুনি ?

কিছু না তো। মুখ ফিরিয়ে হনহন করে বাড়ির ভিতর হেঁটে যায় সুশান্ত। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করে, আমার বাবা কোথায় মা ?

কেন ?

ঠিকানাটা পেলে একবার দেখা করতাম।

আমি জানি না খোকা। হয়তো কোথাও আছেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় হৈমবতী, আমি তার খোঁজ রাখি না। রাখতেও চাই না। তার গলায় বেদনা খরস্রোত হয়ে ওঠে।

কেন মা ?

তোর বাবা তো একবারও আমাদের খোঁজ করেন না। এই বাইশ-চব্বিশ বছরে একবারও কি এমন ইচ্ছে তাঁর হল না।

হয়তো—

না খোকা, এর কোন কৈফিয়ৎ নেই। এক ভয়ঙ্কর রাত্রে তোর বাবা আমাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিল। কী বিষ্টি আর কী অন্ধকার সেদিন। পথের সব আলো নিভে গেছে।

আমি বললাম, ওগো আমার কথা শোন—

তিনি বললেন, না-না-না।

আমি কাঁদলাম, তুমি যা ভাবছ তার এতটুকু সত্যি নয়। আমি ভ্রষ্টা নই। আমি কোন-পাপ করি নি।

হঠাৎ থেমে যায় হৈমবতী। তার মনে হয় ছেলের সামনে এসব বলা ঠিক নয়। গলার স্বর পালটে বলে, খোকা তুই তখন সবে পেটে এসেছিস। বিষ্টিতে ভিজে কোন রকমে নিজের বাড়ির দরজায় এসে উঠলাম।

বাবা আমাকে দেখে চমকে উঠলেন, কি হয়েছে তোর ?

বললাম, কিছু না।

মা শুনে বললেন, সব আমার কপাল। আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বসে রইলেন। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। একবারও আঁচল দিয়ে মুছলেন না।

হৈমবতীর গলার স্বর একেবারে নিভে গেল, তারপর কতদিন কেটে গেছে। এই বাড়িতে তুই বড় হয়েছিস। স্কুল-কলেজের দরজা পেরিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে গেছিস। কী যে হল তোর পরীক্ষা দিলি নে। তুই পালটে গেলি। ছোটবেলা থেকে তোকে নিয়ে যত স্বপ্ন দেখেছি তার এতটুকু আর অবশিষ্ট নেই রে খোকা।

তোমার বড় কষ্ট না মা।

সে কি তুই বুঝিস খোকা ?

বুঝতে পারি বলেই তো কেমন হয়ে গেছি।

সুশান্তর গায় হাত বোলাতে থাকে হৈমবতী, বুঝতে যদি পেরে থাকিস সব দুঃখ আমার সোনা হয়ে যাবে। নে এখন চটপট খেয়ে ফেল।

লক্ষ্মীছেলের মতো খেতে থাকে সুশান্ত।

নিঃশব্দ ঘাসবন থেকে ঝিঁঝিঁর একটানা গানের সঙ্গে স্যাঁত-সেঁতে একটা গন্ধ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঝোপঝাড় থেকে একটা-দুটো জোনাকি হয়তো বাতাসে খেলবে বলে বেরিয়ে আসে।

নিঝুম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সুশান্ত বলে, আজকের সন্ধেটা কি সুন্দর না মা?

হবে বোধহয়। হৈমবতী অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

বাড়ির গায় ঝোলান আলুলায়িতকুন্তলা মাধবীলতার ভিতর থেকে তখনো পাখির শিস ভেসে আসছে!

সন্ধেটা কী সুন্দর! আবার বলে সুশান্ত।

আনমনা হৈমবতী আবার উত্তর দেয়, হবে বোধহয়।

সুশান্ত খেতে থাকে। হৈমবতী রান্নাঘরের কাজে মন দেয়।

গৌরমোহন আর সত্যপ্রসাদের গলা ভেসে আসে।

হৈমবতী সুশান্তর কাছে এসে দাঁড়ায়, এই যে সারাদিন বাড়ি বসে থাকিস এইটেই বড় খারাপ। রোজ একবার করে বাইরে ঘুরে আসতে পারিস না?

কোথায় যাই বলো তো মা?

কেন, তোর বন্ধুদের বাড়িতে কি এখানে-সেখানে? কলকাতাতেও যেতে পারিস। একঘেয়েমি কেটে যায় তা'হলে—

বন্ধুরা আমাকে এড়িয়ে চলে। ভালো লাগে না। কিচ্ছু ভালো লাগে না। এই বাড়ির বাইরে অনেক ভয় মা!

এতক্ষণ হৈমবতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবার নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে গেল।

সুশান্ত নিজের মনে বলে যায়, সারারাত ঘুমোতে পারি না! কোথা থেকে একটা পাখি এসে বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। তার জন্যে ঘুম আসে না। শুয়ে-শুয়ে ছটফট করি, ও কেন আসে! মরা-চাঁদের আলোয় তাকে স্পষ্ট বোঝা যায় না! অন্ধকারে সে স্পষ্ট। নিথর ডানা মেলে বাড়িটা ঘিরে যখন ওড়ে তখন ওর দিকে তাকিয়ে ভাবি, ও কি আমাদের অসুখের প্রেতাত্মা!

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সুশান্ত, জানো মা এই জন্ম আমার ভালো আর লাগছে না!

চারদিকে তাকিয়ে কাছে-পিঠে কোথাও হৈমবতীকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে যায় সুশান্ত। রান্নাঘরের বাইরে এসে সত্য-প্রসাদের মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুশান্ত।

দেয়ালের গায় হেলান দিয়ে ফিসফিস করে, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে লোকটা মালতিপুরে বেড়াতে এল কেন! মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর বন্দুক দাও সত্যপ্রসাদকে গুলি করি!

সকালে চা খেতে-খেতে সত্যপ্রসাদ বলে, তোমার ছেলে কি করে হৈম?

কিছুই করে না।

বড্ড মুশ্‌কিল তো।

সে কথা আর বলতে। আমার সামান্য রোজগার আর বাবার টাকা ক'টা ভরসা। শেষ হয়ে গেলে যে কি হবে—ভাবতে বসলে শরীর হিম হয়ে আসে!

এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করেছে?

কি জানি। খোকা অ-খোকা একবার শুনে যা' তো—

সত্যপ্রসাদ চায়ে চুমুক দিয়ে সুশান্তর প্রত্যাশায় সিঁড়ির দিকে তাকায়।

তুমি একটু বোস সতুদা আমি বাবাকে চা দিয়ে আসি।

একটু পরে হৈম ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, খোকা আসে নি ?

না তো। ছেলেকে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে দাও কেন ?

হাসে হৈমবতী, ঘুমোবে কেন! বাড়িতে নেই বোধ হয়—

তার মানে ?

সকালে উঠেই বেরিয়েছে কোথাও—পাখি-টাখি দেখছে কি গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেন ?

অমনি ওর স্বভাব।

ছেলেকে বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছ হৈম। কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তা'তো দেখছি—কিন্তু কি করি বল তো সতুদা ?

এমনিতেই চাকরি পাওয়া কঠিন—তোমার ছেলের তো দেখছি একেবারেই চেষ্টা নেই !

হৈমবতী একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি চা খেতে থাক আমি বরং খোকাকে ডেকে আনি—

সুশান্তর জন্যে মনে-মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে যায় হৈমবতী।

সকালবেলার শিশির-ঝরা বাগানে পা দিতে ভিজে পাতা লেগে চোখ-মুখ ভিজে যায়। মানুষের সাড়া পেতে ভীত-চকিত পাখিরা ডাল থেকে পাতার আড়ালে সরে যাচ্ছে।

চারদিকে তাকিয়ে সুশান্তর সাড়া পাওয়া যায় না। আরো এগিয়ে পুকুরের ধারে সুশান্তকে দেখা গেল। উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছে।

খোকা। হৈমবতী এগিয়ে গেল, এখানে কি করছিস ?

মায়ের দিকে এক নজর দেখে সুশান্ত উত্তর দেয়, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি—

ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে ! হৈমবতীর গলার উদ্বেগটুকু বোঝা যায়।

সেই ভোর থেকে তো বসে আছি এখনো ঠাণ্ডা লাগে নি।

ভোর থেকে কেন ?

তুমি আমার ঘর কেড়ে নিয়েছ। অন্য ঘরে শুয়ে একটুও ঘুম আসছে না। তোমার সতুদা কদ্দিন থাকবে মা ?

এই দিন-কয়েক থাকবে আর কি।

বিরক্ত মুখে সুশান্ত বলে, আর ঘর পেলে না আমার ঘরটাই দিতে হল !

অতিথিকে ভালো ঘরই দিতে হয়। হ্যাঁরে খোকা, সতুদা তোকে ডাকছে। অনেক চেনা-শোনা আছে—কথা বলে দেখ একবার চাকরি-বাকরির সুবিধে হতে পারে।

এখন যেতে পারব না।

কেন ?

ইচ্ছে করছে না।

তোর সব তাতেই অমনি। চল—সুশান্তর হাত ধরে হৈমবতী তাকে টেনে নিয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে সত্যপ্রসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত। তার মুখের বিরক্তি ক্রমশ ছায়া হয়ে ওঠে।

চা খাওয়া হয়ে গেছিল সত্যপ্রসাদের। সিগারেট নিয়ে হাঁটুর উপর ঠুকছিল।

সুশান্ত আর হৈমবতীকে দেখে সিগারেট মুখে দিয়ে দে'শ লাইয়ের আগুন ছোঁয়াল। তারপর গলগল করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করিয়েছ ?

না তো।

চাকরি খুঁজছ অথচ কার্ড করনি !

এখনো তো করা যায় ?

তাই কর গিয়ে। সকালের ট্রেনেই ব্যারাকপুর চলে যাও—

সুশান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, মা খেতে দাও তা'হলে।

তুই জামা পালটে আয়। তারপর সত্যপ্রসাদের দিকে ফিরে

হৈমবতী বলে, তুমি থেকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও সতুদা—

সিগারেটে নিবিড় টান দিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, দেখি—

ইতিমধ্যে গৌরমোহন ডাকেন, সতু এদিকে এস—

হাতের সিগারেট ফেলে সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

আজ হৈমবতীর ছুটি। তাই তাড়া নেই। দুপুরে সবাইকে খাইয়ে সুশান্তর খাবার গুছিয়ে নিজে খেয়ে-দেয়ে রোদ পোয়াতে পুকুরের রানার উপর গিয়ে বসে। রোদ পোয়ানো চুল শুকোনো আর সোয়েটার বোনা একসঙ্গে চলবে।

প্রায় সন্ধে পর্যন্ত পুকুরের ধারে রোদ লেগে থাকে। হৈমবতীর হাতে উলের কাঁটা বারবার একই ভাবে উলটো-সোজা নড়াচড়া করতে থাকে। সুশান্তর কথাই সবচেয়ে বেশি মনে হয়। ওর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

পাতলা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বেশ আরাম লাগছে। রোদ যেন আঙুল দিয়ে পিঠে তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে। নরম একটা ঘুমের আমেজ চোখের পাতায় পালতোলা নৌকো ভাসায় বুঝি! নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে হৈমবতী। ঘাসের উপর তার লম্বাটে ছায়া অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। হাই তোলে হৈমবতী। রোজ এই কাজের একঘেয়েমি মোটেই ভালো লাগে না। পাঁচটা থেকে ভোর সুরু আর রাত দশটা পর্যন্ত কাজের বোঝা টানা! হৈমবতী ক্লান্ত! জীবনের সবটুকু অনর্থ হয়ে গেছে। যে-ছেলেকে নিয়ে তার আশা তাকেও যেন নিষ্কর্মা খামখেয়ালে পেয়ে বসেছে। কি যে হবে ওকে দিয়ে!

হে ঈশ্বর এমন তো করতে পার—সুরপতি ফিরে আসে, সুশান্ত ভালো একটা চাকরি পায়; তা'হলে স্কুলের চাকরি, বাজার, রান্নার হাত থেকে উদ্ধার পায়। সংসারের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, দাও—আমাকে ছুটি দাও। অনেকদিন তো চালালাম এবার

সব ভার বুঝে নাও। না, কোন রাগ নয়। দুঃখ কিংবা অনুযোগ নয়। দুঃখ যা দিয়েছ সহ্য করে পাষাণ হয়ে গেছি!

তুমি এখানে আর আমি সারাবাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি!

হাসে হৈমবতী, এই রোদ পোয়াচ্ছি একটু।

ঘুম থেকে উঠে তোমাকে আর খুঁজে পাই না!

বিকেলবেলার রোদে তখন রঙ ধরেছে। ঘাসের সবুজ বিস্তার পুকুরের নিস্তরঙ্গ জল, গাছের ডালপালা, পাতাঝরা পাহাড়ি চাঁপা গাছ, হৈমদের বাড়ি সব বুঝি এই আশ্চর্য রোদে অলৌকিক!

হৈমবতীর মুখোমুখি বসে সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে, সোয়েটার বুনছ বুঝি—কার?

সুশান্তর। গায়ে দেবার কিছু নেই। ঠাণ্ডা লাগলে আমাকেই ভুগতে হবে।

হৈমবতীর মেলে-দেওয়া চুলের দিকে তাকিয়ে সত্যপ্রসাদ অবাক হয়, তোমার চুল যে সব পেকে গেল হৈম!

আর বুড়ি হয়ে গেছি সতুদা। বয়েস তো কম হল না!

কত আর বয়েস হল তোমার! আমার থেকে ছ'-সাত বছরের ছোট হবে। আমার বোধহয় পঞ্চাশ পেরিয়েছে কি পেরোয় নি।

পুকুরের ধারে টবে লাগানো প্যাঞ্জি ফুল ফুটে আছে। অবিকল প্রজাপতি। পাপড়ির নীল-হলুদে রক্তের ছিটে। হাওয়া দিলে উড়ে যাবে বুঝি!

কতদিন বাদে সেই ছোটবেলার মতো বসেছি। তুমি আর আমি!

সত্যপ্রসাদের দিকে একবার মুখ তুলে তাকায় হৈমবতী।

সেদিনের অধিকার আজ আর নেই! সত্যপ্রসাদ বুঝি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

পুরোন কথা আর ভেবে লাভ কি সতুদা!

সব ভাবনাই কি ইচ্ছে করলে না-ভেবে পারা যায় হৈম!

পায়ের শব্দে দু'জনেই তাকিয়ে দেখে সুশান্ত আসছে। সুশান্তকে দেখে হৈমবতী উঠে পড়ে! তুমি একটু বোস সতুদা আমি খোকাকে খেতে দিয়ে আসছি—চল্ খোকা—

সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে, কার্ড করেছ?

হুঁ। যেতে গিয়ে উত্তর দেয় সুশান্ত।

সুশান্তকে খেতে দিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কিছু জিজ্ঞাসা করল তারা?

কিচ্ছু না। শুধু সার্টিফিকেটগুলো দেখতে চাইল।

তবু—

ওই বলল, বাইরে যেতে আপত্তি নেই তো?

বললাম, পৃথিবীর বাইরে না-হলে আপত্তি হবে না।

তুই বড্ড বাজে কথা বলিস খোকা। বিরক্ত হয় হৈমবতী।

একটুও বাজে কথা বলিনি মা! চাকরি আমার চাই। জিজ্ঞাসা করল, কি পারেন? বললাম, নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার আদ্যোপান্ত মুখস্ত বলতে পারি—সুতরাং এ্যানালিসিস্, ইউজ্ অব্ প্রিপোজিসন'স্, সিন্‌ট্যাক্স, ডেফিনিট্ হয়ে ইন্‌ডেফিনিট্ আর্টিকেলের ব্যবহার শেখাতে পারি। বেকন্-হ্যাজলিট্-রাস্কিন পড়ে অনর্গল তাৎপর্য বোঝাতে পারব! এছাড়া অষ্টাদশ শতকের রোমান্টিক কবিদের নাড়ি-নক্ষত্র জানা আছে। দরকার হলে—।

আমি কথা শেষ করবার আগে লোকটা একটু হাসল তারপর কার্ড লিখে হাতে দিয়ে বলল, প্রত্যেক মাসের দশ তারিখের মধ্যে এসে রিনিউ করিয়ে নিয়ে যাবেন।

বললাম, যাব। তারপর বেরিয়ে এলাম।

বাঃ শুধু তো কথাই বলছিস। খাচ্ছিস নে তো খোকা!

এই খাই মা। একমনে খাচ্ছিল সুশান্ত হঠাৎ মাথা তুলে বলে, কাল সারারাত আমার একটুও ঘুম হয়নি মা।

উদ্বিগ্ন মুখে হৈমবতী বলে, কেন রে খোকা?

অন্য ঘরে শুলে আমার ঘুম আসে না।

দু'একদিন কষ্ট করে চালিয়ে নে। থাকবার জন্যে তো আসে নি। তোর দাদু বলেছে তাই এসেছে। চলে যাবে দু'একদিনের মধ্যে।

এত ঘর থাকতে আমার ঘরটাই দিলে! বিছানা থেকে আকাশের এতটুকুও দেখা যায় না। পাখিটা হয়তো এসে-এসে ফিরে যায়। পৌষের আকাশে কালপুরুষের বুকের তলায় তাকে নিঃশব্দে একবারও উড়তে দেখতে পাই না। সুশান্ত উঠে পড়ে। নিজের ঘর ছেড়ে আমার একটুও ভালো লাগছে না।

ক'টা দিন একটু চালিয়ে নে।

সত্যপ্রসাদ এসে দাঁড়ায়।

একি সতুদা তুমি চলে এলে?

তোমার এত দেরি দেখে ভাবলাম, আমি যে বসে আছি সে কথা বোধহয় ভুলে গেছ!

না-না ভুলব কেন? হেসে লজ্জা সামলে নেয় হৈমবতী।

সুশান্ত সত্যপ্রসাদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে উপরে উঠে যায়।

চা খাবে নাকি সতুদা?

সন্ধে তো হয়ে এল।

বাবার সঙ্গে বসে একটু গল্প কর গে। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

নিচে থেকে উপরে এসে শুয়ে পড়ে সুশান্ত। সিঁড়িতে ঝোলান বদরি আর বুলবুলিরা শিস দিচ্ছে। দিনের রঙ একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। পাশ ফিরে শোয় সুশান্ত। উত্তরের দিককার এই ঘর থেকে আকাশ দেখা না গেলেও বাগানের অনেকখানি দেখা যায়। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের তলায় বালিশ দিয়ে গাছপালার ভিতরে অন্ধকারের আনাগোনা দেখে।

অন্ধকার এলে সুশান্তর নিজেকে যেন প্রকৃতির আদিম একটা

সত্ত্বা বলে মনে হয়। মনে হয়, এই দেহের ভিতর থেকে হিংস্র এক চিতা ঘুম ভেঙে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্র পায় বাড়ির আনাচে-কানাচে রহস্য শিকার করে বেড়ায়। তার সারা শরীরে রক্তাক্ত হননের অভিলাষ। থাবার নখগুলো সেই পিপাসায় নিসপিস করে।

বৃথা। বৃথা। বৃথা। উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠে বসে সুশান্ত! দিন ক্ষণ প্রহর বৃথা যাচ্ছে। নিজের উপর অন্ধ আক্রোশে নিজেকে শিকার করতে ইচ্ছে করে। মনে হয় আর কিছু না-পেলে এ জন্মের অপ্রয়োজনীয় এই শরীরটাকে শিকার করে; তারপর রক্তাক্ত শিকারের টুঁটি ধরে নিরাপদ কোন ঝর্ণার কাছে গিয়ে বসে।

এসব চাকরি-টাকরি তার হবে না। হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছেও তাই। পাগল হয়ে সুশান্তকে এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অস্থির যন্ত্রণায় নিজেকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে হবে!

উত্তেজিত হয়ে উঠছে সুশান্ত। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে সে।

এ-জন্মের এই-জীবন আর ভালো লাগছে না।

একটু বাদে সুশান্ত আবার নিচে নামে। দাদুর ঘরে আলো জ্বলছে। উঁকি দিয়ে দেখে গৌরমোহন ছবি দেখছেন। টেবিলের ড্রয়ার থেকে এ্যালবামটা মাঝে-মাঝে বের করে ছবি দেখেন। দাদু দিদিমা মা মাসিমা আরো নানা মুখের ছবি। সেকেন্দ্রারাওয়ের গাছপালা বাড়িঘর আর দাদুর উটের উপর তোলা ছবি। ঘোড়ায় চড়া ছবি। ডালিম গাছের ছায়ায় তোলা ছবি। নিবিষ্ট হয়ে ছবি দেখছেন গৌরমোহন।

এগিয়ে যায় সুশান্ত। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দিদিমার যৌবনকালে তোলা একটা ছবির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন গৌরমোহন।

সুশান্তকে দেখে গৌরমোহন অবাক চোখ নামিয়ে নেন। বর্তমান থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন তিনি। সেখান থেকে সুশান্তর মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

ছবি দেখছ নাকি দাদু?

হুঁ-উ! গৌরমোহনের ভিতর থেকে অনর্থ একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। তারপর তার মুখটা আরো নিচু হয়ে মৃন্ময়ীর ছবির উপর ঝুকে পড়ে। এ্যালবামের প্রায় পুরো পাতা জুড়ে মৃন্ময়ীর মুখ। একেই তো একদিন হাত ধরে ঘরে এনেছিলেন গৌরমোহন!

মৃন্ময়ী বলত, এখানে কত কিছু দেখার আছে কিছুই তার দেখালে না! বিয়ে করে এনে সেই যে সংসারের কাজে লাগিয়ে দিলে আর একবারও বের করলে না।

কাজের চাপ তখন এত বেশি যে সময় করে উঠতে পারতেন না গৌরমোহন। বলতেন, যাব, নিয়ে যাব শিগ্‌গির্—তা' কোথায় যাবে বল?

কাছাকাছি কত জায়গা মথুরা বৃন্দাবন আগ্রা দিল্লি—যেখানে নিয়ে যাবে

কাজ একটু হালকা হলেই তোমাকে নিয়ে যাব।

তারপর নবেম্বরের শীতল রাত্রে মিটারগেজ ট্রেনে চড়ে সেকেন্দ্রারাও থেকে ভোরবেলা আচ্‌নেরা ষ্টেশনে গিয়ে নামলেন দু'জনে। ছোট্ট ষ্টেশন। লোকজনের ভিড় কম। হু-হু করে শীতের বাতাস হানা দিচ্ছে। মস্ত এক শিরীষ গাছের অন্ধকার ছায়ায় চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা টঙ্‌গার ভিতর থেকে সাজানো একখানা টঙ্‌গা ভাড়া করলেন। চারপাশে রঙীন সাটিনের ঝালর লাগানো। ভাড়া একটু বেশি নেবে। তা' নিক। মাথার উপর ভেলভেটের কাপড়ের আস্তর। পাশে সাটিনের পর্দা লাগান। দু'জনে চড়ে বসলেন তাতে। সবে তখন ভোর হয়েছে। চোখের সামনে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের মত উঁচু-নিচু হয়ে মাঠের সীমানা

দিগন্ত পর্যন্ত বয়ে গেছে। তার উপর সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। শিশিরে ধুয়ে রঙের খোলতাই আরো বুঝি বেড়ে গেছে। নাম-না-জানা ঘাসফুলের বাহারি শোভা ছড়ানো এখানে-সেখানে।

মৃন্ময়ীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুশি হয়েছে সে। তার মাথা থেকে ঘোমটা সরিয়ে গৌরমোহন বলেন, এখানেও ঘোমটা!

আঃ, লজ্জা করে! হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয় মৃন্ময়ী।

এখানে আবার লজ্জা কিসের! অবাক হন গৌরমোহন।

কি জানি। মাথার উপর আবার ঘোমটা টেনে দেয় মৃন্ময়ী।

বিরক্ত হয়েছিলেন গৌরমোহন, মুখের উপর ঘোমটাই যদি টেনে রাখবে তবে দেখবে কী! এত পয়সাকড়ি খরচা করে আসা!

দেখছি তো!

ঘোড়ার ডিম দেখছ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন গৌরমোহন।

রাগ করলে নাকি?

না। গোমড়া মুখে বসে থাকেন গৌরমোহন।

এই! ছলছল চোখে গৌরমোহনের গায় হাত রাখে মৃন্ময়ী, রাগ করলে নাকি?

হেসে ফেলেন গৌরমোহন, ধুর রাগ করব কেন?

তবে কথা বলছ না যে?

বলছি তো—

জোর কদমে ঘোড়া চলেছে।

কী সুন্দর! চারদিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মৃন্ময়ী।

সিগারেট ধরিয়েছেন গৌরমোহন। চায়ের পর বেশ লাগছে সিগারেট।

পুবদিক থেকে হালকা আলো এসে ছড়িয়ে গেছে মাঠে। কোথাও কুয়াসা নেই। কখনো পথ-চলতি দু'একটা দেহাতি মানুষ জিজ্ঞাসা করে, গাড়ি কোথায় যাচ্ছে?

টাঙাওয়ালা উত্তর দেয়, ফতেপুর সিক্রি!

মৃন্ময়ী বলে, বেশ ঠাণ্ডা—ভালো করে চাদরটা জড়িয়ে নাও।

সেদিনকার সেই নির্জন মাঠে বুঝি সভা বসেছিল ময়ূরদের। অনবরত বন-টিয়ার ঝাঁক মাথার উপর ওড়া-উড়ি করছিল।

হ্যাঁ গো ময়ূর পোষা যায় না? অপাঙ্গে তাকিয়েছিল মৃন্ময়ী।

তা' যাবে না কেন!

আমার বড্ড ময়ূর পুষতে ইচ্ছে করে। ছেলেমানুষি আবদার ছিল মৃন্ময়ীর গলায়।

আমাদের অত জায়গা কোথায়?

অন্য একটা বাড়ি ভাড়া নিলে হয় না?

তা' হয়।

তবে ও বাড়িটা ছেড়ে আরেকটা বাড়ি নাও—

মৃন্ময়ীর আরো অনেক সখের মত এটাও মেটান হয় নি। মাঝে-মাঝে গৌরমোহনকে বলেছে, কই আমার ময়ূর কি হল?

বলে তো রেখেছি। ধরা পড়ছে না। সামনের আষাঢ়-শ্রাবণে দেখা যাবে।

সেই অপলক আকাশের তলা দিয়ে জোড়া-ঘোড়ার টঁঙ্গা ছুটে চলেছে।

পাশে বসে থাকা প্রায়-নতুন বৌ মৃন্ময়ী। সবে তার যৌবনে রঙ ধরেছে। সুখের দেবযানে তাদের সেই যাত্রা-কাল কবে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো তা অবিস্মরণীয়।

ঘোড়ার গলায় একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে। তারি সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেহাতি ভাষায় গান ধরেছে টঁঙ্গাওয়ালা। কখনো গান বন্ধ করে নানা রকম শব্দ করে ঘোড়াকে উত্তেজিত করে তুলছে।

মৃন্ময়ী বলে, কিছু খাবে নাকি?

খাবার! অবাক হয়ে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকান গৌরমোহন, এই মাঠের মধ্যে খাবার কোথায় পাবে শুনি!

নিয়ে এসেছি। পায়ের সামনে রাখা বেতের বাস্কেট থেকে

পোড়া আর ঘি-চপচপে লুচি বার করে দিল মৃন্ময়ী। সে স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে!

এক সময় সেই জনহীন প্রান্তর পার হয়ে গেলেন। গাড়ি গিয়ে একদা জলাভাবে পরিত্যক্ত আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রির বিশাল পুরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল! নেমে পড়লেন দু'জনে। মৃন্ময়ীর হাত ধরে ফতেপুর সিক্রির উঁচু টিপির উপর তুলতে হয়েছিল। সামনে বুলন্দ দরওয়াজার বিশাল আকৃতি দেখে মৃন্ময়ী অভিভূত। গৌরমোহনের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঈস্ কতো বড়! দেখলে ভয় করে! ভেঙে পড়বে নাতো?

সেলিম চিস্তির কবরের সামনে নিজের মনোবাসনা জানিয়ে সুতো বেঁধে দিয়েছিল মৃন্ময়ী। অভিলাষ পূর্ণ হলে আবার এসে সুতো খুলে দিয়ে যাবে। ছেলের প্রত্যাশায় সুতো বেঁধেছিল। আর আসা হয়নি তার। দরকার পড়েনি। যে ছেলের প্রত্যাশায় সুতো বেঁধেছিল সে আসেনি। তার বদলে এল হৈমবতী।

গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিসের মানৎ করলে?

তোমাকে বলব কেন?

ছেলে না মেয়ে?

ধোৎ! মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল মৃন্ময়ী।

সে আজ কতকালের কথা! একালের এখান থেকে তাকে আর ছোঁয়া যায় না!

গৌরমোহনের মাথাটা ছবির উপর আরো ঝুকে পড়ে। নিজের মনে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব বিড়বিড় করেন। এই অসহ্য দিনরাত্রির নিঃসঙ্গতাকে আর সহ্য করতে পারেন না গৌরমোহন। এমন নিঃস্ব করে রেখে গেছে! মৃন্ময়ীকে নিয়ে একদিন সংসার যাত্রা সুরু করেছিলেন। শেষ হবার আগেই মৃন্ময়ী চলে গেছে। একেবারে আচমকা।

সকালবেলায়ও কল্পনা করতে পারেন নি গৌরমোহন, মৃন্ময়ী

তার নিজের হাতে-গড়া সংসারের ছেলেমানুষদের এমন করে ফেলে যাবে।

কতদিন হল হেনা চলে গেছে। সব খুইয়ে চিরকালের মতো চলে এসেছে হৈমবতী। জোড়াতালি দিয়ে এখন আর মানিয়ে রাখা তার সাধ্য নয়! এসব যে তিনি পারবেন না এ তো জানত মৃন্ময়ী। তবু চলে গেল! এখন কি করি—কি যে করি! ঠোঁট দুটো কাঁপছিল গৌরমোহনের!

সুশান্ত তখনো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাদুকে দেখছিল। বলল, নিজের মনে কি বলছ দাদু? পাগল হয়ে গেলে নাকি!

চমকে ওঠেন গৌরমোহন। এতক্ষণ তো একাল থেকে অলৌকিক সেকালে ফিরে গেছিলেন। সুশান্তকে সামনে দেখে বিহ্বল হয়ে গেলেন। হঠাৎ যেন বুঝতে পারেন না এ কে! কেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরমোহন যে কালে ফিরে গেছিলেন সে-কালে সুশান্ত অ-সম্ভব। কারণ হৈমবতীরই তখন জন্ম হয় নি।

ভালো-ভালো। সুশান্ত বাইরে যাবার আগে বলে গেল, মরা ছবির মধ্যেই তুমি ডুবে থাক।

নড়ে-চড়ে বসেন গৌরমোহন, ও সুশান্ত শোন শোন দাদুভাই—

দরজার ও-পাশ থেকে সুশান্ত সাড়া দিল, কি বলছ বল?

তোর মাকে এককাপ চা দিতে বল না। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে—

বলছি।

মালতিপুর স্টেশনের গায় গৌরমোহন সান্যালের বাড়ির বাইরে এখন জমাট অন্ধকার।

পৌষমাসের খসখসে অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে জোনাকিরা ওঠানামা করছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে সুশান্ত সোজা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হৈমবতীকে হাসতে দেখে থেমে গেল সে। তার মা হাসছে। সত্যপ্রসাদের কথা শুনে তার মা খিলখিল করে হাসছে।

মায়ের মুখটা কেমন যেন ছেলেমানুষি খুশিতে ভরে উঠেছে। মাকে কখনো হাসতে দেখেনি এমন নয়। সে-হাসি আর এ-হাসির চেহারা এক নয়। ছেলেবেলায় মা বোধহয় এমনি করে হাসত। বন্ধ কাঁচের জানালার ওপাশে হৈমবতীর নিঃশব্দ হাসি এক-একবার সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে বোধহয়।

দাঁড়িয়ে দেখে সুশান্ত। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে অসহায় মনে হয়। দাদুর চায়ের কথা আর মনে থাকে না! এক-পা দু-পা করে টলতে-টলতে বাগানে বেরিয়ে যায়। কনকনে ঠাণ্ডা বুঝি মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে দিল। পৌষমাসে আমের বোল এসেছে। গাঢ় গন্ধে বাতাস ভর্তি। সেই গন্ধ ভেঙে দিশেহারার মতো চলতে থাকে সুশান্ত। পুকুরের ধার দিয়ে ঘুরে যখন ক্লান্ত মনে হল তখনই ফিরল। মুখটা যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। মাথা অস্বাভাবিক গরম। তাপ বেরুচ্ছে বুঝি।

যেমন নিঃশব্দে সুশান্ত নেমে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়ে সে। ঘুমুতে চায়! ঘুম আসে না। দারুণ অস্বস্তিতে এ-পাশ ও-পাশ করে। নিজের মনের অসুখটাকে বুঝে উঠতে পারে না।

অনেক রাত্রে হৈমবতী ডাকতে এল, খোকা খাবি আয়।

ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে সুশান্ত। শেষকালে মায়ের ডাকাডাকিতে বলে, বড্ড শরীর খারাপ মা—কিচ্ছু খাব না।

হৈমবতী উদ্বিগ্ন হয়, কী রকম শরীর খারাপ দেখি?

মাথা ধরেছে।

আজ সারাদিন তো রোদে ঘুরেছিস। না খাস ভালো। শুধু একটু দুধ খেয়ে চলে আসবি।

মাথা নাড়ে সুশান্ত, না কিছু খাব না।

যা ভালো বুঝিস কর। হৈমবতী নিরুপায় হয়ে নেমে যায়

মায়ের চলে যাওয়ার দিকে একবার পিটপিট করে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে সুশান্ত। তার অভিমান গভীর থেকে গভীরতর হয়।

একসময় সারা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল। গৌরমোহন হৈমবতী অথবা সত্যপ্রসাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

সুশান্ত বুঝি শুয়ে থাকতে-থাকতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আচমকা তার সেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। বিছানা থেকে উঠে পড়ে। কত রাত হল কে জানে! পাখিটা হয়তো এসে গেছে!

নিজের ঘরে শুয়ে হৈমবতীর ঘুম আসে না। জীবনের যে সব ফুল জীবাশ্ম হয়েছিল অকাল বসন্তে তারা বুঝি সহসা ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় উঁকি দিচ্ছে। কিসের হাতছানি বারবার তাকে যেন বিনিদ্র করে রাখছে। বাইরের বাগানের গাছপালার মতো সেও জেগে থাকে। এই নিঃসঙ্গ শয্যায় অনর্থক চিন্তা গূঢ় এক অসম্ভবের মরীচীকা হয়ে তাকে ছলনা করে। উঠে গিয়ে জানালার কাছে বসে। চোখ বেয়ে অবিরল জলের ধারা গড়িয়ে আসে। তার ভিতরে কে যেন পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে থাকে, না-না-না। নিজেকে অস্বীকার করে জীবনের এই দায় টেনে নেবার কোন মানে নেই!

দরজা খুলে বাইরে আসে। সামনের ঘরে সত্যপ্রসাদ শুয়ে আছে। কতদিনকার আকুল তৃষ্ণা রঙীন মায়া হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সত্যপ্রসাদের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। সারা মনে অসুখ। সারা শরীরে অসুখ! অন্ধকারের ধাক্কা লেগে সেই অসুখ ফসফরাসের মতো জ্বলে ভেঙে-চুরে ছড়িয়ে পড়ছে। হৈমবতীর মনে হয় এতদিনকার সব বন্ধন খুলে-খসে গেছে। মনে-মনে নানারঙের দিন চমকে উঠছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে জেগে ওঠে হৈমবতী। ভয়-পাওয়া পাখির মতো তার বুকের ভিতরটা ধুকধুক করে।

সুশান্ত দ্রুত পায় এগিয়ে এসে হৈমবতীর সামনে থমকে দাঁড়ায়, মা তুমি ?

হৈমবতীর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে। কী উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

হৈমবতীর প্রায় মুখের উপর ঝুকে সুশান্ত জিজ্ঞাসা করে, মা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

এতক্ষণে সামলে নিতে পারে হৈমবতী, জল নিতে ভুলে গেছিলাম—জল আনতে নিচে যাচ্ছি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রে !

ও। সরে যাচ্ছিল সুশান্ত !

হৈমবতী পথ আটকে দাঁড়ায়, তুই এত রাত্তিরে কি করছিস খোকা ?

ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হঠাৎ রাত্রে তোর এ'রকম সখ !

ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছিল না। বেরিয়ে পড়লাম। একটু থেমে সুশান্ত বলে, ঘরে বড্ড ভয় মা। বাইরে কোন ভয় নেই।

ঘরে ফিরে হৈমবতী নিজের মনে ফিসফিস করে, বাইরে কোন ভয় নেই। ঘরে বড্ড ভয়—ঘরে বড্ড ভয় !

সকালে সত্যপ্রসাদ চা খেয়ে বাড়ির বাইরে নামে। সবে তখন আলো পেয়ে গাছেরা ঝলমল করে উঠেছে। একেবারে কুয়াসা নেই।

হৈমবতী স্কুলে যাচ্ছিল। একটু দাঁড়িয়ে গেল, যাচ্ছি সতুদা—

এসো। তাড়াতাড়ি এস।

ছুটি হলে তবে তো—

তোমার ছেলে কোথায় ?

খুঁজে দেখ এই গাছপালার মধ্যে কোথায় আছে।

সকালের নির্জন নিঃশব্দ গাছপালার মধ্যে কোথাও এতটুকু সাড়া নেই। ভিজে পাতার গা চুইয়ে জল ঝরছে টুপটাপ। ভিজে সবুজ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চারদিক খুঁজে সুশান্তর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘুরতে-ঘুরতে একজায়গায় থেমে গেল সত্যপ্রসাদ। মুগ্ধ হবার মতো গোলাপ। কাঁটাভরা নকনকে সবুজ ডালের মাথায় একজোড়া সাদা গোলাপ এসেছে! এখনো ফোটেনি। সবে কুঁড়ির খোলস সরিয়ে পাপড়ির পেখম মেলেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে সত্যপ্রসাদ।

তারপর একসময় হাত বাড়িয়ে তোলবার জন্যে ডাঁটিতে নখ বিঁধিয়েছে এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে, এ বাগানে ফুলতোলা নিষেধ।

সত্যপ্রসাদ চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিয়ে দেখে সামনে সুশান্ত!

সুশান্ত এগিয়ে এসে বলে, ফুল তুলবেন না। দেখুন যতক্ষণ ইচ্ছে হয় দেখুন!

অপ্রতিভ সত্যপ্রসাদ বলে, আমি জানতাম না!

সেই জন্যেই তো আপনাকে চোখে-চোখে রেখেছিলাম। ভালো কিছু দেখলেই আমাদের ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করে। বোকার মতো হাসে সুশান্ত।

তীব্র চোখে সুশান্তর মুখের দিকে তাকায় সত্যপ্রসাদ তারপর মুখ ফিরিয়ে সিগারেট ধরায়, এমন চমৎকার গোলাপ কখনো দেখিনি তো! কি নাম এর?

আঙ্গরীন। কেউ বলে, আঙ্গরীন অব্ সুইডেন্।

তোমার তো বেশ এলেম আছে দেখছি!

বেকার তো! সারাদিন কি আর করি—গাছপালা নিয়ে থাকি। বড় ভালো এরা; আমার দুঃখ বোঝে!

তাই নাকি?

আবার বোকার মতো হাসে সুশান্ত।

এর সঙ্গে যদি দু'একটা টিউশনি কর তবে তোমার মায়ের একটু রিলিফ হয়। কি বলো? পাশ ফিরে সত্যপ্রসাদ দেখে সুশান্ত নেই। যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সত্যপ্রসাদ গৌরমোহনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সত্যপ্রসাদ চলে যাবার পর সুশান্ত এসে দাঁড়ায়। সত্যপ্রসাদের নখে বিঁধে গোলাপের ডাঁটি কেটে গেছে। এখুনি হয়তো ভেঙে পড়বে। সুশান্তর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে দিয়েছে কেউ। কতদিনকার যত্ন ফুল হয়ে এসেছিল।

ধুর ছাই। সুশান্ত পুকুরের ধারে গিয়ে বসে রাজহাঁসদের শব্দ করে ডাকে। তার দুটো রাজহাঁস আছে। অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা। হাঁস দুটো কাছে এলে তাদের খাবার দিতে থাকে। একজোড়া আইরীনের একটা ভেঙে গেছে। এরপর সত্যপ্রসাদ হয়তো বলবে, হাঁস দুটোর একটাকে মাংস হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়? লোকটা সুশান্তর যা কিছু প্রিয় তার দিকে হাত বাড়াবে নাকি!

পিছন ফিরে সত্যপ্রসাদের দিকে তাকায় সুশান্ত। তাকে আর দেখা যায় না। হয়তো বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। সুশান্ত তার চোখ দুটোকে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করে গেটের উপর ফেলতে গিয়ে দেখে ব্যাগ ঝুলিয়ে অত্যন্ত শিথিল পায় হৈমবতী ফিরছে। এগিয়ে গেল সে।

ফিরে এলে যে—তোমার শরীর খারাপ নয় তো মা?

গাড়ি ধরতে পারলাম না।

মায়ের দিকে বিস্মিত চোখে তাকায় সুশান্ত, আজ পর্যন্ত তোমাকে কখনো গাড়ি ফেল করতে দেখিনি তো!

থতমত খায় হৈমবতী, অবিশ্যি ইচ্ছে করলে যে ধরতে পারতাম না এমন নয়—কি জানি তেমন ইচ্ছে হল না।

তোমার কি হয়েছে বল তো মা ? সুশান্ত তার মুখ মায়ের মুখের উপর ধরে।

কেন রে খোকা ?

বলে-বলে তোমাকে কামাই করানো যায় না আর আজ তুমি এমনি কামাই করলে। শরীর খারাপ ঝড়-বৃষ্টি কিছুই তো তুমি মান না।

সে কথা সত্যি ! আজ কি যেন মনে হল আর দাঁড়িয়ে গেলাম। চোখের সামনে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। হৈমবতীর বিষণ্ন গলার স্বর ঝিম্‌ঝিম্‌ শব্দে বাজে। ব্যাগটা হাত থেকে কাঁধে ঝুলিয়ে হৈমবতী এগোতে থাকে, হ্যাঁরে খোকা চা খেয়েছিস ?

আজ কিছু খাব না মা। মনটা বড্ড খারাপ !

কেন—মন খারাপ হল কেন ? হৈমবতী থেমে চায়।

রাত্রে একটুও ঘুম হচ্ছে না ঘর পালটে দিয়েছ বলে ! মুখটা কি রকম করে সুশান্ত, তা' ছাড়া তোমাদের সতুদা আইরীনদের এক-জনকে নখ দিয়ে মেরে ফেলেছে। মায়ের দিকে এক নজর তাকিয়ে সুশান্ত বাগানের দিকে হেঁটে গেল।

খোকা, এই-খোকা ? হৈমবতী শঙ্কিত গলায় ডাকে, শোন—শুনে যা'—

সুশান্ত না-ফিরে উত্তর দেয়, আজ আমার কিছু ভালো লাগছে না। ডাকাডাকি ক'র না আমাকে।

সুশান্ত পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে সোজা মাঠে নেমে গেল। কী রকম উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে !

হাঁটু-ডোবা ঘাসের মধ্যে পা ফেলে সরষে-ফুল ফোটা হলদে ক্ষেত ভেঙে অড়হড় গাছের ছায়ায় ডুব দিয়ে নাম-না-থাকা সেই খালের দিকে এগিয়ে গেল। সারা মাঠে বুঝি রোদের তাঁবু পড়েছে। একটানা উত্তুরে বাতাসে তাঁবুর পর্দা ছলছল করে কাঁপছে।

খালের ধারে এসে দাঁড়ায় সুশান্ত। তারপর সেখানেই বসে পড়ে। নিজেকে অসহায় আর বিপর্যস্ত বলে মনে হয়।

তিরতির করে জলের ধারা বয়ে চলেছে। রুপোলি এক ঝাঁক মাছ সাঁৎরে এপার-ওপার করছে। সেই হাড়-কাঁপানো খালের জলে পা ডুবিয়ে সুশান্ত ভাবতে থাকে :- তার উপর অদৃশ্য কোন শত্রুর আক্রমণ সুরু হয়েছে।

বাতাসে সরষে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। সুশান্ত বুক ভরে সেই গন্ধ নেয়। কেমন রুক্ষ আর উদাস গন্ধ!

কতকাল আগে বুঝি এই গন্ধের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। হঠাৎ তার নীলমণিগঞ্জের কথা মনে হল। ছেলেবেলার নীলমণিগঞ্জের সেই মাঠ এখন তার কাছে রূপকথা! কতদিন দাদামশাইয়ের টাট্টু ঘোড়া চড়ে সেই মাঠে ছোটাছুটি করে ফিরেছে। ছেলেবেলার সেই পরিচিত গন্ধ আজ হঠাৎ যেন যুবক সুশান্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখে সারামাঠের প্রান্ত জুড়ে চিকন সবুজ ডালে অসংখ্য সংখ্যাতীত অর্বুদ পরার্ধ সরষে ফুলেরা মুখ তুলে চেয়ে আছে। তাদের গন্ধ খালের পথ ধরে সুশান্তর কাছে হেঁটে আসে। চারদিকে তাকায় সুশান্ত, এই মাঠ পার হয়ে ছেলেবেলার সেই নীলমণিগঞ্জে ফিরে যাওয়া যায় না!

চিল উড়ছে। মেছো-চিল।

জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে সুশান্ত। শিরশির করছে তার শরীর। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা জলেরা উলটে-পালটে সুশান্তকে পেঁচিয়ে ধরতে চাইছে।

শুকনো বেলে-মাটিতে শুয়ে পড়ে সুশান্ত। সোয়েটার ভেদ করে ঠাণ্ডা উঠছে। কিছু একটা পেতে নিতে পারলে সুবিধে হত। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লাইন দিতে গিয়ে একটা কাগজ কিনেছিল। সেটা এখনো পকেটে আছে। কাগজ বের করে পাততে গিয়ে হঠাৎ খুশিতে মুখ ভরে যায়।

ছোটবেলায় জলে কাগজের নৌকো ভাসাতে যে-খুশি সেই খুশি বুঝি কথা বলে ওঠে। কাগজ ছিঁড়ে নৌকো বানায় সুশান্ত। জলে ভাসিয়ে দিল একটা। ভাসিয়ে দিয়ে বসে থাকে সুশান্ত। কাগজের নৌকো বাঁশপোতা সাঁকোর তলা দিয়ে ভেসে যায়। তারপর আরেকটা ভাসায়। পর পর ভাসিয়ে দেয়। জল যেন সময়ের মতো তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সামনে থেকে দূরে। দূরে থেকে বহুদূরে। বর্তমান থেকে অতীতে।

ক'টা ভাসাবে সুশান্ত একটা দু'টো তিনটে চারটে পাঁচটা ছ'টা···। তার বাইশ-তেইশ বছরের সঙ্গে মিলিয়ে বাইশ-তেইশটা নৌকো ভাসাবে নাকি! তাই ভাসায়! অতীতের নিষ্পলক বছরের মতো নৌকোরা নিঃশব্দে মেচো-চিলের ছায়া গায় মেখে সাঁকোর তলায় রোদ-ছায়ার আল্পনা-আঁকা পরিসরটুকু পার হয়ে যায়। পিছনে কিছু রেখে যায় না। অথচ হৃদয়ের সবটুকু নিয়ে যায়।

বসে থাকে সুশান্ত। চনচনে রোদ উঠেছে। নরম উত্তাপ কম্বলের মতো সারামাঠে বিছিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে উত্তরের শীতল বাতাস হরিণের মতো তার উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। সরষে ফুলের ক্ষেতে দোলা লাগছে। ঘাসের পাতা কাঁপছে।

মধ্যাহ্ন-সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুশান্ত চেঁচাতে থাকে, বাঁচতে চাই— আমি বাঁচতে চাই। তার শরীর কাঁপছিল। হঠাৎ বালির উপর থেকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, বড্ড ভয় করছে আমার —ভয় করছে আমার—ভয় করছে—

শীতকালে বিকেলের অনেক আগে বিকেল আসে। তখনও রোদে রঙ থাকে। গাছপালা মাঠ বাড়িঘর লোকজন সেই রঙ গায় মেখে রূপকথা হয়ে ওঠে। এই রূপকথা গুনগুন করছিল হৈমবতীর মনে। পাশে সত্যপ্রসাদ নিঃশব্দে হাঁটছিল।

হঠাৎ হৈমবতী ছুটে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে, মাঠের ভিতর থেকে কেউ হেঁটে আসছে না সতুদা।

সত্যপ্রসাদ বলে, সুশান্তই তো দেখছি—

কী রকম ভাবে হাঁটছে দেখ। হৈমবতী গলার স্বরে উৎকণ্ঠা ছেলেটার আজকাল কী যে হয়েছে।

কিছু যদি মনে না কর তো বলি, ছেলেটাকে কী করে তুলছ।

কেউ কি আর করে তোলে সতুদা—যা হবার সে নিজেই হয়।

কী জানি তোমার ছেলেকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

সুশান্ত ইতিমধ্যে কাছাকাছি এসে গেছে। স্পষ্ট দেখা যায় তাকে। ভিজে জামা-কাপড় শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিচে থেকে উপরে উঠে আসে।

কী হয়েছে তোর খোকা?

কিছু হয়নি তো মা। থেমে যায় সুশান্ত।

তবে ভিজে কাপড়ে এলি কোথা থেকে?

পরে বলব তোমাকে। উঃ যা শীত করছে। নিউমোনিয়া হতে পারে ঠাণ্ডা লেগে। জামা-কাপড় ছেড়ে আসি আগে।

তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।

কী জানি মা, মনে হল অদৃশ্য একটা শত্রু আমাকে আক্রমণ করেছে। ফাঁকা মাঠে পালাব কোথায়। শেষে নেমে গিয়ে খালের জলে বসে রইলাম। নিজের মনে হো-হো করে হেসে ওঠে সুশান্ত, হঠাৎ মনে হল কী বোকা আমি! শত্রু আবার কে। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও শত্রুকে দেখতে পেলাম না। সরষে ফুলগুলো বাতাসে কাঁপছিল। তখন উঠে এলাম। একটু এগিয়ে সুশান্ত থেমে যায়, মা আমার অনসূয়া প্রিয়ংবদা ঘরে ফিরেছে তো?

কখন।

সুশান্ত তার মুখ হৈমবতীর কানের কাছে নিয়ে ফিসফিস করে,

কেউ ওদের রোস্ট খেতে চায়নি তো? আজ আবার শীত পড়েছে—।
সুশান্ত আর দাঁড়ায় না।

রাবিশ্। অধৈর্য মন্তব্য করে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয় সত্যপ্রসাদ।

অন্ধকার এখন গাছের ছায়ার চেয়ে ঘন।

সত্যপ্রসাদ আর হৈমবতী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কথা বলে না। হয়তো বলারও কিছু নেই।

অনেকক্ষণ বাদে হৈমবতী বলে, ঠাণ্ডায় আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সতুদা?

চল। একটু এগিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, তোমার হাতটা দাও হৈম। তারপর নিজেই হাত বাড়িয়ে হৈমবতীর হাত ধরে বলে, কখনো তো কিছু দাও নি। অথচ দেবার কথা ছিল।

হৈমবতী উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে হেঁটে চলে!

বাড়ির কাছে এসে হৈমবতীর হাত ছেড়ে দিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, তুমি এগোও আমি আসছি।

হৈমবতী ভিতরে চলে গেল! বাইরে একলা দাঁড়িয়ে থাকে সত্যপ্রসাদ। ভিতরে ঢোকে না। এ বাড়িতে যেন তার অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে। নিজেকে ঠিক মতো মেলাতে পারছে না।

গৌরমোহন চারদিকে দুর্গের মতো অতীতের একটা পাঁচিল তুলে বসে আছেন। তার সবটুকু দেখা যায় না। কাছাকাছি গেলে যতটুকু চোখে পড়ে তার চেয়ে অনেকখানি আড়ালে থেকে যায়। বর্তমানকে এড়িয়ে চলেন। সেকালের সেকেন্দ্রারাও আলিগড় মথুরা সোনেষ্ট আর সাপড়ি-আনারের বাগিচার মধ্যে একলাই ঘুরে বেড়ান।

হৈমবতীরও বর্তমানে অনাসক্তি। বিগতদিনের অলীক সৌরভে মুগ্ধ হয়ে আছে। ইদানীং দিনরাতের ভিতর দিয়ে সে এক ক্লান্ত প্রাণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে সে কিছুতেই আসতে চায় না। তার আশাও নেই। নৈরাশ্যও নেই। তাৎপর্যহীন অনর্থ এক জীবন

নিজের অজ্ঞাতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো তার মনের কোথাও অলৌকিক এক জগৎ আছে তার মায়া তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হয়তো তার বুকের গভীরে দুর্লভ এক স্বপ্ন আছে সকলের নেপথ্যে তাকে লালন করতে গিয়ে হৈমবতীর সব ঐশ্বর্য বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে সুশান্তকে। তাকে এতটুকু বুঝতে পারে না সত্যপ্রসাদ! অদ্ভুত ছেলে! পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করা মালতিপুরে অথর্ব দাদু আর নিজের ভাবনায় ডুবে-থাকা মায়ের সঙ্গে কি করে বাস করছে কে জানে!

সতু—ও-সতু! নিজের ঘরে বসে ডাকেন গৌরমোহন।

আর ভালো লাগছে না সত্যপ্রসাদের; কাছে গেলেই সেকেন্দ্রারাওয়ের গল্প শোনাতে সুরু করবেন গৌরমোহন। গৌরমোহনের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় সত্যপ্রসাদ। হৈমবতী ঘর গুছিয়ে রেখে গেছে। পরিপাটি এক যত্ন সারা ঘরে পরিচ্ছন্নতায় ঝকমক করছে। টেবিলে পাতা ফুল-তোলা টেবিল-ক্লথের উপর রাখা পুষ্পপাত্রে এজিলিয়া ফুলের গোছায় সেই যত্ন বুঝি রঙীন আছে।

দরজা বন্ধ করে সত্যপ্রসাদ তার বিরাট ফোম-লেদারের সুটকেশ থেকে একটা বোতল বের করে। সারাদিন ধরে এই নির্জীব বাড়ির একটানা নীরবতা তার স্নায়ুর উপর আঘাত করে চলেছে। এত শব্দহীন স্পর্শহীন বর্ণহীন জীবনের মৃদু উচ্চারিত মেলামেশা তার ভালো লাগছে না। চলে যাবে সে। কালই চলে যাবে। এই সাদামাঠা জীবন তার একেবারে বরদাস্ত হচ্ছে না।

আলো নিভিয়ে বোতলের মুখ খুলে বসে সত্যপ্রসাদ। জানালা খুলে দেয়। হু-হু করে বাতাস আসে। আকাশটা যেন প্লানেটোরিয়ামের ছাদের মতো গাছপালার মাথা ঝুঁকে পড়েছে।

অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থেকে নিচে নেমে যায় সত্যপ্রসাদ।

দরজার কাছেই গৌরমোহনের সঙ্গে দেখা; আরে সতু তোমাকেই খুঁজছি—

কিছু দরকার আছে কাকা ?

সেই যে তুমি বলেছিলে সেকেন্দ্রারাওয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার—

সে তো যে কোন সময়েই হতে পারে। লট্‌কা কুয়ার বাড়িটা কেনার পর থেকে খালি পড়ে আছে—সেখানে গিয়েই থাকতে পারেন।

খুব ভালো হয় তা'হলে—। গৌরমোহনের গলা গদগদ, খুব ভালো হয় তা'হলে—

একলাই যাবেন নাকি ?

না-না। সবাই যাব। আমি হৈম আর দাদু। আমরা সবাই।

বেশ তো কবে যাবেন আগে ঠিক করুন।

সেই ব্যবস্থাই করি তা'হলে। আজ রাত্রে হৈমর সঙ্গে কথা বলব। ওখানে তার মাষ্টারির অভাব হবে না। আর হাইডেল ইলেকট্রিসিটিতে দাদুর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সবাই তো আমার জানা-শোনা। এখন যারা সিনিয়র গ্রেডের অফিসর তাদের অনেকেই আমার কাছে কাজ শিখেছে। নিজের মনে মাথা নাড়েন গৌরমোহন, ব্যবস্থা একটা করে ফেলতে পারব। একটা-দুটো দিন নয় জীবনের চল্লিশটা বছর সেখানে কাটিয়েছি। সেখানকার মানুষেরা আমাকে টানছে। মাঝখানের এই দিনগুলো বৃথা গেল। এখন শেষক'টা দিন যদি শান্তিতে কাটাতে পারি।

আবেগে বৃদ্ধের চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। তাকিয়ে দেখেন সত্যপ্রসাদ সামনে নেই।

নিজের ভাবনায় ডুবে থাকেন গৌরমোহন।

সত্যপ্রসাদ আর হৈমবতী রান্নাঘরে বসে গল্প করছিল।

সত্যপ্রসাদ বলে, আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে হৈম।

চারদিক খোলামেলা তো—তা' ছাড়া ঠাণ্ডা বাতাস এসে এই বাড়িটায় ঝাপিয়ে পড়ে।

কাকা আর জায়গা পেলেন না হৈম? পৃথিবী-ছাড়া এমন এক জায়গায় বাড়ি করেছেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে!

সস্তায় পেলেন তাই। তেমন জায়গায় বাড়ি করতে গেলে অনেক টাকা লাগত সতুদা।

এখান থেকে মনে হয় পৃথিবী একটা নির্জন গ্রহ। তোমরা ছাড়া এখানে বাস করবার কেউ নেই।

হৈমবতী বিষণ্ণ হাসে, আমাদের পক্ষে ভালো হয়েছে সতুদা। লোকের চোখের আড়ালে আছি বলে শান্তিতে আছি। দুঃখ তেমন আর বুঝি না।

জোরে মাথা ঝাকিয়ে সত্যপ্রসাদ উত্তর দেয়, এই নির্জনতা আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

তুমি তো চলে যাবে সতুদা। আমাদের জন্যে দুঃখ করে লাভ কি! এইখানেই চিরকাল আমাদের থাকতে হবে। মরতেও হবে।

কাকা বলছিলেন, তোমাদের সকলকে নিয়ে সেকেন্দ্রারাও যেতে চান।

আমি যাব না। জীবনের অনেকদিন তো কেটে গেল। আশা করবার কিছু আর নেই।

সত্যপ্রসাদ উঠে দরজার বাইরে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে আবার মোড়ায় এসে বসে, আজ তোমার মেনু কি হৈম?

তরকারি, ডাল, আচার আর পুডিং—

মাংস খাওনা কেন শীতে?

কলকাতার মতো এখানে তো মাংসের দোকান নেই সতুদা। কেউ হাঁস-মুরগি বেচতে এলে রাখি।

মাংসের ঝোল রাঁধ নাকি?

রোস্ট করি। বাবা রোস্ট ভালবাসেন।

রোস্ট খাবার মতোই ঠাণ্ডা বটে। অনর্গল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সত্যপ্রসাদ, তা' রোস্টের মাংস তো তোমাদের বাড়িতেই আছে।

হেসে ওঠে হৈমবতী, বদরি না বুলবুলির?

না-না। রাজহাঁস দু'টো রয়েছে তো—টারকির বদলে ভালোই হবে।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথা বলছ? চমকে ওঠে হৈমবতী।

তা'হলে তাই হবে। বল তো ধরে এনে তৈরি করে দি—

হৈমবতী বিহ্বল হয়ে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ অন্ধকারকে খান-খান করে কার তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ওঠে, না-না-না-না—

হৈমবতী ভয় পেয়ে ফিসফিস করে, কে—ও কে?

সত্যপ্রসাদ ছুটে গিয়ে বাইরে দাঁড়ায়, কে?

গৌরমোহনও এসে দাঁড়ান, কি হয়েছে হৈম?

সুশান্ত বাইরের একগলা অন্ধকার গায় মেখে মাথা ঝাকাতে-ঝাকাতে উপরে উঠে গেল, না—না—না—

গৌরমোহনের শীত-কাতুরে বাড়িটা ভয়ে থরথর করে কাঁপে।

তিনজন তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুশান্তর পায়ের শব্দ যখন উপরে উঠে গেল তখন সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার হৈম?

বুঝতে পারছি না সতুদা।

গৌরমোহন বলেন, তুই একবার দেখে আয় তো মা হৈম—

তাই যাচ্ছি। শিথিল কণ্ঠে উত্তর দিয়ে হৈমবতী আঁচল কাঁধে ফেলে উপরে উঠে যায়।

গৌরমোহন ঘরে ফিরে গেলেন। সত্যপ্রসাদ বারান্দায় একলা দাঁড়িয়ে থাকে।

হৈমবতী আর নামে না। আবছা আলোকিত সিঁড়িটা অজগরের

মতো। গা এলিয়ে পড়ে আছে। সেই সিঁড়ির সামনে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সত্যপ্রসাদ। তার নিজেরও উপরে উঠতে ভয় করছিল।

গৌরমোহন সান্যালের যে-বাড়িটা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল —স্নায়ু অস্থির হয়ে উঠেছিল সে বাড়ির উত্তেজনা এখন শান্ত হয়ে গেছে।

কনকনে শীতটা আবার বোঝা যাচ্ছে। শরীরে দাঁত বসাতে চাইছে।

অনেক পরে হৈমবতী নিচে নামে।

কী ব্যাপার হৈম? হৈমবতী উত্তর দেবার আগে সত্যপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করে।

ঠোঁট উলটে উত্তর দেয় হৈমবতী, কি জানি।

জিজ্ঞাসা করলে না?

দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অত করে ডাকলাম একবারও সাড়া দিল না।

তোমার ছেলেটার রকম-সকম কেমন মিষ্টিরিয়াস্।

ওর স্বভাবই ওই রকম সতুদা।

বড্ড প্রশ্রয় দিচ্ছ ছেলেকে হৈম।

কি যে করি ওকে নিয়ে বুঝতে পারছি না। এমন অবুঝ—

সত্যপ্রসাদ গুম হয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

আবার বাইরে যাচ্ছ কেন সতুদা। হৈমবতীর গলায় ব্যাকুলতা অনুভব করা যায়, ক'দিনের জন্যে এসে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে শেষে। চা করে দি?

সত্যপ্রসাদের সাড়া পাওয়া গেল না। তার শরীরটা বাইরের খোলা অন্ধকারে ডুবে গেছে।

রান্নাঘরের দিকে ফিরে যায় হৈমবতী।

উনুনের আঁচ বয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হৈমবতীর মনে হয় গনগনে উনুনের মুখটা যেন রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে।

গৌরমোহন দরজায় এসে দাঁড়ালেন, তোর রান্না হয়ে গেছে হৈম?

এই হয়ে এল বাবা।

শুতে যাবার আগে আমার ঘরে একবার আসিস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

কি কথা বাবা! অবাক হয় হৈমবতী।

ভাবছি, এখানকার পাট চুকিয়ে আবার সেকেন্দ্রারাও ফিরব। তুই কি বলিস?

আমি কি বলব!

বাঃ, তোদের জন্যেই তো যাওয়া--আমি আর ক'দিন! গৌরমোহন নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাকে একটু উত্তেজিত মনে হয়।

গৌরমোহনের পথের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী।

রাত্রে ঘরে গিয়ে ঘুমুতে পারে না হৈমবতী। শেষে সুশান্তর সোয়েটার নিয়ে বসে! বসেও কি শান্তি আছে! বারবার উন্মনা হয়ে যায়। কি হয়েছে সুশান্তর—এমন অস্বস্তি বোধ করছে কেন! ছেলেটা ক্রমশ কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

হৈমবতীর একটি মাত্র আশা ছেলেকে বড় করবে। সে সাধ আর মিটল না। সুশান্তর প্রকৃতি অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। হৈমবতীর বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে—পাগল হয়ে যাবে না তো!

সুরপতির কথা মনে হল। সে থাকলে এ ভাবনার যন্ত্রণা তাকে একলা বইতে হত না। আজ আর ভাবতে গিয়ে সুরপতির মুখ স্পষ্ট হয় না। একেবারে ধূসর হয়ে গেছে। ক'টা আর দিন। মাত্র সেই কয়েকটা দিনের স্মৃতি কি সারাজীবন বেঁচে থাকে! প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিমুহূর্তে তা' মলিন থেকে মলিনতর হয়ে গেছে!

হ্রস্ব স্মৃতি-পরিসরের সেই যাদুঘরের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। হৈমবতীর মনের ইচ্ছে কখনো সেই দরজা খোলে না।

জীবনের এক পর্বে যা সত্য ছিল পর্বান্তরে তাই কুহকীর ছলনা। হৈমবতীর বুকের ভিতর থেকে অনায়াস দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সেই ভয়ঙ্কর দিনের পর সুরপতির সঙ্গে আর দেখা হয় নি। চোখ তুলে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী।

কয়েকদিন ধরে রাঙা-মা কি রকম পালটে যাচ্ছিলেন। পানে টুকটুকে হয়ে থাকত তার ঠোঁট। অত পান খেতেন রাঙা-মা কিন্তু দাঁতে তার একটুও দাগ ধরেনি। মুক্তোর মতো ঝকঝক করত। সারা শরীরে কোথাও গওনা ছিল না। হাতে দুধ-রঙের এক জোড়া শাঁখা আর গলায় কড়ির মালা। চুলে যেদিন তেল দিতেন পাহাড়ের গায় থাক-কাটা শস্য খেতের মতো উপর থেকে নিচে নেমে যেত সেই চুলের বাহার! হাসলে গালে টোল পড়ত! তবু বোঝা যেত ভাঁটা লেগে গেছে।

হৈমবতী কতদিন ভেবেছে, জড়োয়ায় সাজালে এই চেহারা কী হত!

ক্রমশ বুঝি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন রাঙা-মা। ছাদে উঠে সেই অস্বাভাবিকভাবে ঘোরাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছিল। একদিন সহজ হয়ে দরজায় দাঁড়ালেন রাঙা-মা, ছেলেপুলে না হলে সংসারে সুখ নেই বৌমা।

লজ্জায় মাথা নিচু করল হৈমবতী।

সত্যি বৌমা ওর জন্যেই তো সংসার পাতা! ওরা এলে তবেই সংসার ভরে ওঠে!

রাঙা-মায়ের মুখের দিকে চুরি করে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিল হৈমবতী।

সেইদিন রাত্রে সুরপতির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে হৈমবতী বলল, তুমি অফিসে গেলে সারা দিন বড্ড একলা লাগে!

তা' বটে—কিন্তু কি করবে বল!

বাড়িতে একটা মানুষ-জন নেই। এত খারাপ লাগে—

একটু ভেবে সুরপতি বলে, আচ্ছা হেনাকে এনে রাখলে কেমন হয় ?

ও থাকলে তো ভালোই হত। মা-বাবা কি ছাড়বে—কোলের মেয়ে।

তা' হলে ?

অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হৈমবতী বলে, ভগবান তো আমাদের ছেলেপুলে দিতে পারেন।

ছোটছেলের মতো হেসে উঠেছিল সুরপতি, ধোৎ—এক্ষুনি কি !

হৈমবতী কোন উত্তর দেয় নি। শুধু গভীর ঘুমের মধ্যে সুরপতিকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে।

কিছুদিন ধরে রাত্তিরে আর রাঙা-মার কান্না শোনা যেত না। কাকাবাবুর চিৎকারও শোনা যেত কদাচিৎ। রাঙা-মা সম্পর্কে হৈমবতীর মনে যে সব আশঙ্কা ছিল তা' আর রইল না। রাঙা-মার উপরে আসাও কমে গেছিল। কয়েকদিন ধরে তাও বন্ধ। উপর থেকে নিচের নিতল অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে হৈমবতী দেখেছে একতলার কোন সাড় নেই। এক-একবার মনে হয়েছে রাঙা-মা চলেই গেলেন নাকি ! অনেকদিন থেকেই তো যাব-যাব করছেন। হয়তো তাই চলে গেছেন। খোঁজ নেবার উপায় নেই অথচ খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে।

রাঙা-মা এলে তবু এইসব একঘেয়ে একটানা দিনগুলোর রঙ পালটায়।

বৃষ্টির দিন যেন কিছুতে কাটত না। জানালা খুলে মেঘের দিকে চেয়ে বসে থাকত হৈমবতী কখন সুরপতি আসে ! আকাশ জুড়ে মেঘের সমারোহ ! সেকেন্দ্রারাওয়ের আকাশে এমন সমারোহ কখনো দেখেনি। মেঘের ছায়া সারা সহরের মুখে। মনে। নিমীলিত একটা সুখের আভাস পুবের হাওয়া হয়ে বয়ে যায়। একালের ঘর-বাড়িগুলো এক লহমায় অলীক একটা স্বপ্নলোকে নিথর হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুর নেই।' শাশুড়ি নেই। একটা ননদ কি দেওরও থাকতে নেই! হাতের কাজ কখন শেষ হয়ে যেত। বিকেলের রান্না—তাও করে রাখত। তারপর সন্ধে পর্যন্ত অবকাশ। আকাশের মতো তার সীমা নেই। বাধা নেই। নিষেধ নেই। কারো খবরদারিও নেই এতটুকু। নিজের ইচ্ছের সমুদ্রে ঘুরে-ঘুরে শেষে হাঁপিয়ে উঠেছে হৈমবতী। এরই মাঝখানে রাঙা-মা এসে তাকে মুক্তি দিত।

একদিন সুরপতি অফিস থেকে ফিরে দেখে রাঙা-মা ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখন বেলির ডালে একটাও ফুল নেই। জুঁইও কখন বাতাসে ঝরে গেছে! জানালা দিয়ে সুরপতি রাঙা-মার প্রতিটা পা-ফেলা নজরে রাখছে। সুরপতিকে দেখলেই বোঝা যায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, জানালা বন্ধ করে দেব?

না। ভারি শোনায় সুরপতির গলা, অফিস থেকে এসে যে একটু শান্তিতে থাকব তারও উপায় নেই।

রাগ ক'রো না। অনুনয় করে হৈমবতী, এই খেটেখুটে এলে শান্ত হয়ে বোস।

কিছু করবার উপায় নেই! নইলে দু'টোকেই তাড়াতাম।

চুপ্‌-চুপ। সুরপতিকে শান্ত করে হৈমবতী।

কে জানতো জ্যাঠামশাই আর ঠাকুমা দু'জনে একসঙ্গে চলে যাবেন! একটা উইল করে রেখে গেলে এ সব সহ্য করতে হত না। কপাল—। দাঁতে দাঁত চেপে গজরাতে থাকে সুরপতি, কোনখান থেকে কাকে ধরে এনেছে—আমাদের মুখ দেখানোর উপায় নেই। ঠাকুমা সারাজীবন কেঁদে গেলেন। এখন আমাকে সেই অনাচার সহ্য করতে হচ্ছে!

কী বলছ তুমি! সুরপতিকে থামাতে চেয়েছিল হৈমবতী, রাঙা-মা শুনতে পাবেন।

অত আমি ভয় পাই না। আমাদের সংসার জ্বালিয়েছে ওরা—এখন আমাকে জ্বালাচ্ছে।

রাঙা-মা কখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ খেয়াল করে নি। হৈমবতী মুখ ফিরিয়ে দেখে রাঙা-মা দরজার কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। সিঁড়ির রেলিং ধরে দম দেওয়া পুতুলের মতো রাঙা-মা নেমে গেলেন। কী ক্লান্তি আর নিরুপায় শৈথিল্য তার নামায়।

একদিন রাঙা-মা জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বুঝতে পারছ বৌমা ?

হৈমবতী দুঃখ করে বলেছিল, আমার বোধহয় কিছু হবে না।

সে কি!

তাই তো মনে হচ্ছে।

বাঁজা মেয়ে-মানুষের মতো চেহারা তো তোমার নয়!

কী জানি রাঙা-মা। আমার বড্ড ভয় করে। একলা আর সময় কাটতে চায় না!

রাঙা-মা বলেছিলেন, আর ক'দিন দেখ বৌমা। তারপর না-হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

কীসের ব্যবস্থা ?

উত্তর দিতে গিয়ে হেসেছিলেন রাঙা-মা, কিছু বুঝতে পারছ না ?

কে বোঝাবে! যাদের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দেয় তেমন কেউ তো সংসারে ছিল না। এখন হৈমবতী বোঝে। শরীরটা হঠাৎ কি রকম খারাপ হয়ে যেত। সারা শরীরে ব্যথা। হঠাৎ-হঠাৎ বমি আসত। বমি হত না। বুকের ভিতরটা ফাঁকা মনে হ'ত। কী যে হ'ত বুঝতে পারত না হৈমবতী।

সুরপতি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাকে আজকাল শুকনো দেখায় কেন ?

কী জানি!

নিজের সম্পর্কে হৈমবতীর কোন ধারণাই ছিল না। যদি থাকত তা'হলে জীবনের এমন একটা গভীর অনর্থ এড়াতে হয়তো পারত।

পুজো তখন পার হয়ে গেছে।

কালিপুজোর কাছাকাছি রাঙা-মা একদিন বললেন, বৌমা সেই যে তুমি বলেছিলে যাবে নাকি একদিন ওষুধ আনতে?

কী ওষুধ—খেতে হবে নাকি?

মাদুলি করে পরতে হবে।

সে পারব না। ও দেখে ফেললে রাগারাগি করবে।

তা'হলে?

খাবার ওষুধ পাওয়া যায় না?

যায় বোধহয়। জিজ্ঞেস করে পরে তোমাকে বলব।

সেই ভাল রাঙা-মা।

কালিপুজোর দিন সন্ধের আগে সুরপতি তাদের ক্লাবে থিয়েটার করতে চলে গেল। যাবার জন্যে অনেক সাধাসাধি করেছিল হৈমবতীকে। ইচ্ছেও ছিল—শরীর খারাপ বলে যেতে চায় নি হৈমবতী।

দু'বার চা খেয়ে গলাটা ঠিক করে নিল সুরপতি। তারপর বেরিয়ে যাবার আগে বলল, ছাদের দরজাটা দিয়ে দাও।

তাড়াতাড়ি চলে এস।

তাই আসব! যেতে গিয়েও থেমে যায় সুরপতি।

হৈমবতী ছাদের দরজা বন্ধ করে নি। হয়তো ভুলে গেছিল। শহর দীপান্বিতা। উৎসবের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ছাদে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল হৈমবতী।

বৌমা। হঠাৎ রাঙা-মার গলা শোনা গেল।

চমকে উঠে পিছনে তাকায় হৈমবতী।

উপরে উঠে রাঙা-মা বলেন, একলা ছাদে দাঁড়িয়ে আছ যে?

ও তো বাড়িতে নেই; তাই কি আর করি দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ান দেখছি।

আজ যাবে নাকি?

কোথায়?

সেই যে ওষুধের কথা বলেছিলাম—

এখন ? ঠোঁট দিয়ে দাঁত কামড়ে ধরে হৈমবতী।

সুরপতি বাড়ি নেই ! ত'ছাড়া দিনটাও শুভ—

আজ যাব না রাঙা-মা। মাথা নাড়ে হৈমবতী।

দেরি হবে বলে ভয় পাচ্ছ ? সে আমি বলে রেখেছি। বেশি দেরি হবে না—

রাঙা-মা—। সঙ্কোচ ছিল দ্বিধা ছিল হৈমবতীর গলায় !

মিথ্যে ভয় পাচ্ছ বৌমা ! আমি তো সঙ্গে থাকব ! তোমায় ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে যাব। তা'হলে হবে তো ?

বাধ্য হয়ে রাজি হতে হল হৈমবতীকে। রাঙা-মা যে ছাড়েন না। সেই বয়েসে ভালো-মন্দ কি আর এমন করে বুঝত !

ভালো একটা শাড়ি পড়ে এস। লাল পাড় হলে ভালো হয়।

বেনারসি আছে একটা গোলাপি রঙের—হবে ?

হবে না কেন ! ভালোই হবে।

হৈমবতী বলল, তা'হলে একটু দাঁড়ান রাঙা-মা।

শুধু শাড়িটা পড়ে এস।

বেশি দেরি করে নি হৈমবতী। শাড়ি পরে কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

এস বৌমা। রাঙা-মা হাত বাড়িয়ে হৈমবতীর হাত ধরেছিলেন।

দরজায় তালা দিয়ে আসি রাঙা-মা।

নিচে নামতে-নামতে রাঙা-মা নিজেই হাত দিয়ে হৈমবতীর ঘোমটা টেনে দিয়েছিলেন। আবছা আলোয় সিঁড়ির পথটা পার হতেই রাঙা-মা একতলার ভিতরের দিকে টেনে নিলেন। হৈমবতী কিছু বলবার আগে পুজোর ঘরে নিয়ে একটা পিঁড়ির উপর বসিয়ে বললেন, এই যে রইল—

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে বিহ্বল হৈমবতী কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

বিহ্বলতা কেটে যেতে হৈমবতী দেখে প্রদীপের আলোর সামনে ভয়ংকর এক কালীমূর্তি। পাশে বসে কাকা পূজোর উপাচার গোছাচ্ছেন। রাঙা-মার গলা শুনে তীব্র চোখে হৈমবতীর বেনারসী-মোড়া মূর্তির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাঙা-মার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কতক্ষণ বসেছিল হৈমবতী মনে নেই। শেষে অধৈর্য হয়ে যেমনি পিঁড়ি থেকে উঠতে গেছে অমনি হাত চেপে ধরে কাকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

জোর দিয়ে হাত ছাড়াতে চেয়েছিল হৈমবতী। পারে নি। কাকা হঠাৎ মুখের ঘোমটা তুলে বিমূঢ় প্রশ্ন করেছিলেন, কে—কে তুমি?

কাকা—। আকুল আর্তনাদ ছাড়া হৈমবতীর গলা থেকে আর কিছু বের হয় নি।

সুরপতির বৌ! এইটুকু বলে কাকাবাবু থেমে গেলেন, বৌমা! তারপরই হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, ছি-ছি, ছি-ছি, বৌমা তুমি যাও—

কোনরকমে ছিটকে বেরিয়ে এল হৈমবতী। ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল সে।

কাকাবাবু তখন বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, রাঙা-বৌ রাঙা-বৌ—

সেই প্রথম রাঙা-মাকে রাঙা-বৌ বলে ডাকতে শুনল হৈমবতী।

কোথায় গেল সেই রাক্ষসী? সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন কাকা, কোথায় গেল সেই রাক্ষসী! গলা টিপে খুন করব আজ। উঃ, আমার সর্ব্বনাশের ফন্দি এঁটেছে রাক্ষসী! রাঙা-বৌ, কি রকম করাতচেরা ফ্যাসফেসে হয়ে উঠেছিল তার গলার স্বর।

দুরুদুরু বুকে উপরে উঠে যায় হৈমবতী। দোতলার সিঁড়ি থেকে তিনতলায় ওঠবার পথে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল সুরপতি।

কে! ফিসফিস করে হৈমবতী। প্রথমটা বুঝতে পারে নি।

কোথায় গেছিলে তুমি? সুরপতির গলা কি রকম ভার।

কাকাবাবুর ঘরে—চল উপরে গিয়ে বলছি—উঃ যা ভয় করছে!

না, ঘরে আর তোমাকে যেতে হবে না। নিচে যাও—তারপর যেখানে খুশি—

কি বলছ তুমি!

যাও—যাও। সুরপতির গলায় আগুন ছিল, দেরি ক'র না। এ বাড়ি আমি পুড়িয়ে দিয়ে যাব। অনেক পাপ এখানে জমেছে। সারাজীবন যে পাপকে ভয় করেছি সেই পাপ আমার ঘরে!

ওগো শোন—। আকুল আবেদন করেছিল হৈমবতী!

হঠাৎ বুঝি বুনো পশুর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল সুরপতি। হৈমবতীর হাত ধরে টানতে-টানতে পথে বের করে দিল, যাও—যাও যাও। পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে সুরপতি। হৈমবতীর মুখের উপর সদর দরজা আছড়ে পড়ল।

অন্ধকারে দরজার গায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে হৈমবতী! হতভম্ব একটা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চোখ দু'টো বার-বার চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছিল।

বাড়ির ভিতর কি হচ্ছিল কে জানে! ভাঙা-চোরার শব্দ আর চিৎকার-চেঁচামেচি কানে আসছিল।

হঠাৎ সামান্য একটা আগুনের শিখা ফণা তোলে অন্ধকারে। পর মুহূর্তে আরো অসংখ্য আগুনের উঁকিঝুঁকি সারা বাড়ির এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। একতলার জানালা-দরজা বেয়ে জড়াজড়ি করছিল তারা। ইতিমধ্যে পাড়ার মানুষেরা জেগে উঠেছে! একটা ত্রাসের হৈ-চৈ সারা পাড়া ছেয়ে ফেলে। সেখানে আর দাঁড়াতে সাহস হয় নি। অশান্ত কান্না বুকে চেপে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল হৈমবতী।

সব শুনে গৌরমোহন খোঁজ নিতে গেছিলেন। অনেকক্ষণ আধ-

পোড়া বাড়িটার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গৌরমোহন ; শেষে প্রতিবেশিদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সুরপতির কাকাকে আগুনে-পোড়া অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। জ্ঞান ফেরেনি। সেখানেই মারা গেছেন। সুরপতির কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি!

হৈমবতী বুঝতে পেরেছিল, রাঙা-মা অনেক আগেই সরে গেছিলেন। কি দারুণ এক প্রতিহিংসার আগুন বুকের তলায় পুষে রেখেছিলেন তিনি! আর সেই আগুনে হৈমবতীর সুখ চিরকালের মতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়ে গেছেন।

এখনো হৈমবতী মনে-মনে ভাবে, যেই তোমার ক্ষতি করে থাকুক রাঙ-মা হৈম তোমার কি ক্ষতি করেছিল! তাকে তুমি হাত ধরে কোন সর্বনাশের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলে। আজ যদি ফিরে আসতে আর হৈমর সঙ্গে দেখা হত—দেখতে, তার বুকের মধ্যে কান্নার এক নদী বয়ে যাচ্ছে। এপার ওপার তার ভরা। তাকে দেখে তুমিও চোখের জল রাখতে পারতে না বোধকরি!

কিন্তু সুরপতি—! সে কেন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। ক্ষণকালের নির্বুদ্ধিতা কি চিরকালের জের টেনে যাবে! কুৎসিৎ এক সন্দেহের বিষে নীল হয়ে সুরপতি একবারও ভেবে দেখল না কি সে করছে! হয়তো পুলিশের ভয়ে হয়তো নিজের ভয়ে আজীবন আত্মগোপন করে রইল। একবার যদি দেখা হত হৈমবতী শুধু বলত, ওগো তুমি যা ভেবেছিলে তা নয়!

হাই তোলে হৈমবতী। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। ঘুমের আর দোষ কি! সারাদিন যা খাটুনি যায়! হাত বাড়িয়ে আলো নেভাতে গিয়ে চোখে পড়ে জানালার সামনে সত্যপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে। হৈমবতীর মনে হল চোখের ভুল।

কী ব্যাপার সতুদা ?

ঘুম আসছিল না। বাইরে বেরিয়ে দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলছে! এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ?

না, এই খোকার সোয়েটার শেষ করছিলাম! শীত এসে গেছে। ওর নিজের তো খেয়াল নেই। আমাকেই ওর কথা ভাবতে হয়।

দরজাটা খুলবে নাকি?

দরজা তো খোলাই আছে।

দরজা দাও না রাতে?

না।

দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে সত্যপ্রসাদ।

ঘুমোবে না সতুদা?

ঘুম আসছে না। হৈমবতীর বিছানায় বসে সত্যপ্রসাদ। তারপর সিগারেট ধরায়।

আমাকে তো রোজ ভোরেই উঠতে হয়!

তা বটে। নিবিড় চোখে তাকিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, ইচ্ছে করে চিরকাল তোমার সঙ্গে থাকি—

তোমার চাকরি? হৈমবতী ঠাট্টা করে।

ছেড়ে দিতে পারি! উত্তর দেয় সত্যপ্রসাদ।

সত্যি!

সত্যি হৈম, তোমার জন্যেই তো সারাজীবন দেশে-দেশে ঘুরে মরছি। এখনও যদি তোমার কাছে বসবার ঠাঁই পেতাম!

তা' তোমার বয়েসেও অনেকে বিয়ে করে সতুদা—

আমিও হয়তো করতাম। করিনি, তোমাকে ভুলতে পারি না বলে। ছোটবেলায় আমরা সবাই মিলে একটা ছবি তুলেছিলাম তোমার মনে আছে হৈম? সেইটেই আমার জীবনে তোমার এক-মাত্র স্মৃতি। মাঝে-মাঝে বের করে সেই-তোমাকে দেখি। অনেক চেষ্টা করেছি। তবু তোমাকে ভুলতে পারিনি। জানি না এ অভিশাপ কি না!

হৈমবতী একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমার ভালোবাসাকে এড়িয়ে যাবার দুঃখ এখনো আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তুমি তো জানো সতুদা আমার কোন দোষ ছিল না। সেই বয়েসের লজ্জা আমাকে বোবা করে দিয়েছিল।

সত্যপ্রসাদ ফিসফিস করে, যদি তোমার দেখা না-পেতাম তা'হলে হয়তো চিরকাল একটা নিস্তেজ বেদনা বয়ে বেড়াতাম। তোমাকে দেখে সেই পুরোন আগুন জ্বলে উঠছে। মনে হচ্ছে তোমাকে আমার চাই। এই সংসার থেকে তোমাকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

হৈমবতীর মুখে একটা বেদনার আভাষ ফুটে ওঠে, এ বয়েসে কি পাগলামি মানায় সতুদা?

কি জানি হৈম তোমাকে দেখলে এখনো সেই আগেকার মতো মনে হয়। নিজেকে সামলাতে পারি না।

রাত অনেক হল। শুয়ে পড গিয়ে সতুদা।

ঘরে যাব?

যাবে বৈকি। ছেলে রয়েছে' বাবা রয়েছেন। তাদের চোখে পড়লে তারা কি ভাববেন বল তো?

তুমি আমার সঙ্গে চল হৈম।

কোথায় সতুদা?

যেখানে গিয়ে সংসার পাতা যায়।

বড্ড লোভ হয় সতুদা। হৈমবতীর গলা ছলছল করে বাজে, আবার ভয়ও করে।

ভয়! ভয় আবার কিসের? কাকে ভয় পাচ্ছ শুনি?

নিজেকে।

কেন?

.কি জানি। বুকের ভিতর সব সময় এমন একটা ভয় বাসা বেঁধে আছে—একটু থেমে হৈমবতী বলে, একলা আছ ভালো আছ। আমাকে নিয়ে কী আবার মুসকিলে পড়বে!

হৈমবতীর আরেকটু কাছে সরে গিয়ে সত্যপ্রসাদ বলে, তুমি কথা দাও হৈম—কাল আমি চলে যাব—

এখুনি তো বলতে পারছি না সতুদা। পরে না হয় একদিন—

সত্যপ্রসাদ হৈমবতীর ডান হাত দু'হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, তুমি বল—

বাঃ-রে একটু ভাবতে দেবে তো! এমন আশ্রয় ছেড়ে যাব আর একবার ভেবে দেখব না।

তুমি আশা দিচ্ছ হৈম?

আশাও দিচ্ছি না। নিরাশও করছি না; কিন্তু আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি সতুদা তোমাকে কি আর দিতে পারব বল! বুকের ভেতর তো কিছু আর নেই। সব শুকিয়ে গেছে।

তুমি আমার সামনে থাকবে এর বেশি কিছু আর চাই না। কাজের শেষে ফিরে এসে দেখতে চাই তুমি আমার জন্যে বসে আছ। তোমার কোলে একটু মাথা রেখে শোব। আর -

সতুদা অনেক রাত হয়ে গেল।

তুমি তা' হলে কথা দিচ্ছ আমার সঙ্গে যাবে?

বললাম তো, এখুনি বলতে পারছি না। ভেবে দেখি।

এখনো ভাববে। সত্যপ্রসাদের গলার স্বর ঝনঝন করে বেজে ওঠে।

হৈমবতী অবাক হয়ে সত্যপ্রসাদের মুখের দিকে তাকায়।

বছরের পর বছর তুমি একটা মরা জীবনের ছবি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছ। কেন জানি না এখনো সেই নিরুদ্দিষ্ট ছায়ার দিকে মুখ করে বসে আছ যদি ফিরে আসে। একটু থেমে থমথমে গলায় সত্য-প্রসাদ বলে যায়, তোমার উপর আমারও একটা দাবী আছে। আর সে দাবী কারো চেয়ে কম নয়। সেই অধিকারেই তোমাকে নিয়ে যাব।

কোথায় নিয়ে যাবে সতুদা? হৈমবতী যেন অবাক হয়।

তুমি যেখানে যেতে চাইবে।

আমার আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই।

হৈম তোমার যে ইচ্ছেটাকে আজ আর অনুভব কর না তাকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে চাই।

লোভ দেখিও না সতুদা। এখনো যেটুকু আছে সেটুকুও চলে যাবে?

তা' হলে? থেমে যায় সত্যপ্রসাদ।

কখন দরজা বাতাসে খুলে গেছে। হৈমবতীর মনে হল দরজার সামনে থেকে কে যেন সরে গেল।

কে—কে ওখানে? দরজার কাছে ছুটে যায় হৈমবতী।

বাইরের অন্ধকার কোন সাড়া দিল না।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হৈমবতী বলে, এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় সতুদা। রাত কম হল না।

তুমি কথা দিচ্ছ হৈম?

হৈমবতী উত্তর দেয় না।

তুমি কথা দিচ্ছ হৈম?

এবারও সাড়া দেয় না হৈমবতী।

তা' হলে কী ভাবব?

যা তোমার ইচ্ছে। হৈমবতীর ঠোঁটের কোণে হয়তো কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল।

বেশ। সত্যপ্রসাদ হৈমবতীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর বেরিয়ে যায়।

দরজা বন্ধ করে হৈমবতী টেবিলে রাখা ঠাণ্ডা জলের গেলাস এক চুমুকে নিঃশেষ করে। তারপর সুইচ্ অফ্ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বুকের ওঠা-নামা হঠাৎ বুঝি বেড়ে গেছে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল হৈমবতীর।

শীতের নিস্তেজ রোদে শিশির-ভেজা গাছপালা টিয়াপাখির ডানার মতো সবুজ্।

হৈমবতী নিচে নেমে দেখে সত্যপ্রসাদ পায়চারি করছে. তোমাকে না-বলে যেতে পারছি না হৈম—

আজই চলে যাবে নাকি?

এখুনি চলে যাব। কাকার সঙ্গে আর দেখা করলাম না। তাকে ব'লো, তিনি যদি সেকেন্দ্রারাও গিয়ে থাকতে চান ব্যবস্থা করে দেব। বাড়িটা খালি পড়ে আছে—

চা খাবে না সতুদা?

থাক। স্যুটকেশ তুলে নিয়ে চলে গেল সত্যপ্রসাদ।

স্টেশনটা কুয়াসায় ডুবে আছে। সেদিকে তাকিয়ে হৈমবতী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, খোকা অ-খোকা—আড়চোখে একবার গৌরমোহনের ঘরের দিকে চেয়ে দেখে। তখনও তিনি ওঠেন নি। তারপর কি মনে করে গেটের দিকে এগিয়ে যায় হৈমবতী।

স্টেশনের চেহারা কুয়াসায় আবছা হয়ে গেছে। স্কেচের মতো হিজিবিজি আঁকা যেন। অস্পষ্ট। তবু সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী।

হঠাৎ ইলেকট্রিক্ ট্রেনের নিঃশব্দ শরীরটা কুয়াসার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। একটু থেমে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কাঁচে-ঢাকা কম্পার্টমেণ্টের জানালাগুলো বিদ্যুতের মতো জেগে উঠে আবার কুয়াসায় ঢাকা পড়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে বিষণ্ন নিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী ফিরে আসে আবার। বাড়ির বারান্দায় গৌরমোহনের দীর্ঘছায়াকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা উঠেছ?

উঠে তোদের কাউকে দেখছি না। ভাবছি, গেল কোথায় সব!

কেন, খোকা নেই?

কি জানি তারও সাড়া পাচ্ছি না।

সতুদা চলে গেল বাবা।

হঠাৎ।

সকালে উঠে দেখি স্যুটকেশ বারান্দায় নামিয়ে পায়চারি করছে। বললাম, এখানে দাঁড়িয়ে যে ?

সতুদা বলল, আমি চলে যাচ্ছি হৈম। কাকাকে ব'লো তিনি যদি সেকেন্দ্রারাও যান তো আমাকে জানালে ব্যবস্থা করে দেব।

নিজের মনে মাথা নাড়েন গৌরমোহন, আমাদের ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে চলে গেল কি না কে জানে। সারাটা জীবন বেচারার দুঃখে-দুঃখে গেল। জন্মে মায়ের ভালোবাসাও একটু পেল না। হৈমবতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, সুশান্ত কিছু বলে নি তো ?

তা বলবে কেন বাবা। সতুদা নিজের দরকারেই চলে গেল।

আর আসবে না ?

আসবে না কেন। সময় পেলেই আসবে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হৈমবতী বলে, তোমার চা নিয়ে আসি বাবা ?

একটু বাদে চা এনে হৈমবতী বলে, কাল রাত্রে ঘুমোও নি বাবা ?

অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিলেন গৌরমোহন, না রে তেমন ঘুম হয়নি।

হৈমবতী গৌরমোহনের পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, খুব ঠাণ্ডা লাগছিল ?

ঠাণ্ডা নয়। মাঝ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কি স্বপ্ন বাবা ?

একটু ভারি গলায় গৌরমোহন বলে, তোর মাকে কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম।

অবাক হয়ে হৈমবতী বলে, মাকে ?

হ্যাঁ, তোর মাকে। স্নান করে খোলা চুলে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। পায়ের শব্দে মাথা তুলে দেখি তোর মা। মুখে

তেমনি হাসি। যদি একবার দেখতিস হৈম। তন্ময় হয়ে গেছেন গৌরমোহন।

তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা।

এই খাই। কাপটা মুখের কাছে তুলে আবার নামিয়ে রাখেন গৌরমোহন, তোর মা বলল, তুমি নাকি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

আমি বললাম, তুমি কি করে জানলে?

তোর মায়ের চোখ ছলছল করে।

হ্যাঁ গো, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে আমাদের বড় কষ্ট। তুমি নেই। হেম্‌নু নেই। এখানে থাকব কোন সুখে। শুনে তোর মা কোন কথা বলল না। বললাম, কি কথা বলছ না যে? তোমারও তো একটা মত আছে।

তোর মায়ের মুখে কান্না স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বললাম, এখানে আমাদের বড় দুঃখ। খেটে-খেটে হৈম কালি হয়ে গেল। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমিও এখানে একলা-থাকা আর সইতে পারছি না। সুখ দুঃখের কথা বলারও একটা লোক নেই। সেকেন্দ্রারাও যেতে পারলে সবাই বুঝি বেঁচে যাই। তুমি আপত্তি ক'রো না।

তোর মা যেমন এসেছিল তেমনি মিলিয়ে গেল। ঘুম ভেঙে সেই থেকে ভাবছি কি করব। তোর মায়ের অমতে কিছু করিনি। কিন্তু আমাদের যাতে ভালো হয় তেমন কিছুতে অমত করবে কেন।

হৈমবতী বলে, তোমার চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল বাবা।

কাপটা মুখে তুলে গৌরমোহন বলেন, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রে।

থাক ওটা আর খেতে হবে না। তোমাকে আমি আবার চা এনে দিচ্ছি—

হৈমবতী সিঁড়ির উপর নেমে ডাকে, খোকা অ-খোকা—দু'বার ডেকে সাড়া না-পেয়ে বাগানের পথে নেমে গেল।

চারদিকের গাছপালার কোথাও সুশান্তর সাড়া পাওয়া গেল না।

পুকুরের ঘাটে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় হৈমবতী। অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে কে যেন গলা দুমড়ে-মুচড়ে মেরে রেখে গেছে। ঘাটের সিঁড়ির উপর তাদের ছেঁড়া-খোঁড়া পালখ ছড়ান। এদিকে-সেদিকে সুশান্তর হাতে লাগান সৌখিন ফুলের গাছ এলোমেলো করে ছড়িয়ে রেখেছে।

কী রকম ভয় পায় হৈমবতী, খোকা অ-খোকা—। নিজের অজান্তে দ্রুত পায় বাগান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। এসব কী অমঙ্গল চিহ্ন চারদিকে!

হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সুশান্ত বলে, তুমি ছুটছ কেন মা?

ভাবছি এসব কি ব্যাপার?

সুশান্ত ভার গলায় উত্তর দিল, কিছু না তো।

হৈমবতী আর কথা না-বাড়িয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সুশান্ত পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করে, চা হয়েছে মা?

হৈমবতী উত্তর না-দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢোকে।

সুশান্ত আর এগোয় না। ফিরে আবার গাছপালার ভিতরে গিয়ে ঢোকে। উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরে। কাল রাতে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে:

জনহীন এক মাঠ। এপার-ওপার নেই বুঝি তার। সকালে রোদ ওঠেনি অথচ বসন্তের আলোয় বসুন্ধরার মুখ স্পষ্ট। বাদামি রঙের উলুখড়ের ক্ষেতে বাতাস এক-একবার ঢেউ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সুশান্ত দেখতে পেল, সেই মাঠে সাদা একটা ঘোড়ার উপর তার মা একেবারে ন্যাংটো হয়ে বসেছে! বুনো ঘোড়াই হবে বুঝি। মায়ের হাতের মুঠোয় ঘোড়ার কেশর। একরাশ মেঘের মতো হৈমবতীর চুল সারা আকাশ ঢেকে ফেলেছে। চুলের এখানে-সেখানে

সাদা পাখিরা উড়ে যেতে গিয়ে তারার মতো চমকে উঠছে। ঘোড়াটা সেই মাঠের মাঝ দিয়ে মাটি ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে। কী তীব্র তার বেগ! মা বারবার সেই ঘোড়ার গা থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে—তবু কোন রকমে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে বসে আছে। মায়ের চোখে অসহ্য একটা অনুভূতি। তার চুলগুলো ফুলে-ফেঁপে সুশান্তর চোখের আলো আর আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

এমনি একটা অবস্থায় সুশান্তর ঘুম ভেঙে গেল। একটু আলো একটু নীল আকাশের খোঁজে চারদিকে তাকায়। তারপর বিভ্রান্ত পাগলের মতো খাটের উপর উঠে বসে।

সকাল থেকে সে ভাবছে এমন স্বপ্ন দেখার মানে কি।

কাল রাতে মাকে সত্যপ্রসাদের পাশে দেখে চমকে উঠেছিল। সুশান্ত জানে-না কত রাত তখন' বোধহয় অনেক রাত হবে। হঠাৎ সুশান্তর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে নিঃশব্দ ডানা মেলে পাখিটা বাড়ির উপর ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। সেই পাখিটার জন্যেই সুশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর মায়ের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে অবাক। দরজাও খোলা। মা আর সত্যপ্রসাদ প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি করে বসে আছে।

হঠাৎ তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। মস্তিষ্কের কোষে-কোষে গরম লাভা ছড়িয়ে পড়ল। তার দাহ সুশান্তকে পাগল করে তুলেছিল। দু'হাতে নিজের মাথা ধরে ঘরে ফিরে এল। দরজাটাও দিতে পারেনি। সারারাত অসহ্য এক অনুভূতি। ভোরের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমিয়ে পড়ে এই স্বপ্ন দেখে সুশান্ত নিজেই ভয় পেয়ে গেছিল। মা কি পাগল হয়ে যাবে' না-হলে এমন উদোম ন্যাংটো হয়ে ঘোড়ায় চড়ার মানে কি!

ঘুমের মধ্যে শরীরে জ্বালা। আধ-ভাঙা ঘুমেও দারুণ অস্বস্তি। ঘুম ভেঙে মনে হল কিছু একটা করা চাই। সেই অবস্থায় টলতে-

টলতে নিচে নেমে এল। পুকুরে যাবার পথে অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে বাইরে টেনে এনে দুমড়ে-মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল। হাঁস দুটোর চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয়েছিল। তবু বাঁচাতে পারল না। কেমন যেন হয়ে গেছিল সে।

কী হয়েছিল সুশান্তর। ভয় থেকে রেহাই পাবার জন্যেই কি দু'হাতে এ্যাষ্টর্ প্যাঞ্জি আর স্নাপ্-ড্রাগনের গাছ তুলে এলোমেলো করে ছড়িয়ে রেখেছে।

কতক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরতে গাছপালার আড়ালে গিয়ে বসেছিল। তার মনে হচ্ছিল যা কিছু সে ভালোবাসে স্বার্থপর এক দৈত্য তাই ভেঙে-চুরে খান-খান করে দিতে চায়। সুশান্তর কি তা'হলে কিছুই থাকবে না। অশরীরী ত্রাস তাকে চেপে ধরেছিল। বুঝতে পারছিল না ভয়ে কাঁপছে না শীতে কাঁপছে।

অনেকক্ষণ পরে তার আহত শীতার্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মায়ের দিকে তাকাতে ভয় করছিল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে বলল, মা চা হয়েছে?

হৈমবতী উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করে, তোর কি হয়েছে রে খোকা?

কিছু হয় নি তো মা।

কি জানি তোর মুখ দেখে কি রকম মনে হচ্ছে-

চা হাতে নিয়ে সুশান্ত বলে, কিছু না মা। কিছু না। সত্যি বলছি, কিছু না। হৈমবতীর কাছ থেকে সুশান্ত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল।

হৈমবতী দরজার কাছে গিয়ে সুশান্তর অমন করে চলে যাওয়া দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্বগতোক্তি করে, ছেলেটা যে দিন-দিন কী হয়ে উঠছে কে জানে!

দুপুরে খাবার সময় ছাড়া সুশান্ত নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে রইল।

বিকেলের আলো খসখসে অন্ধকার হবার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুশান্ত। আর দোতলার বারান্দায় ঝোলান বদরি আর ফিতে-বুলবুলিদের খাঁচার দরজা খুলে দিল।

হৈমবতী ছুটে এসে বলে, করছিস কি খোকা!

দেখতেই তো পাচ্ছ। গলার স্বরে মনে হয় সুশান্ত নয়—এ যেন অন্য কেউ।

পাখিগুলো সব ছেড়ে দিচ্ছিস ?

কি হবে খাঁচায় রেখে ?

তুই কি পাগল হয়ে গেলি খোকা! যা এখান থেকে—হৈমবতী সুশান্তকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বুলবুলি আর বদরিদের খাঁচার দরজা বন্ধ করে দেয়।

সন্ধের পর চা নিয়ে হৈমবতী সুশান্তর দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়. খোকা চা এনেছি—

এখন চা খাব না মা।

কেন ?

এমনি।

কী যে স্বভাব হচ্ছে তোর দিন দিন। নিচে নেমে যায় হৈমবতী. রেখে গেলাম। যা ইচ্ছে হয় কর।

খেয়ে শুতে খুব যে রাত হয়েছিল হৈমবতীর এমন নয়। তবে বিছানায় গড়িয়ে যেতেই ঘুমে চোখ ভরে উঠেছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে।

হঠাৎ শুনতে পেল পাতালের অন্ধকার থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। তার ঘরটা বাড়ির এককোণে। নিচেই রেলের জমির সীমানা। সেইখান থেকে নিশি-ডাকার মতো কে যেন ডেকে যাচ্ছে, হৈম—হৈম—হৈম—।

হৈম প্রথমে ভেবেছিল স্বপ্নেই ডাক শুনতে পাচ্ছে বুঝি

তারপর জেগে উঠে বুঝতে পারে নিচে থেকে কে যেন ডাকছে। ভেজান জানালা গলে যে শব্দটুকু আসছিল তা' থেকে কার গলা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বিছানা থেকে নেমে হৈমবতী জানালার কাছে উঁকি দিল।

নিচে থেকে এক নাগাড়ে শব্দ আসছে, হৈম—হৈম—হৈম—

সতুদা! জানালা খুলে অবাক হল হৈমবতী, এত রাতে তুমি এখানে কেন?

তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

কোথায়?

সে এখনো ঠিক করিনি।

কিন্তু আমাকে তো জানতে হবে সতুদা। লঘু কৌতুকে ভরা হৈমবতীর গলা, এই যে তুমি আজ সকালে চলে গেলে দরকার বলে—আবার ফিরে এলে নাকি আমাকে নিয়ে যেতে?

আমি থাকতে পারলাম না হৈম!

কি যে পাগলামির ভূত চেপেছে তোমার মাথায়! হাসে হৈম, ছোটবেলার সেই পাগলামি এখনো তোমার মাথায় আছে দেখছি!

হৈম—। তীব্র জ্বালা সত্যপ্রসাদের গলায়, তুমি নেমে এস—চল—আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

কূলের কাছে জলের মতো হৈমবতীর গলায় কথা বেজে যায়, রাতকে আমি ভয় পাই সতুদা। কাল সকালে এস। সবাইকে বলে-টলে যেতে হবে তো—

সত্যপ্রসাদের গলায় জোয়ারের টান, কাকে বলে যাবে হৈম! কে আছে তোমার?

কেন, ছেলে রয়েছে। বাবা রয়েছেন।

ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছিল সত্যপ্রসাদের কণ্ঠ, হৈম নেমে এস—ভোর হবার আগে চলে যেতে চাই।

হঠাৎ হৈমবতীর গলার স্বর বরফের মতো কঠিন হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে চলে যাব এমন কথাতো আমি দি নি সতুদা!

আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব হৈম—

পার যদি তাই নিয়ে যেও। জানালার কপাট টেনে দিল হৈমবতী। বন্ধ জানালার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হৈমবতী। ইচ্ছে করছে চলে যায়। বাবা, ছেলে, সুরপতির স্মৃতি সব ফেলে চলে যায়। এই বাসি-জীবনে আর কোন মোহ নেই। হৈম যে শেষ হয়ে যাচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে! হৈমবতীর ভিতর থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে, যাব—যাব—সতুদা আমি যাব!

সবাই ঘুমিয়ে আছে। কেউ জানতেও পারবে না। দু' চারদিন পরে সেও সুরপতির মতো স্মৃতি হয়ে উঠবে!

তবু হৈমবতী দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা ওঠে না।

নিচে থেকে সত্যপ্রসাদের ভারি গলার চিৎকার ভেসে আসছিল, হৈম—হৈম—

হৈমবতী দাঁড়িয়ে ভাবে, ভাগ্যিস তার ঘরটা একেবারে কোণে তাই রক্ষে নইলে বাবা কি সুশান্ত জেগে উঠত। কি কৈফিয়ৎ দিত হৈমবতী!

এক সময় খানিকক্ষণ সত্যপ্রসাদের গলা আর শোনা গেল না। হৈমবতীর মনে হল সত্যপ্রসাদ বুঝি চলে গেছে।

আবার সেই গলার স্বর ভেসে এল, হৈম—হৈম—

অন্ধকার থেকে অনৈসর্গিক শব্দ-সঞ্চারের মতো সত্যপ্রসাদের গলা বারবার কানে এসে ঠেকছিল।

হৈমবতীর মনে হল পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর মৃত্যুর ওপার থেকে শ্রুত-অশ্রুত শব্দস্তরে আত্মার কান্না ছড়িয়ে দিচ্ছে।

থাকতে না-পেরে একবার জানালা খুলতে গেল হৈমবতী। আবার ভাবল, জানালা খুললে সতুদাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তবু জানালা

অল্প একটু খুলে দেখে সত্যপ্রসাদ নিচে দাঁড়িয়ে আছে। মায়া লাগে হৈমবতীর। সারাটা জীবন তার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল!

একসময় হৈমবতী নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যপ্রসাদ চলে যাচ্ছে। আকণ্ঠ অন্ধকার যেন সত্যপ্রসাদকে গ্রাস করে ফেলছে।

হঠাৎ একটা মালগাড়ি পুল পার হয়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে অতি মন্থর গতিতে চলে গেল। তার অসংখ্য ভারি চাকার গুমগুম শব্দে সব কিছু চাপা পড়ে গেল। অন্ধকার মাঠের উপর নিরিবিলিতে ঘাড় গুঁজে বসে রইল।

হৈমবতী তার জর্জর শরীরটাকে কোন মতে টেনে নিয়ে বিছানায় তুলল। কি রকম খারাপ লাগছে। জ্বর হতে পারে। হঠাৎ কান্নায় বিছানার উপর ভেঙে পড়ে হৈম, সতুদা যেতে পারলাম না! যে-হৈমকে তুমি ভালবাসতে সে-হৈম যে আর বেঁচে নেই!

সকালে গাঢ় কুয়াসা নেমেছে। মালতিপুরে সান্যালদের বাড়ি গাছপালা মাঠ স্টেশন সাপের মতো এলিয়ে থাকা রেল-লাইন সব ডুবে রইল।

ঘুম ভেঙে গেলেও হৈমবতী ওঠে না। গায়ে বড় ব্যথা! সারা শরীরে দারুণ একটা অস্বস্তি। এই সংসারের দায়িত্ব বয়ে বেড়ানোর মতো সামর্থ্য যেন তার শরীরে আর নেই। একদিন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে বুকের মধ্যে যে জোর পেয়েছিল তার এতটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই।

অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে হৈমবতী ওঠে। গৌরমোহন চায়ের জন্যে বসে আছেন। সুশান্ত এখুনি এসে চা চাইবে। নিচে নামতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে সুশান্তর সঙ্গে দেখা, কি রে খোকা?

কাল রাত্রে কেউ হয়তো আমাদের বাগানে ঢুকেছিল মা!

কেন? একেবারে ভিজে-ভিজে আওয়াজ হৈমবতীর গলায়।

কী জানি। এই দেখ মদের বোতল—সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে।

অস্ফুট স্বরে হৈমবতী বলে, কে আবার এসেছিল আমাদের বাগানে!

তাই তো ভাবছি মা।

হৈমবতী নিজের কাজে চলে গেল। আঁচ দেওয়া থেকে স্বরু করে অনেক কাজ বাকি। এর মধ্যে চা আর খাবার করে দিতে হবে।

তারপর কখন কুয়াসা কেটে গিয়ে মালতিপুর রোদে ঝলমল করে উঠেছে।

রেল-লাইনের ওধার থেকে লোকের কথা কানে আসছে। হৈমবতী কিছু বুঝতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর অস্পষ্ট সংলাপ ভেসে আসে।

গৌরমোহনকে চা দিয়ে আসবার সময় জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে ভিড় আরো বেড়ে গেছে। দল বেঁধে লোকেরা জটলা করছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সুশান্ত ছুটে আসে।

কি রে খোকা হাপাচ্ছিস কেন?

মা - । উত্তেজনায় সুশান্তর মুখের কথা বন্ধ হয়ে যায়।

কী হয়েছে বলবি তো?

আগে জল দাও তারপর বলছি। জল খেতে গিয়ে সুশান্ত বমি করে ফেলে। তারপর জামার হাতায় মুখ মুছে বলে, জায়গাটা রক্তে ভিজে আছে।

রক্ত। অবাক হয় হৈমবতী, কিসের রক্ত?

অনেক রক্ত মা- -মানুষের—

বলিস কি খোকা!

চাপ-চাপ রক্তে—

সুশান্তকে শেষ করতে না দিয়ে হৈমবতী বলে, রক্ত এল কোথা থেকে।

বোধ হয় ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে।

আহা, কি ভাগ্য বেচারার।

আমিও তাই ভাবছি।

আত্মীয়-স্বজন খবর পেয়েছে?

কি জানি, মুখটা তো আগে দেখিনি। ডোমেরা যখন লাশ সরাচ্ছিল তখন দেখলাম, তোমার সতুদা—

সতুদা। হৈমবতীর গলার স্বর ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখের সমস্ত রক্ত ব্লটিং যেন শুঁষে নিয়েছে। কাঁপা গলায় বলে, সতুদা হবে কি করে—তোর ভুল হয়নি তো?

দিনের বেলায় তো ভুল হবার কথা নয় মা—

নিজের মনে বিড়বিড় করে হৈমবতী, বুঝতে পারছি না। সতুদা ওখানে যাবে কি করে। হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল হৈমবতীর। কোন রকমে দেওয়াল ধরে সামলে নিল। চোখে অন্ধকার ঠেকছে সব। মৃদু গলায় হৈমবতী বলে, আমায় ধর খোকা শরীর বড্ড খারাপ লাগছে। পড়ে গেলাম ধর আমাকে

তারপর আর হৈমবতীর মনে নেই। যখন জ্ঞান হল, দেখে গৌরমোহন মাথার কাছে বসে আছে। বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসে।

হৈমবতীকে চোখ মেলতে দেখে উদ্বিগ্ন গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করেন, এখন কেমন আছিস হৈম?

হৈমবতী মাথা হেলিয়ে বলে, ভাল—

আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। হঠাৎ নাকি তুই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিস?

কি জানি বাবা। হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগল তারপর আর মনে নেই।

গৌরমোহন সুশান্তকে ডেকে বলেন, দাদু মায়ের জন্য গরম দুধ নিয়ে আসি—তুমি একটু বোস এখানে—

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর হৈমবতী বলে, বাবাকে না খোকা। বড্ড দুঃখু পাবেন।

আচ্ছা।

অনেকক্ষণ চপ করে থেকে হৈমবতী বলে, সতুদাকে একবার দেখা যায় না খোকা ?

এখন আর দেখবে কি করে। ওখানে পড়ে থাকলে শেয়াল কুকুরে খাবে তাই ষ্টেশন-মাষ্টার ডোম দিয়ে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মরা মানুষ নিয়ে পুলিশ কি করবে ?

বে-ওয়ারিস লাস তো তাই প্রথমে হসপিটালে যাবে পোষ্টমর্টেম হবে। তারপর হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক ছাত্রদের কাটা-ছেঁড়া শরীরটা দেখিয়ে অস্থি-বিদ্যা শিক্ষা দেবে--

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে হৈমবতী, সতুদা একি হল !

গৌরমোহনকে আসতে দেখে হৈমবতী চোখ বুঁজে থাকে।

মা হৈম এই দুধটুকু খেয়ে নে।

দাও। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে হৈমবতী।

একসময় সুশান্ত আর গৌরমোহন কেউ ঘরের ভিতর রইল না। একলা ঘরে আকুল কান্নায় উতলা হয়ে ওঠে হৈমবতী। সতুদার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে হয়। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে হৈমবতী।

মা মারা যাবার পর হৈমবতীর এমনই মনে হয়েছিল। মা চলে গেছেন ছ'মাস এখনো হয়নি। মা যতদিন বেঁচে ছিলেন দিন-রাত এক রকম কেটে যেত। এখন নিঃসঙ্গ বাড়িতে আপন-ভোলা বাবা আর অবুঝ পাগলাটে ছেলেকে নিয়ে কি করে দিন কাটে ভগবানই জানেন !

একদিন মা বললেন, হৈম আজ শরীরটা কেমন লাগছে রে—

ও কিচ্ছু নয় মা। উত্তর দিয়েছিল হৈমবতী, এই তো সেদিন

স্কু থেকে উঠলে তাই হয়তো খারাপ লাগছে। তোমার তো শরীর খারাপ লেগেই আছে—এই বুক ধড়ফড় করছে—কখন বলছ, সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। কাল বললে ত ওমা হৈম মাড়ি ফুলেছে কি করি বল্ তো ? পরশু শুনলাম, উঠতে গেলে পায়ের শিরায় টান ধরে—। বুড়ো বয়সে ওসব এক-আধটু সকলেরই হয়। তোমার বয়েসে আমারও হবে !

মা ঝিম-ধরা গলায় বললেন, না-রে হৈম, এ অন্য রকম। মাঝে-মাঝে শরীরটা কেঁপে উঠছে, তখন মনে হচ্ছে প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবে।

হৈমবতী ভেবেছিল, এ সব মায়ের মনের রোগ। তাই দুপুরের পর যখন বেরুচ্ছিল তখন মা বললেন, আজ আর নাইবা বের হলি হৈম—

কাল ছাত্রীর পরীক্ষা। আজ একবার না-গেলে চলে। যাব আর আসব।

ফিরতে সেদিন দেরি হয়ে গেছিল। পড়াতে বসলে সহজে আর ওঠা যায় না। রাতে হৈমবতী যখন ফিরল বাড়ির সব আলো জ্বলছে। সারাবাড়ি ঝলমল করছে। বাড়ির কাছে এসে দেখে লোকজন ঘোরাফেরা করছে। এগিয়ে চিনতে পারে মামা মেসো আরো সব আত্মীয়-স্বজন।

গেটের মুখে হৈম সুশান্তকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, মা কেমন আছেরে খোকা ?

খুব ভালো মা।

তার মানে।

এটার্নাল্ পিস্।

সিঁড়ি বেয়ে কোন রকমে উপরে উঠে মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে হৈমবতী, মাগো আমাকে কার কাছে রেখে গেলে !

মা চলে গেলেন। একতলার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখে হৈমবতী বিড়বিড় করেছিল, একলা রেখে গেলে মা—

ধূসর একটা বিশ্বাস জাহাজের সিলুয়েট ছবির মত নোঙর করেছিল হৈমবতীর মনে। সুরপতি ভুল বুঝে আবার ফিরে আসবে। গত বাইশ-চব্বিশ বছর ধরে বিশ্বাসের সেই ছবিটার রঙ একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। হৈমবতী নিজেই সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভালো করে কিছু বুঝতে পারে না। হঠাৎ সতুদা এল। তার কিশোরী কালের ছবি হঠাৎ যেন চমকে উঠল। সেই ভুলে-যাওয়া সুখ-স্বর্গের কৈশোর লালিত স্বপ্ন বুঝি সত্য হয়ে উঠল।

উঠতে চেষ্টা করে হৈমবতী। বুকের ভিতর ধড়ফড় করে। চোখে অন্ধকার লাগে। এত দুবল মনে হচ্ছে কেন? সুশান্ত কোথায় গেল। বাবা কোথায়। ফিসফিস করে হৈমবতী, খোকা, ও-খোকা একটু জল দে--। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে হৈম।

সারাদিনে হৈমবতী একবারও ওঠে না। ডাক্তার আসে। ওষুধ আসে। কখনো গৌরমোহন কখনো সুশান্ত মাথাব কাছে বসে থাকে। সময় হিসেব করে ওষুধ দেয়। সন্ধের দিকে হৈমবতীকে একটু ভালো মনে হয়। তবু উদ্বিগ্ন মুখে সুশান্ত পায়চারি করে অনেক রাতে অস্থির হৈমবতী ঘুমুলে গৌরমোহন বলেন, এবাব একটা লোক দরকার। তোর মায়ের উপর এই সংসারের ভাব চাপালে আর বাঁচবে না।

লোক তো একটা দরকার দাদু। কিন্তু পাবে কোথায়?

সেই কথাই তো সকাল থেকে ভাবছি। আশপাশের গাঁয়ে অনেক রিফ্যুজি এসেছে দেখি একবার খোঁজ করে। গৌরমোহন উঠে বলেন, তুই ত আছিস। আমি নিচে গেলাম। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে রাতে আর বোধহয় জাগবে না। দরকার হলে আমাকে ডাকিস।

আচ্ছা। মায়ের কাছে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকে সুশান্ত।

কী রকম শীত পড়েছে! শরীরের এতটুকুও বেরিয়ে থাকলে শীত যেন কামড়ে ধরে।

হৈমবতী নিঃসাড়ে ঘুমোয়। তার জাগার কোন লক্ষণ নেই। তবু বলা যায় না। তাই জেগে বসে থাকে সুশান্ত। দারুণ ক্লান্তি তার শরীরে। ফুঁটো নৌকোর মতো সেও ঘুমের তলায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে।

চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ে সুশান্ত। মনে নেই কতক্ষণ ঘুমের পর হঠাৎ হৈমবতীর ডাকে ঘুম ভেঙে যায়! জেগে উঠে তীব্র আতঙ্কে ঘোলাটে চোখে চারদিকে তাকায়। সময় লাগে তার সম্বিত ফিরতে।

ও-খোকা খোকা, একটু জল দে বাবা—

চিৎকার করতে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে সুশান্ত। তারপর হৈমবতীর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলে, মা তুমি জল চাইছ?

কতক্ষণ ধরে চাইছি—তোর আর ঘুম ভাঙে না!

সুশান্ত উঠে ফ্লাস্ক থেকে হৈমবতীকে গরম জল দেয়। তারপর ফ্লাস্ক টেবিলে রেখে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে ভাবে, সত্যি কি জল চাইছিল তার মা।

সারাদিনের উত্তেজনার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সুশান্ত। গভীর ঘুমের মধ্যে দেখে, সত্যপ্রসাদ এসে দাঁড়িয়েছে। চাপ-চাপ রক্তে তার সোয়েটার ভিজে। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেছে। সোজা করে রাখতে পারছে না। একটা চোখ বেরিয়ে এসেছে। কী বীভৎস আর ভয়ংকর মনে হচ্ছে সত্যপ্রসাদের মুখ! রক্তে ভেজা চুলে মুখের খানিকটা আবার ঢাকা। ঘোলাটে চোখ দিয়ে কি বিশ্রি ভাবে তাকাচ্ছে!

সুশান্তর দিকে তাকিয়েছিল সত্যপ্রসাদ। মরা-রক্ত জমে ভালো চোখটাও বুঝি কালচে-লাল। ক্রুর আবিলতা সারা মুখে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভয় পেয়ে সুশান্ত বলে ওঠে, কি--কি চাই ?

আমার আর চাইবার কিছু নেই। আমি তো এখন মরে গেছি।

সন্ত্রস্ত সুশান্ত বুড়ো আঙুলের নখ কামড়ে বলে, কবে ?

আজ সকালে আমার লাশ দেখনি—রেললাইনের ধারে পড়েছিল! ডোমেরা নিয়ে গেল।

সুশান্ত ফিসফিস করে, দেখেছি—

অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলাম। হাসপাতালে নিয়ে রক্ত দিলে হয়তো বেঁচে যেতাম।

সুশান্তর গলা শুকিয়ে গেছে। তবু থতমতো খেয়ে উত্তর দেয়, রক্ত। রক্ত কোথায় পাব ?

কেন, তোমার আর তোমার মায়ের শরীরে কত রক্ত। দিতে পারতে না একটু ?

হিম-ধরানো মরা-চোখে সুশান্তর দিকে চেয়ে থাকে সত্যপ্রসাদ। পলকহীন চোখের দৃষ্টি যেন ছুরির ফলার মতো ধারাল।

ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় সুশান্ত। গা ছমছম করে।

হঠাৎ সত্যপ্রসাদ বলে, বড় তেষ্টা একটু জল দিতে পার সুশান্ত ?

ঘড়ঘড়ে গলায় সুশান্ত বলে, জল ?

হ্যাঁ, ঠাণ্ডা জল এক গেলাস। এত যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।

চুপ করে বসে থাকে সুশান্ত। উঠতে পারে না কিছুতে।

সত্যপ্রসাদের আর্তনাদ ক্রমশ চড়তে থাকে, জল দিতে পার, জল—একটু জল ?

সত্যপ্রসাদের গলা যেন মালতিপুর ঢেকে ফেলে। অতিকায় দানবের মতো স্ফীত হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে। সুশান্ত যেদিকে তাকায় সেইদিক থেকেই সত্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে বেজে ওঠে। সেই ভারি কর্কশ আর তীক্ষ্ণস্বর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায় সুশান্তর।

চোখ মেলে শুনতে পায়, বড় তেষ্টা পেয়েছে রে খোকা—একটু জল দে—! অনেক পরে মনেহল এ তার মায়ের গলা!

শীতেও ঘামে ভিজে গেছে সুশান্ত। উঠে পড়ে সে।

পাশ ফিরতে গিয়ে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছিস খোকা?

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মা।

জল খেয়ে এসে সুশান্ত বলে, আলোটা নিভিয়ে দেব মা?

হৈমবতী সাড়া দিল না।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল সুশান্ত। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

কয়েকদিন বাদে অনেকবেলায় ঘুম ভাঙল সুশান্তর। রোদে বাড়ি ভরে গেছে। ডালপালার ভিতর দিয়ে সেই রোদ এসে মাটিতে পড়েছে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত! কী যেন একটা দুর্যোগ কেটে নতুন রোদ ওঠার খুশি তার মনে। হৈমবতীর ঘরে যাবার আগে বদরি আর বুলবুলিদের মুঠো-মুঠো দানা দিয়ে যায়। আদরের বসন্ত-গৌরিকে খাঁচার বাইরে এনে আদর করে।

বাড়ির ভিতরটা গন্ধে ঝাপসা হয়ে আছে। নতুন ফুল এসেছে অর্কিড ভান্দা কোয়েরুলিয়াতে। বেগ্‌নি আলোর মত পাপড়ি। মাঝে মাঝে শীতের বাতাস ঝাপিয়ে পড়ে গন্ধ লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে।

মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে অবাক হয়ে যায় সুশান্ত। অপরিচিতা একটি মেয়ে মাকে ফিডিং কাপে দুধ খাওয়াচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুশান্ত। গ্রীক উপকথার রাজকন্যা এ্যাটলান্টার মতো পটু চেহারা। তেমনি দীর্ঘ ঋজু আর সাবলীল অবয়ব। রঙটাই যা কালো!

মেয়েটি অতলান্তিক কালো চোখের বিস্ময় নিয়ে সুশান্তর দিকে

তাকায়। সুশান্তর মনে হল সেই অপলক চোখের মৌমাছি তার মুখের উপর দিয়ে উড়ে গেল একবার।

মায়ের চোখ না-পড়ে তেমনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে সুশান্ত মেয়েটিকে দেখতে থাকে। মাকে দুধ খাওয়ায়। তারপর বিছানা পরিষ্কার করে। শেষে আসবাবপত্র মুছে ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দিল। তার কপালে ঘামের ফোঁটা হীরের টুকরোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু থেমে আঁচলের কাপড় দিয়ে ঘাম মুছে নিচে নেমে গেল।

সুশান্ত আর দাঁড়ায় না। সেও নিচে নেমে বাগানে চলে যায়। চেনাশোনা গাছপালার সৌগন্ধ্য হঠাৎ যেন ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসে বাতাসের সঙ্গে কথা কইছে।

গেটের কাছে গৌরমোহন সিলভার ওকের তলায় একলা পায়চারি করছেন।

সেদিকে একবার তাকিয়ে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সুশান্ত। চারদিকে তাকায়। না, তারা নেই। নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। মাঝে-মাঝে সে কি পাগল হয়ে যায়। হিংস্র একটা অনুভূতি আদিম মানুষের মতো তাকে খেপিয়ে দেয়।

পুকুরের জলে মাছরাঙাদেব ছায়া চমকে যাচ্ছে। বাগানের কোথাও কাঠ-ঠোকরাদের ঠোঁটের একটানা ঠুক্-ঠুক্ শব্দ বেজে চলেছে।

আজ যেন নির্জন নিঃশব্দ সকালকে ভারি ভালো লাগছে। সুশান্তর মনে হয় স্বার্থপর এক দৈত্যের হাত থেকে তাদের বাড়িটা মুক্তি পেয়েছে।

চারদিকে ঘুরে সুশান্ত আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। অনেক-দিন পরে পুরোন কিছু বইপত্তর নিয়ে বসে।

চা। কথাটা কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে টেবিলে ঠক্ করে একটা শব্দ হল।

হঠাৎ বুঝি জেগে ওঠে সুশান্ত, উঁ! চোখ তুলে দেখে মেয়েটা চলে যাচ্ছে।

চা শেষ করে সুশান্তর মনে হল তার হাতে যেন অনাদি সময়। এতদিন সেই সময়ের জট পাকিয়ে গেছিল। সামলাতে পারছিল না। আজ একবার আগের জন্মের বাড়িটার খোঁজ নিলে কেমন হয়! অনেকদিন খোঁজ-খবর করা হচ্ছে না। সুশান্ত এক-পা দু'-পা করে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

গৌরমোহন তখনো সিলভার ওকের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বেরুচ্ছিস নাকি?

গেটের বাইরে চলে গেছিল সুশান্ত। ফিরে এসে বলে, মেয়েটি কে দাদু?

খুঁজে-পেতে নিয়ে এলাম।

আমি ভেবেছিলাম আমাদের কোন আত্মীয়া হবে বুঝি—

তেমন কাউকে পেলাম না। ভদ্রলোকের মেয়ে। বাবা হেড্-মাষ্টার। পরিবারের সবাই বাংলা দেশের হাঙ্গামায় ছড়িয়ে পড়েছে। এক জায়গায় এসে উঠেছিল। তারাও আর রাখতে পারছিল না। যা' দিনকাল—

তা' ভালো হয়েছে। সুশান্ত আবার বাড়ির দিকে ফিরে যায়।

মেয়েটি পুকুরের ধার থেকে জল নিয়ে ফেরবার সময় গুনগুন করে। সুশান্ত অবাক হয়ে যায়। কতদিন যে কেউ এ বাড়িতে গান করে নি! উৎসুক হয়ে কান পাতে। ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে মেয়েটি বুঝি খুশিতে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাগানের দিকে ঝুকে ফুল তুলতে গেলে সুশান্ত চেঁচিয়ে ওঠে, ফুল তুলো না। এখানে ফুল তোলা নিষেধ!

তাই নাকি? একুশ-কি-বাইশ বসন্তের মেয়েটি সকৌতুকে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বলে, জানতাম না তো। ততক্ষণে তার ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় গোজা হয়ে গেছে। তাই আর দাঁড়ায় না।

এ অন্যায়। মেয়েটির পিছনে প্রতিবাদ ছুড়ে দেয় সুশান্ত।

চিৎকার শুনে মেয়েটি দরজার গোড়ায় থমকে গেল! সুশান্তর দিকে একবার তাকিয়ে খোঁপা থেকে সবগুলো ফুল তুলে দরজার সামনে ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

হৈমবতী চুলে যে তেল মাখে সেই তেলের গন্ধ বাতাসে মসলিনের মত পতপত করে উড়তে থাকে। সারাদিন অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়ায় সুশান্ত। বারবার মায়ের কাছে গিয়ে বসে। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছে তাই নিঝুম হয়ে ঘুমোচ্ছে হৈমবতী। কথা বলার লোক না পেয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে পড়েছিল সুশান্ত।

কিছু দরকার আছে? রান্নাঘরের ভিতর থেকে তিনটি শব্দ ভেসে এল।

না তো। থতমত খায় সুশান্ত।

এক গেলাস জল দেব?

না, একটু থেমে সুশান্ত বলে, এই সময় আমি আর দাদু চা খেতাম। অসুবিধে হবে?

একটুও না। তরকারিটা নামিয়ে দিয়ে আসছি। তারপর আর সাড়া নেই মেয়েটির।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল সুশান্ত। তারপর থেকে মেয়েটির সঙ্গে কথাবলার জন্যে ছটফট করে মরছে। গাছপালা ছায়া বাতাস পাখি ফুলের গন্ধ কিছুই তাকে শান্তি দিতে পারে না।

কাল সকালে আগের জন্মের বাড়ি ঘরের খোঁজে যাবে ভেবেছিল তাও তুচ্ছ হয়ে গেল। মনেহল এই বাড়িতেই বুঝি জন্মান্তরের স্বাদ মিলেছে। এই বাড়িতে এই জন্মের মধ্যে অনাস্বাদিত অনুভব ঢেউ হয়ে উঠেছে। মাথার কাছে রুপোর কাঠি পায়ের কাছে সোনার কাঠি নিয়ে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। উলটে দিলেই ঘুম ভেঙে রাজকন্যা চোখ মেলে জেগে উঠবে।

আনমনা হয়ে থাকে সুশান্ত।

তেচ্‌পাতা গাছে বাতাস লেগে রোদ-মাখানো শীতের দিন অলস মর্মরে ভরে উঠেছে।

দুপুরে শুয়ে ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করে সুশান্ত। কি রকম একটা অপরাধবোধ তাকে উতলা করে তোলে। সত্যপ্রসাদের মতো ভয়ঙ্কর কিছু তো তার বাগান তচ্‌নচ্‌ করে দিতে চায় নি। গ্রীসের রাজকন্যা এ্যাটলাণ্টার মতো সুন্দরী একটা মেয়ে দু'টো প্যাঞ্জি কি কশমস তুলে খোপায় দিতে চেয়েছিল। তাতে সুশান্তর বাগানের কতটুকু ক্ষতি হত!

দুপুরে সুশান্ত লম্বা ঘুম দিল। বিকেলে চা খেয়ে মায়ের ঘর থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে আর বেরুল না।

দারুন শীত পড়েছে। খাড়া উত্তুরে বাতাসে গাছের পাতারা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

সুশান্ত চাদর জড়িয়ে ইতিহাসের এক প্রাচীন বৃত্তান্তে ডুবে রইল। মন কবেকার বিলীন নগরী নসসের রাজপ্রাসাদে ঘুরে বেড়ায়। গ্রীকরা ঈজিয়ান নগর নসস্‌ ধ্বংস করে দিয়েছে। পৃথিবীতে তার রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই। তবু সুশান্ত মনে-মনে সেই রাজপ্রাসাদের পাতালকক্ষের স্যাঁৎসেঁতে ঘোরান-পথের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। দু'পাশে মদ আর জলপাইয়ের তেলে ভরা বড় বড় জালা। জড়ো করে রাখা সোনালি গম। আর অপ্রাকৃত গন্ধে শীত-শীত অন্ধকার বোঝাই।

ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে-দ্বীপে ভাঙা-চোরা সভ্যতার খোঁজে পাল-তোলা গ্যালি জাহাজ ভাসালে কেমন হয়। কালের ইতিহাস পার হয়ে ঈজিয়ান সভ্যতার অন্ধকার শরীর সুশান্তকে ডাকে, এস-এসো—

হঠাৎ পায়ের শব্দে মাথা তুলে দেখে মেয়েটি টেবিলের উপর

খাবার রেখে যাচ্ছে। সুশান্ত সেদিকে একবার দেখে চোখ নামিয়ে নিল।

আজকাল বাড়ির কাজ কত সহজ হয়ে এসেছে। সারাদিনে একবারও রান্নাঘরে যাবার দরকার নেই। সময়মতো সব এসে হাজির।

খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে সুশান্ত। ঘুম আসে না কিছুতে। চোখের সামনে ধানের শীষের মতো ঋজু শরীর মেয়েটি ভেসে বেড়ায়। সকাল থেকেই সুশান্তর নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। মেয়েটা যে খোঁপা থেকে ফুল তুলে ফেলে দিয়েছে সে কথা কিছুতে ভুলতে পারে না।

হঠাৎ কি মনে হল সুশান্ত দরজা খুলে নিচে নেমে গেল। একবার দেখে নিল দাদু ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। তারপর বাগান থেকে অন্ধকার হাতড়ে একগোছা ফুল তুলল। এর আগে কোনদিন এমন করে ফুল তোলে নি। তুলতে পারে নি। কেউ তুলতে গেলে বাধা দিয়েছে সুশান্ত। আজ মনে হল ফুল-তোলার মধুর একটা উদ্দেশ্য আছে। একরাশ ফুল নিয়ে মেয়েটার দরজায় হাজির হল। ভিতরে আলো জ্বলছে। এক-আধ চিলতে বাইরেও এসে পড়েছে।

সুশান্ত দরজায় দু'-একবার মৃদু শব্দ করতে আধ-খোলা দরজায় মেয়েটার মুখ দেখা গেল, কি ব্যাপার ?

ফুল এনেছি।

কার জন্যে ?

তোমার জন্যে।

আমার জন্যে ? অবাক হল মেয়েটি।

হ্যাঁ।

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি, দিন। তারপর সুশান্তর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরছিল তখন হঠাৎ দরজাটা আবার খুলে গেল।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি অবাক, একি এখনো দাঁড়িয়ে? লজ্জায় পড়ে যায় সুশান্ত। কি কৈফিয়ৎ দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

ঘরে আসবেন? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

না।

তবে?

সুশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আচ্ছা লোক তো! সারারাত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

আমি বলতে এসেছিলাম—। ইতস্তত করে সুশান্ত।

কি?

তোমার যখন ইচ্ছে হবে আমার বাগান থেকে ফুল তুলে খোঁপায় দিও—

এ কথা তো কাল সকালেও বলা যেত।

কি জানি আমায় মনে হল এখনই বলা দরকার। তুমি ফুল ফেলে দেবার পর থেকে সারাদিন ধরেই বলতে চেয়েছি। রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না। মুখ না-তুলে সুশান্ত হনহন করে চলে গেল।

ঘরে ফিরে সব জানালা খুলে দিল সুশান্ত। শীতের বাতাস আসছে—আসুক। অন্ধকার আসুক। সেই পাখিটার ছায়াও আসুক।

আবাল্য অপরিচিত এক অভিলাষের সুগন্ধ রাতে ফোটা ফুলের গন্ধ হয়ে হৃদয়ের অলি-গলিতে উড়ে বেড়ায়।

সারারাত সুশান্তর ঘুম আসে না। মনেহয় ঋতু-বদল আসন্ন!

সকালে উঠে বাগানে চলে গেল সে। নীলমণিগঞ্জের কথা মনে পড়ছে। মহীলালের কথা মনে পড়ছে। মহীলালকে পেলে এখনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করত। সন্ধেবেলা অচিনদেশের রাজপ্রাসাদের সামনে গিয়ে হাজির হত। পথের ধারে ফুটে-থাকা ফুল আঁজলা ভরে তুলে রাজকন্যার পালঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তার ঘুম ভাঙার প্রত্যাশায়!

গাছপালার ভিতর কি করছেন ?

সুশান্ত ফিরে দেখে গায়ে চাদর দিয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এত সকালে ?

আমিও আপনাকে সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

আমাকে তো সকালে উঠতেই হয়। পাখি রয়েছে। গাছ রয়েছে। কাউকে খাবার কাউকে জল দিতে হয়।

একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলে, চলি। দেরি হয়ে গেল বুঝি ' চায়ের সময় চলে যাচ্ছে ! দাদু আবার চেঁচামেচি করবেন।

মেয়েটির সঙ্গে সুশান্তও চলতে আরম্ভ করে।

মুখ টিপে হাসে মেয়েটি, কি হল আবার ?

ভাবছিলাম—

কি ?

তোমার নামটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই। দরকারের সময় কি যে অসুবিধে হয় কি বলব !

খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি, নাম-টাম আমার নেই। যে নামে খুশি ডাকলেই সাড়া দেব।

তাই আবার হয় নাকি !

বেশ তো ডেকেই দেখুন না সাড়া দি কিনা !

আচ্ছা। চলে গেল সুশান্ত। একটু পরেই আবার ফিরে এল, আমার নাম জান তো ?

দাদুকে তো ডাকতে শুনি। তা' আপনি যা' চঞ্চল—। মেয়েটির চোখে হাসি ঢেউ হয়ে যায়, বদলে অস্থির রাখলে ভালো হয়। যদি অস্থির বলে ডাকি ?

ডেকো।

রাগ করবেন না তো ?

না, মোটেই না। আমাকে আপনি বললে রাগ করব ? সুশান্ত গাছের আড়ালে চলে গেল।

দুপুরে হৈমবতী বলে, হ্যাঁরে খোকা সকাল থেকে তোর দেখা নেই কেন ?

তোমার কাছেই তো থাকি মা।

দেখি না তো।

ও থাকে তোমার কাছে তাই লজ্জা করে।

ওমা লাবুকে আবার লজ্জা কি !

কি জানি আমার বড্ড লজ্জা করে।

ধুর পাগল ! লাবু সেদিন বলছিল, মাসিমা তোমার ছেলেটা যেন কি রকম !

মাথা নিচু করে থাকে সুশান্ত। মায়ের সামনে লাবুকে নিয়ে কথা বলতে লজ্জা করে, আমি যাচ্ছি মা।

হ্যাঁরে খোকা, এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে খোঁজ-টোজ নিয়েছিলি ?

না তো।

মাঝে-মাঝে গিয়ে খোঁজ-খবর করা দরকার। ওদের উপর নির্ভর করলে কিছু হবে না।

যাব একদিন।

যেতে ইচ্ছে করে না সুশান্তর। এই বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে বেশিক্ষণ আর থাকতে ইচ্ছে করে না। রাত্রে সুশান্তর কি যে হয় মন থেকে লাবুকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। ভাবে, লাবুর ঘরের কাছে গিয়ে ডাক দেয়, সারা রাতটাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে নাকি ! এসো, রাত্রির এই অনাবিষ্কৃত মহাদেশে দুজনে ঘুরে বেড়াই। তোমার-আমার সুখ-দুঃখ একসঙ্গে মিলে-মিশে নীলপদ্মের স্বপ্ন হয়ে উঠুক।

একদিন লাবু বলে, অস্থির তুমি সারারাত ঘুমোও না ?

বোকার মতো চেয়ে থাকে সুশান্ত।

সেদিন রাত্রে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাকে গাছপালার ভিতর ঘুরে বেড়াতে দেখলাম ! মনে হল, এতরাত্রে বাগানে একলা

কি কর! জানালার কাছে বসে রইলাম—কত রাত অবধি। আকাশে চাঁদ। এক-আধটা পাখি ডাকছে। গাছের আড়ালে মাঝে-মাঝে তোমাকে দেখা যাচ্ছিল। উদভ্রান্তের মতো তুমি ঘুরছিলে। জানিনে কী তোমার দুঃখ! আমার ইচ্ছে করছিল, তোমার কাছে যাই—

কেন, তোমার এমন ইচ্ছে করছিল কেন?

কী জানি। লাবু যেন আনমনা হয়ে যায়।

সুশান্ত বলে, আমায় ডাকলে না কেন?

লজ্জা করছিল।

লজ্জা! লজ্জা আবার কিসের?

তুমি যদি কিছু মনে কর?

আমি যদি তোমায় ডাকি? প্রশ্ন করে সুশান্ত।

ভয় পায় লাবু, আমায় ডাকবে কেন?

এমনি।

এমনি?

তুমি আসবে?

আমাকে ডেকো না অস্থির। আমার ভয় করে।

ভয় আবার কিসের?

তুমি যেন কি! হাসির রহস্য ঠোঁটে মেখে লাবু চলে যায়।

চলে যাচ্ছ নাকি?

চা করতে হবে যে—

ও।

তুমি চা খাবে না?

ইচ্ছে নেই। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সুশান্ত। তারপর ভাবে কোথাও যাই। হয়তো বাগান থেকে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। একটু পরে আবার বাড়িতে ফিরে আসে।

মায়ের কাছে গিয়ে বসে সুশান্ত। বসে অস্থির হয়। উঠি-উঠি ভাব।

হৈমবতী ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞাসা করে, তোর কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো খোকা ?

অসুবিধে আবার কিসের মা ?

এই ধর খাওয়া-দাওয়া এইসব আর কি ?

না তো !

চেয়ে-চিন্তে নিতে পারছিস ?

খুব।

তোর আবার লজ্জা বেশি—

হৈমবতী লাবুকে ডাকে, খোকাকে ঠিকমতো খেতে-টেতে দিচ্ছ তো ? মাথা নাড়ে লাবু, যখন যা দরকার করে দিচ্ছি।

বেশ-বেশ। খুশি হয় হৈমবতী, নিজে তো পড়ে আছি। কিছু দেখতে পারছি না। লাজুক ছেলে। মুখ ফুটে কিছু বলে না। নজর রেখ ওর উপর—

গৌরমোহন রোজ দু'-তিনবার মেয়েকে দেখতে উপরে আসেন, কেমন আছিস হৈম ?

ভালোই তো। তোমরা শুধু-শুধু আমাকে উঠতে দিচ্ছ না বাবা ! একটু চলে-ফিরে বেড়াতে আরম্ভ না-করলে কবে যে স্কুলে যাব !

ডাক্তারবাবু তো বলেছিলেন, আরো কয়েকদিন বিশ্রাম নিক—এসব অসুখ সারতে সময় লাগে—তোর শরীরের ভিৎ আলগা হয়ে গেছে হৈম—

সামনে-রাখা চেয়ারে বসেন গৌরমোহন, সতু তো অনেকদিন হল গেছে—এখনো একটা চিঠি এল না তার !

কি জানি বাবা।

এ্যাদ্দিনে একটা অন্তত চিঠি আসা উচিৎ ছিল—আমাকে বলেছিল, কাকা আমি গিয়েই আপনাকে চিঠি দেব। আপনি এদিকে গুছিয়ে-টুছিয়ে নেবেন। তারপর সুবিধেমতো চলে আসবেন।

কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।

তোকে কিছু বলেছিল হৈম ?

আমার সঙ্গে এ নিয়ে কোন কথাই হয়নি।

তা' হলে ?

এমন তো হতে পারে বাবা, কাজের তাগিদে সতুদা দূরে কোথাও চলে গেছে—

আমি বড় উতলা হয়ে উঠেছি রে। মন এখানে আর টিঁকছে না। সবসময় সেকেন্দ্রারাওয়ের কথা ভাবছি। কবে সেখানে ফিরে যাব। পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে আরেকবার যদি দেখা করতে পারতাম তা' হলে দাদুভাইয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। চেয়ার থেকে উঠে গৌরমোহন স্বগতোক্তি করেন, মানুষ যৌবনে যা করে সারাজীবন তাই ভাঙিয়ে তার দিন চলে। বেরিয়ে যেতে গিয়ে গৌরমোহন আবার দাঁড়ালেন, ভাবছিলাম। ইতস্তত করেন গৌরমোহন, তুই কি বলবি জানিনে। ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যাই।

হৈমবতী অবাক হয়ে গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকায়, বেচে দেবে বাবা!

রেখে গেলে কি আর থাকবে ? বারো-ভূতে লুটে-পুটে খাবে। তা' ছাড়া তোরা আর ফিরতে পারবি বলে মনে হয় না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হৈমবতী পাশ ফিরে শোয়, তোমার যা ইচ্ছে—

তোর আপত্তি না-থাকলে আমি একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

হৈমবতীর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে একটার পর একটা সিঁড়ি পার হয়ে নিচে নামতে লাগলেন গৌরমোহন।

হৈমবতীর মনেহল বাবা যেন কতদূর চলে যাচ্ছেন! মা—হেমু সবাইকে ফেলে বাবা বুঝি দূরে চলে যাচ্ছেন। হৈমবতী কি করে যাবে! মাকে ছেড়ে হেমুকে ছেড়ে হৈমবতী তো যেতে পারবে না।

তাদের দেখা যায় না ঠিক! হৈমবতী জানে তারা আসে। তাদের চলাফেরা বুঝতে পারে! ভালোবাসার টানে এখনো তারা এ সংসারে জড়িয়ে আছে!

সবাই চলে গেলে তাদের কি হবে?

হেমন্তে এক-একদিন যখন আষাঢ়-শ্রাবণের মতো মেঘ করে আসে। হু-হু করে শীতের বাতাস বয়। দে'-শলাইয়ের কাঠির মতো ফস্‌ফস্‌ করে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে তখন তো হেনা এই ঘরে এসে ওঠে। মা নেই। দিদি আছে। বাবা আছে। হয়তো তাদের দেখে ভালো লাগে। যেদিন কেউ থাকবে না কাউকে দেখতে না-পেয়ে হেনা হয়তো অবাক হয়ে যাবে। কোথায় গেল তারা—ভেবে কূল পাবে না হেনা। কে আর বলবে, এ বাড়িতে যারা ছিল সবাই সেকেন্দ্রারাও চলে গেছে। ফিরবে না আর। আলো-নেভা অন্ধকার ঘরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়াবে সবাইকে। দিদি নেই—বাবা নেই—খোকা নেই।

ঘরের তাকে এখনো হেনার ছোটবেলার খেলনা সাজানো। আমরুদ কাঠের তৈরি পুতুল প্যাঁচা আর বেড়াল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আগ্‌রা থেকে আনা দু'বাক্স পাখি—জব্বলপুরের ভিড়াঘাট থেকে আনা সেল্‌খড়ির গোটা সাতেক সাদা ধবধবে হাতি যত্ন করে তোলা আছে কাঁচের আলমারিতে। আসতে যেতে চোখে পড়ে। হেনা যেদিন আসে দেখে। তেমনি সাজানো রয়েছে। দেখে বোধহয় খুশি হয়। সে নেই কিন্তু তার স্মৃতি এ বাড়িতে তেমনি সাজানো আছে।

সবাই চলে গেলে হেনা হয়তো অভিমানে গাছপালার ভিতর মাথা কুটে মরবে। খুঁজে বেড়াবে দিদিকে! বাবাকে! পাগলি মেয়েটা হয়তো আর কোনদিন এ বাড়িতে আসবে না।

হৈমবতীর বুকের মধ্যে ফেনিয়ে-ওঠা কান্না চোখের জল হয়ে ঝরে।

শুয়ে দিন আর কাটতে চায় না। তা' মাস-খানেক হয়ে এল বোধহয় বিছানায় ঠাঁই নিয়েছে হৈমবতী। বিছানায় আর থাকতে চায় না মন। ইচ্ছে করে সকালের রোদে সিলভার ওকের তলায় গিয়ে বসে।

মাসিমা।

কে? ফিসফিস করে হৈমবতী। জোরে কথা বলতে পারে না এখনো দুর্বল।

ঘুমোচ্ছ নাকি মাসিমা? লাবু পা-টিপে এসে দাঁড়ায়।

না রে। রাতভোর তো ঘুমোলাম। সকালেই আবার ঘুম আসে নাকি?

তোমার চানের সময় হয়ে গেছে কিন্তু—

এর মধ্যে এগারোটা বেজে গেল।

উঠে দেখনা, সূর্য মাথার ওপর—তোমার গরম আর ঠাণ্ডা জল এনে রেখেছি। তাড়াতাড়ি চান করে নাও। আমি ভাত আনছি।

ল্যাবু, বাবার খাওয়া হয়ে গেছে?

এই তো স্নান সেরে উঠলেন।

খোকা?

সকাল থেকে তো তার দেখাই পাইনি। কোথায় গেছে কে জানে!

আজকাল তো আমার কাছেও তেমন আসে না।

গৌরমোহন আর হৈমবতীকে খাইয়ে লাবু সুশান্তকে খুঁজতে বের হল। দেখে, গাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে গাছের গায় হেলান দিয়ে বসে আছে।

কী দেখছ অস্থির?

লাবুর দিকে না তাকিয়ে সুশান্ত বলে, নীল জানালা দিয়ে পৃথিবীটাকে একটু দেখছি—

খাবার দেরি হয়ে যাবে না?

যাক গে—

মাসিমা কিন্তু রাগ করবে—

সুশান্ত উত্তর না-দিয়ে উঠে গাছের আড়ালে কোথায় সরে গেল।

ও কি কোথায় যাচ্ছ? লাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

শীত চলে যাচ্ছে। তার রাজত্বে বসন্তের হানাদারি সুরু হয়ে গেছে। মনেহয় কেউ হয়তো ভুল করে মাঝে-মাঝে দখিন হাওয়ার দরজাটা খুলে দেয় আর অকারণ কোলাহলে বাতাস এসে ডালপালার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আসন্ন ঋতুর সৌরভ বাতাসে গলাগলি করে করে ঘুরে বেড়ায়।

ঝরাপাতার তামা-রঙে গাছের তলা ভরে গেছে। যে সব পাখিরা শীতে ফেরার হয়ে গেছিল তারা আবার আসতে সুরু করেছে। সেদিন ভোর-রাতে বিনা নেমন্তন্নে একটা কোকিল এসে ডাকতে সুরু করেছিল। আজ কয়েকদিন তার আর পাত্তা নেই।

ঘুম আসছিল না লাবুর। জানালার কাছে অন্ধকারে বসেছিল। হঠাৎ দেখে সুশান্ত লম্বা পা-ফেলে জানালার কাছ দিয়ে যাচ্ছে।

এই অস্থির। অনুচ্চ উচ্চারণ করে লাবু।

থমকে গেল ছায়াটা। মুখ তুলে তাকাল জানালার দিকে, কি?

আমি আসব?

ইচ্ছে হলে আসতে পার।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে লাবু, কি করছ এই অন্ধকারে?

নিজেকে খুঁজছি—। সুশান্ত হাঁটতে সুরু করে দেয়।

লাবু বলে, ওমা—তুমি যে আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ?

হাত বাড়িয়ে দিল সুশান্ত, ধর—

মাথার উপর চাদোয়ার মতো টানানো অন্ধকার-আকাশের তলা দিয়ে দু'জনে হাঁটতে সুরু করে। আকাশে চাঁদ নেই। খোলা মাঠের উপর আধ-ফোটা একটা আলো স্পষ্ট হয়ে আছে।

. কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ?

কি জানি।•

খিলখিল করে হেসে ওঠে লাবু, জান না ?

সত্যি জানি না।

হাত ছাড় অস্থির।

কেন ? সুশান্ত অবাক হয়।

আমার ভয় করছে।

অবাক করলে। তোমাকে ভয় থেকে মুক্তি দিতে চাই। চল না দুজনে পালাই—সকালে উঠে কেউ খুঁজে পাবে না। সুশান্ত লাবুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

আঃ হাত ছাড়। একটু বোধ হয় বিরক্ত হয় লাবু।

সুশান্ত হি-হি করে হাসে, ছাড়ব বলে ধরেছি নাকি ?

কি যে পাগলামি করছ।

সুশান্ত যেন খেপে গিয়ে লাবুর হাত ছেড়ে দিল, পাগলামি—। বিড়বিড় করে সে।

লাবু ভয় পেয়ে বাড়ির ভিতর পালিয়ে গেল।

সুশান্ত সম্বিত পেয়ে দেখে লাবু নেই। এগিয়ে গেল লাবুর জানালার সামনে। মনে হল দরজাটা ভেঙে দিলে কি হয় ! লাবু আর পালাতে পারে ?

দাঁড়িয়ে থেকে সুশান্ত নিজের ঘরে ফিরে গেল। ঘুম আসে না। অশরীরীদের কথা বাতাসে মুখর হয়ে উঠেছে।

সকালে উঠে লাবু সুশান্তর খোঁজ পায় না। চা আবার নিচে নিয়ে এল।

গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করে, দাদু কোথায় লাবু ?

সকালে উঠে তো দেখছি না।

বেলা হলে ডাক-ঘরে গিয়ে খবর নিয়ে আসত। স্বগতোক্তি

করেন গৌরমোহন, সত্যপ্রসাদের চিঠিটা আসছে না কেন কে জানে!

দুপুরে সকলের খাওয়া শেষ হলে লাবু সুশান্তকে খুঁজতে বের হল। পুকুরের ধার থেকে গাছপালার অলিগলি আড়াল-আবডাল সব তন্নতন্ন করে খুঁজে হয়রান হল।

সন্ধ্যেবেলা চাঁদ উঠল। ফালি কাটা চাঁদ।

লাবু রান্না চাপিয়ে সিলভার ওকের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের জনহীন মাঠ অজানা রহস্যের মতো স্পষ্ট হয়ে আছে।

সেদিকে লাবুর মন ছিল না। একটি মানুষের ছায়ার জন্যে অধীর হয়ে থাকে সে। একসময় আবার রান্নাঘরে ফিরে আসে। যখন থাকতে পারে না আবার সিলভার ওকের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। উদাস হয়ে চারদিকে তাকায়! কোথাও সেই পাগল ছেলেটার চিহ্ন নেই।

ঝিঁঝিঁর একটানা ঝিঁ-ঝিঁ যেন নির্জনতার ঘুম-পাড়ানি গান ধরেছে।

লাবু ফিরে গিয়ে সবাইকে খেতে দিল। নিজে খেল। তারপর রান্নাঘরের দরজা দিয়ে শুতে যাবার আগে একবার বাগানে নামল।

আজ হঠাৎ কি করে যেন শীতটা একেবারে কমে গেছে।

লাবুর আজ বড় মন খারাপ। সারাদিন তার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। পথে আসতে ইছামতীর খেয়াঘাটে কোথায় যে সে হারিয়ে গেল!

ভয় করে লাবুর বাড়িতে মা-বাবার কি অবস্থা কে জানে! ইচ্ছে ছিল না লাবু মা-বাবাকে ফেলে আসে। বাবাই জোর করে বললেন, এখানে থাকলে তোকে বাঁচাতে পারব না। তুই পালা। আমরা রইলাম। না-পারলে আমরাও রওনা দেব। লাবু ছোট ভাই তিতুকে নিয়ে গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে হাঁটা পথে বনগাঁ সীমান্তের

দিকে এগোল। সারা পথ খাল-বিল জলা-জমি আর বসতি বিরল এলাকার ভিতর দিয়ে হেঁটে ইছামতীর ধারে পৌছেছিল। নদীর ওপারে অত্যাচার নেই। রাতের বেলা হুড়োহুড়ির মধ্যে খেয়ায় উঠতে হল। তাড়াতাড়ি খেয়ায় ওঠবার সময় তিতুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে লাবু ডাক দিল, তিতু—

সাড়া দিল তিতু, দিদি উঠেছিস তো?

আমি তো উঠেছি। তুই?

হুঁ। তারপর আর তিতুর সাড়া নেই।

খেয়ার কালি-পড়া হ্যারিকেনে আলোর চেয়ে অন্ধকার ছিল বেশি। কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কে উঠেছে আর কে ওঠেনি!

ওপারে পৌঁছে সবাই খেয়া থেকে নামল—শুধু তিতু নেই।

তিতু—তিতু—তিতু—

সেই চলমান ঋজু-বাঁকা জনস্রোতের কোথাও সাড়া নেই তার।

জলে পড়ে গেল নাকি!

সঙ্গী-সাথীরা বলল, জলে পড়লে তো শব্দ হবে—

তা'হলে?

পরের খেয়ায় এসে পড়বে। বলল একজন, আমরা তো আজ এখানে থাকব। এসে পড়বে তার মধ্যে—

সারারাত ঘুমোতে পারে নি লাবু। বিনিদ্র চোখে নদীর পারের দিকে চেয়ে বসেছিল। কতবার খেয়া এপার-ওপার যাতায়াত করেছে তিতু আসে নি।

কিশোরী পিসি বলল, তোর ভাই বোধহয় তোকে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

কি করে জানলে তুমি?

পথে আসবার সময় আমাকে বলেছিল, পিসি মায়ের জন্যে মন কেমন করছে।

আমি ধমক দিলাম, তুই বড় হয়েছিস না?

তিতু বলে, এতখানি বড় হয়েছি কোনদিন মাকে ছেড়ে থাকিনি –পিসি! তিতুর চোখ ছলছল করছিল, আমি বোধহয় তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। দিদিকে তো পার করে দিয়ে গেলাম। এখন তোমরা দেখো।

কিশোরীপিসি একটু থেমে বলে, আমার মনেহয় ও বোধহয় বাড়ি ফিরে গেছে তোর বাবা আর মাকে আনতে।

তা' হলে? অ-বাক প্রশ্ন করে লাবু।

তুই এখন আমাদের সঙ্গে চল লাবু—

তারপর?

তারপর কি আমরাই জানি নাকি?

মা-বাবা-ভাই! লাবুর মুখে কথা সরে না।

কিশোরীপিসি সান্ত্বনা দিয়েছিল, এসে পড়বে। সবাই এসে পড়বে। আর আমরাও খবর পেয়ে যাব। বর্ডারে এত লোক চলাচল করছে খবর ঠিক পৌঁছে যাবে।

বিধবা-বুড়ি তাকে আশ্বাস দিয়ে নিজের ভাইয়ের বাড়ি নিয়ে গেছিল।

ভাই বরদাকান্ত বড় গরীব। মুদিখানার দোকান তার। বিক্রি যত ধার তার থেকে বেশি। লোক ভাল। খুশি মনে লাবুর অস্থায়ী দায়িত্ব নিয়েছিল!

কিছুদিন বাদে লাবুর মনে হল অযথা বেচাবার ঘাড়ে ভার চাপাচ্ছে। নিজের হাত-পা আছে খেটে খেতে পারে। বাড়িতেও তাকে কাজ করেই খেতে হয়।

তারপর এই যোগাযোগ।

কিশোরীপিসির ভাই বরদাকান্ত এই যোগাযোগ করে দিয়ে বলল, তুমি কি পারবে অত কাজ করতে? রোগীর শুশ্রূষা করতে হবে—রান্না-বান্না করতে হবে—সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে—

খুব পারব।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন লাবুর চোখের উপর হাত রাখে। ও

কে! চমকে ওঠে লাবু।

হাত সরিয়ে হাসে সুশান্ত।

সারাদিন কোথায় ছিলে?

খুঁজতে বেরিয়ে ছিলাম।

কী?

আমার আগের জন্মের বাড়ি। বাবা—

অবাক হয়ে লাবু বলে, পেলে?

না। মেলাতে পারলাম না। শুধু গাঁয়ের পাশে-পাশে ঘুরে সংসারের সুখ-দুঃখ দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছি। তারপর সোজা তোমার কাছে চলে এলাম। মনও তাই চাইছিল।

তোমার হাত ধরব অস্থির?

কেন?

এমনি—ইচ্ছে করছে তাই—

হাত বাড়িয়ে দিল সুশান্ত, ধর—

সুশান্তর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয় লাবু।

বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে থাকে দু'জনে।

পাতার নরম সুবাস অথির একটা গন্ধের সঙ্গে মিশে ছটফট করে মরছে। চাঁদ প্রায় ডুবে গেছে। তবু অন্ধকার হয়নি।

এ্যাটলাণ্টা?

কি?

না, কিছু না।

তবে যে ডাকলে?

এমনি।

মনে হল কিছু বলবে।

খুঁজে পাচ্ছিনা কি বলি! অসহায় হয়ে ওঠে সুশান্তর গলা।

ঘরে চল—সারারাত বাইরে কাটাবে নাকি?

সুশান্ত তার চকচকে চোখদুটো লাবুর মুখের উপর ধরে। দুর্বোধ্য এক মনের ছায়া সেই মুখে। একটু পরে সুশান্ত নিজেই বলে, চল—

লাবু বলে, একি তুমি উপরে যাচ্ছ যে—খাবে না?

দাঁড়িয়ে যায় সুশান্ত। নিজের মনে কি যেন ভাবছিল সে।

বাগানের কোণ থেকে লিচুফুলের গন্ধ আসে।

হঠাৎ বিশ্রি একটা ডাক শুনে চমকে ওঠে লাবু।

সুশান্ত মুখ তুলে তাকায়। সেই পাখিটা এসেছে। মনেহল পাখিটা সুদূর কোন নক্ষত্র থেকে সাদা-পালের নৌকো ভাসিয়ে নেমে এল। অন্ধকারটা যেন জলছবি হয়ে ওঠে।

সুশান্ত লাফ দিয়ে বাগানের ভিতর নেমে যায়। পাখিটা উড়ছে। গাছপালার উপরে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে। সাদা ডানাদুটো কখনো বাতাস কাটছে। কখনো স্থির হয়ে ভেসে থাকছে।

কী চাও? সুশান্ত বিড়বিড় করে, কী চাও! পাগলের মতো পাখিটার পিছনে দৌড়ে বেড়ায় সে।

লাবু এগিয়ে গিয়ে সুশান্তকে পিছন থেকে ধরে ফেলে, দৌড়াচ্ছ কেন অস্থির?

ও হয়তো আমার জন্যে কোন খবর নিয়ে এসেছে—

কিসের খবর? অবাক হয় লাবু!

তা জানিনে। হতাশ হয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে সুশান্ত।

পাখিটা বাড়ির উপর কয়েকবার ঘুরে মাঠের দিকে উড়ে গেল।

অস্থির? সুশান্তকে দু'হাতের মধ্যে টেনে নেয় লাবু।

কী?

তুমি যার জন্যে ঘুরে মরছ কেউ বোধহয় তোমাকে তা দিতে পারে।

কে সে—জান তুমি?

বোধহয় জানি।

কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না এ্যাটলাণ্টা।

লাবু সুশান্তর মুখ তার মুখের কাছে টেনে নিল। সুশান্ত বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে অন্ধকারে। তার চোখদু'টো ছোটছেলের ভয়-পাওয়া চোখের মতো জড়সড় হয়ে থাকে।

অস্থির ?

কী বল—

লাবু তার নিজের ঠোঁট সুশান্তর ঠোঁটের উপর চেপে ধরে। সুশান্তর চোখে অন্ধকার হিজিবিজি হয়ে যায়।

সুশান্ত ফিসফিস করে, পাগল হয়ে যাব—আমি পাগল হয়ে যাব। আমাকে ছেড়ে দাও এ্যাটলাণ্টা—

লাবু কথা বলে না। সুশান্তর শরীর লাবুর গায়ের উপর ভেঙে পড়ে। সুশান্তকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে লাবু। কিছু দেখতে পায় না সুশান্ত। লাবুর চুলে তার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। চুলের বাসি-গন্ধ নিঃশ্বাস আবিল করে তুলেছে।

তারা-ভরা আকাশের তলায় দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাতাস তাদের শরীরের উপর দিয়ে দাপাদাপি করে ছুটে বেড়ায়। বাগানের সমস্ত ফুল আর পাতা তাদের সৌরভের নির্যাস বাতাসের ঝাপিতে ভরে তাদের নিরাভরণ শরীরের উপর ঢেলে দিল।

শিথিল হয়ে গেছে লাবুর বসন। শরীরী ইভ যেন স্বর্গের বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে তন্ন তন্ন করে দেখছে সুশান্ত। সেও বুঝি সৃষ্টির আদি মানব।

মালতিপুরে গৌরমোহন সান্যালের বাড়িটা এখন অন্ধকারে ডুবে আছে।

সুশান্ত বলে, তোমার হাত দাও—

লাবু হাত বাড়িয়ে দিল।

সুশান্ত তার হাতটা নিজের শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরে বলে, এসো আমার সঙ্গে—

আজ আর বাধা দিতে পারে না লাবু। তবু বলে, কোথায় যাব?

মঁহুদিবেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল দু'জনে।

সুশান্ত এতক্ষণে লাবুর কোমর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে। কখনো-সখনো লাবুর বুকের উত্তাপ অনুভব হচ্ছে।

মরা চাঁদের আলোয় দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখে। অপলক বিস্ময় চোখে-চোখে। লজ্জা নেই।

সুশান্ত ক্রমশ গাছপালার ভিতরে এগিয়ে গেল লাবুকে নিয়ে। গাছের ডাল পাতার আঙুল দিয়ে আদর বুলিয়ে দিচ্ছে বুঝি লাবুর গায়।

যেখানে লিচুগাছের তলায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে সুশান্ত লাবুর উদ্ধত বুকের চুড়োয় মুখ রেখে ঘ্রাণ নেয়। পৃথিবীর কচিঘাসের গন্ধ জড়িয়ে আছে তাতে। সেই অনাঘ্রাত গন্ধের স্বাদ তার রক্তে খরস্রোতের টান এনেছে। সব ইচ্ছে তাতে ডুবে মরতে চায়!

লাবু কাঁপছিল। সুশান্তর গায়ের উপর এলিয়ে পড়ে সে, আমি আমি আর পারছি না অস্থির। থরথর করে তার শরীর।

লাবুকে আর বোঝা যায় না। পাতার অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলেছে!

গায়ের উপর অসংখ্য লিচুফুল ঝরে পড়ছে।

বেপরোয়া এক স্পেনীশ নাবিকের মতো সুশান্ত উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দিল পাল তুলে।

সমুদ্রের ঢেউ পিছিয়ে এসে আবার আছড়ে পড়ছে তীরের উপর।

দু-একটা অস্ফুট শব্দের গাঙচিল বাতাসে ভর দিয়ে নৈঃশব্দ্যের আধডোবা পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে বসছে।

পাতার ফাঁক দিয়ে তারারা উঁকি দিচ্ছে। অনবদ্য কৌতুক

তাদের মুখে। আর কোন সাড়া নেই। এখন নির্জনতা রূপসী রাজকন্যার মতো পালঙ্কে শুয়ে বিনিদ্র প্রহর জাগছে।

অনেকক্ষণ বাদে উঠল লাবু। আবছা ঘামে ভিজে গেছে সে।

অস্থির উঠবে না ? রাত বোধহয় ভোর হয়ে গেল—

তুমি যাও। নির্জীব দুটো শব্দ সুশান্তর ঠোঁটে মরে রইল।

পরদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে গৌরমোহন অবাক। লিচুগাছের তলায় সুশান্ত ঘুমোচ্ছে। থমকে গেলেন গৌরমোহন, দাদুভাই কি ব্যাপার তোমার ?

জেগে উঠে সুশান্ত অপ্রতিভ।

গৌরমোহন সুশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সুশান্ত চোখ মুছে বলে, অনেক রাতে ফিরে দেখি সদর বন্ধ। তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছিলে—ডেকে কারো সাড়া পেলাম না।

গৌরমোহন বলেন, আমার তো কাল সারারাত ঘুম আসে নি। কোন ডাক আমি শুনতে পাইনি।

কী জানি কেন শুনতে পেলে না! সুশান্ত উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

গৌরমোহন সুশান্তর পথের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে মাথা নাড়েন। লিচুতলা থেকে বেরিয়ে তিনি কুয়াসায় পথ হারিয়ে গেটের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলেন, ষ্টেশনে বেড়াতে যাবেন কিনা—তারপর গুটিগুটি পা বাড়িয়ে বাড়ির দিকে ফিরলেন। হৈমবতীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে তাকে অস্থির করে তুলেছিল। সিঁড়িতে ওঠবার সময় লাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন, আমার চা আজ হৈমর ঘরে দিও।

আচ্ছা দাদু।

গৌরমোহনের কাছে সব শুনে হৈমবতী বলে, কি করি বল তো বাবা ওকে নিয়ে ?

কি বলব বল।

ওর কথা যত ভাবি তত ভাবনা আসে। এত আশা ছিল ছেলেটাকে নিয়ে—

তুই অসুস্থ হয়ে যত গণ্ডগোল।

তাই তো দেখছি। আমি পড়ে গিয়ে হয়েছে মুসকিল---কারো কথা শুনছে না। যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াচ্ছে। তুমি একটা বিহিত কর বাবা—

কি করা যায় বুঝে উঠতে পারছি না হৈম।

আমার মনে হচ্ছে একটা কিছুতে লাগিয়ে দিতে না পারলে ওর উদ্ভট স্বভাব কিছুতে যাবে না।

তেমন সুবিধে এখানে হবে বলেও তো মনে হয় না হৈম।

ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে বিষম এক যন্ত্রণা। মনে-মনে অস্থির হয়ে ওঠে হৈমবতী।

একটু ইতস্তত করে গৌরমোহন বলেন, ওকে নিয়ে এখানে আশা করবার কিছু আর নেই—

লাবু চা দিয়ে গেল।

গৌরমোহন চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, তুই কি মনে করিস জানি না হৈম ও একেবারে সৃষ্টি ছাড়া!

চা শেষ করে গৌরমোহন দরজার কাছে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এতদিনেও সতুর চিঠি এল না—চিঠিটা এলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যেত—

ধরা গলায় হৈমবতী জবাব দেয়, কী জানি—

গৌরমোহন আর কোন কথা না বলে নিচে নেমে গেলেন। সিঁড়িতে গৌরমোহনের পায়ের শব্দে হৈমবতীর কান্না আসে। বাবা এখনো সতুদার চিঠির জন্যে বসে আছেন। সেকেন্দ্রারাওয়ের মতো সতুদার চিঠিও অলীক হয়ে রইল। সে চিঠি কোনদিন আর এসে পৌঁছবে না। অথচ বুড়ো মানুষ শরীরে কুলোয় না তবু সেই চিঠির

জন্যে নিত্যদিন পোস্টাফিসে গিয়ে হাজির হন। না পারলে সুশান্তকে ধরেন।

হৈমবতীর ইচ্ছে করে গৌরমোহনকে বলে দেয়, সতুদার চিঠি আর আসবে না বাবা। মায়া লাগে। পারে না। গৌরমোহনের ভাবনায় আশা করবার কিছু নেই আর। এ বয়েসে তার ভবিষ্যতের সবটুকু অতীত হয়ে গেছে। মেয়ে আর নাতির ভবিষ্যৎ নিয়েই তাব ভাবনা। সেই ভাবনা ভবিষ্যতে তাকিয়ে আলো পায় না। অন্ধকার। সব অন্ধকার। তাই হয়তো হারিয়ে যাওয়া অতীতের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকেন। সেইদিকে আশ্রয়ের জন্যে হাত বাড়ান। সেই আশার ইশারা নিয়ে আসবে সতুদার চিঠি—সেই আশায় হেমন্তের পাতা-ঝরা ভূখণ্ড উজ্জ্বল সেকেন্দ্রারাও হয়ে আছে! সেই মিথ্যে ছলনাটুকু সরিয়ে তাকে নিরাশ করতে মায়া লাগে হৈমবতীর।

গৌরমোহনের দোষ কি—হৈমবতী নিজেও অমনি এক আশার উপর ভর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিল। অহরহ এক মিথ্যে প্রত্যাশা তার দিন-রাত্রি ঘিরে ছিল। তার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও তাকে আনমনা করে রেখেছে।

তার মন কতবার বলেছে, সুরপতি আর ফিরবে না। তবুও সেই আশাকে ঝেড়ে-মুছে মনের শেল্ফে বছরের পর বছর সাজিয়ে রেখেছে।

বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসে হৈমবতী, লাবু ও-লাবু—

লাবু নিচে থেকে সাড়া দিল, যাই মাসিমা—

একবার উপরে আয় তো—

একটু পরে লাবু হৈমবতীর সামনে এসে দাঁড়ায়, কি মাসিমা?

ছাখ তো খোকা কোথায়?

দেখছি। সুশান্তর ঘরের সামনে থেকে ফিরে এসে লাবু বলে, ঘুমোচ্ছে।

এখনো ঘুমোচ্ছে! আশ্চর্য হল হৈমবতী, সারাদিন ও কি করে লাবু?

সারাদিনে খাওয়ার সময় ছাড়া ওকে তো দেখতেই পাই না।
ঘুম থেকে উঠলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস তো—

নিজের মনে কথা বলে হৈমবতী, আমি অসুস্থ বলে কি ভেবেছে ও!

হৈমবতী দুপুরে ঘুম থেকে উঠে দেখে লাবু তার ঘর গোছাচ্ছে। বসে-বসে দেখে হৈমবতী। কাজের নিপুণতা আছে। ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে ঝাট দিয়ে বাগান থেকে একগোছা ফুল এনে ফুলদানিতে রেখে হৈমবতীর দিকে তাকিয়ে লাবু বলে, আমি নিচে যাচ্ছি মাসিমা—কিছু লাগবে?

হৈমবতী সে কথায় কান না-দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, খোকা চা খেয়েছে?

ও বোধহয় ঘুমুচ্ছে মাসিমা।

বলেছিলি, আমি ডেকেছি?

বলেছিলাম। খাবার সময় বলেছিলাম।

কি বলল খোকা?

ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরে হৈমবতীর দিকে তাকায় লাবু। কিছু ভাবে বোধহয়।

কি বলল? আবার জিজ্ঞাসা করে হৈমবতী।

পরে দেখা করবে।

পরে কেন?

কি জানি কেন! আমাকে তো তাই বলল।

উঠে বসে হৈমবতী বলে, ছাখ তো খোকা ঘরে আছে কি না! লাবু খরপায় সুশান্তর ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। ঠেলে বোঝা গেল ভিতর থেকে বন্ধ।

একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে লাবু এসে খবর দেয়, দরজা বন্ধ।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে হৈমবতী, এখনি শাসন করা দরকার।

লাবু বলে, আমি যাব মাসিমা!

ছেলের ভাবনা থেকে মুখ তুলে হৈমবতী বলে, আমাকে একটু পরে আরেকবার চা দিয়ে যাস লাবু। সন্ধের পরে দিস।

আচ্ছা।

রান্নার কাজ খানিকটা সেরে লাবু চা নিয়ে আসে, মাসিমা চা এনেছি—

দে। এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল হৈমবতী। হাত বাড়িয়ে চা নিল!

মাসিমা বিস্কুট দেব?

না। বিস্কুট দিতে হবে না।

তুমি তো আজকাল কিছু খাচ্ছ না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে হৈমবতী বলে, আলোটা নিভিয়ে দে তো লাবু।

হৈমবতীর ঘরে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আড়ালে সুশান্তর ঘরে হাজির হল সে। দরজা খোলা। অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছে সুশান্ত।

এখনো ঘুমোচ্ছ? লাবুর ফিসফিসে গলা বাতাসে কেঁপে ওঠে।

কে এ্যাটলাণ্টা? কখন ঘুম ভেঙে গেছে! তুমি আবার এলে কেন—মা যদি দেখে ফেলে!

কি আর হবে! লাবু উত্তর দেয়, তাড়িয়ে দেবে। সেই জন্যেই তো আমার ইচ্ছে করে তোমার মায়ের চোখের সামনে থেকে তোমাকে আর কোথাও নিয়ে যাই—

কোথায় নিয়ে যাবে?

সে কি আমি জানি না চিনি!

মাকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না এ্যাটলাণ্টা।

কেন?

আমার মায়ের যে কেউ নেই!

আমার কে আছে ?

এক্ষুনি উত্তর দিতে পারছি না। সুশান্ত মিনমিন করে।

গাঢ় অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

আলোটা জ্বেলে দেব অস্থির ?

ন্-না না! সুশান্ত বাধা দেয়, আলো জ্বেল না।

লাবু বলে, আমি যাচ্ছি- -

এই। সুশান্ত ডাক দেয়

কি ? সাড়া দেয় লাবু।

আমার কাছে একটু বোস না।

লাবু সুশান্তর কাছে বসলে তার চুলে হাত রেখে সুশান্ত বলে, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে বলছিলে ?

এখনই বলি কি করে। তবে তুমি না গেলে আমাকে তো চলে যেতেই হবে। আমি কি চিরকাল থাকব নাকি তোমাদের বাড়িতে—

তা হলে ?

আমাকে তো যেতেই হবে।

সুশান্ত বলে, মা আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি রোজই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে চাই। পারি নে। সন্ধে হলে মায়ের ভালবাসা আমাকে এই বাড়িতে টেনে নিয়ে আসে। তুমি ছিঁড়ে দিতে পার ?

পারি বোধহয়।

এ বাড়ির কিছু আমি সঙ্গে নেব না। শুধু আমার ছোটবেলার মাউথ-অর্গানটা নেব।

আমি যাচ্ছি এখন। লাবু ছটফট করে, দেরি করলে দুঃ ধরে যাবে—

এ্যাটলাণ্টা কয়েকটা দিন সময় দিতে পার ?

কিসের জন্যে ?

যেদিন নীললিলি ফুটবে সেইদিনই চলে যাব। শুধু একব জ্যোৎস্না রাতে অন্ধকার আকাশের তলায় নীললিলিকে দেখে চ

যাব। সুশান্ত সামনে তাকিয়ে দেখে লাবু নেই। কখন যেন চলে গেছে। উঠে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর একটু এগিয়ে হৈমবতীর ঘরের সামনে যায়।

পায়ের শব্দে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, কে রে-খোকা নাকি?

হ্যাঁ মা আমি।

হ্যাঁরে খোকা কি ভেবেছিস তুই?

সুশান্ত শান্ত গলায় উত্তর দেয়, কিছু ভাবিনি তো আমি।

এসব কিন্তু ভালো নয়।

কি মা?

এই যে তুমি নিজের ইচ্ছে মতো যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াচ্ছ।

কিছু করি নি তো মা।

সারাদিনে মাকে একবার তোর দেখবারও সময় হয় না! এত কি কাজ তোর শুনি?

কি জানি। অস্ফুট উত্তর দেয় সুশান্ত।

তোদের খাওয়াতে গিয়ে আমার হাড়-মাস কালি হল। অসুখে পড়লাম। আর সারাদিনে একবার চোখের দেখাটাও দেখতে আসিস না! কি করে যে আমার দিন কাটে আমিই জানি! চোখের সামনে অতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল মুখ ফুটে একটু কাঁদতেও পারলাম না। আর তুই—একটু দয়ামায়া নেই তোর। একদণ্ড মায়ের কাছে বসতেও পারিস না! একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকে হৈমবতী।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সুশান্ত। একটু পরে বলে, মা আমি চা খেতে যাচ্ছি—সুশান্ত রেলিংয়ে হাত রেখে অন্যমনস্ক ভাবে নিচে নামতে থাকে। মনে হয় হৈমবতীর অনুযোগ তাকে দোলা দিয়েছে।

খোকা অ-খোকা শোন বলছি।

পরে শুনব মা।

সুশান্তর পাশ দিয়ে উপরে উঠে এল লাবু, মাসিমা আরেকবার চা দিতে বলেছিলে—দেব এখন ?

লাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে হৈমবতী। তারপর চোখ নামিয়ে বলে, না।

সুশান্ত নিচে থেকে চেঁচাতে থাকে, আমার চা কোথায়—আমার চা—

যাও, নিচে গিয়ে খোকাকে চা দাও—

গুম হয়ে বসে থাকে হৈমবতী। রাতে গৌরমোহন উপরে এলে হৈমবতী জিজ্ঞাসা করে, বাবা তোমার চিঠি এল ?

হতাশ হয়ে গৌরমোহন উত্তর দেন, না।

আমি ভাবছি—

তুই আবার কি ভাবছিস ? গৌরমোহনের চোখ দু'টো হৈমবতীর মুখের উপর নিশ্চল হয়ে থাকে।

ভাবছি, একটু দম নেয় হৈমবতী, চিঠি আসুক না-আসুক চল তুমি আর আমি সেকেন্দ্রারাও চলে যাই—

তোর এই শরীরে !

আমি তো এখন সুস্থ হয়ে গেছি—

বিষণ্ণ একটু হাসি গৌরমোহনের মুখে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ঘর-বাড়ি ?

কেন, খোকা দেখবে।

ওই পাগল ছেলের উপর ভার দিয়ে যেতে চাস ?

কি আর করব বল ! সারাজীবন তো পরের দিকে তাকালাম—নিজের দিকে একটু না-হয় তাকাই এখন। খোকা তো তার নিজের ইচ্ছে মতো চলছে। যা খুশি তাই করছে। পরে কি করবে কে জানে ! এমন ছেলের পর তো ভরসা রাখতে পারি না বাবা—

হৈমবতীর রকম-সকম বুঝতে পারেন না গৌরমোহন। পরে বলেন, তুই আগে সুস্থ হয়ে ওঠ তারপর যা হয় ভাবা যাবে—

চা খেয়ে উঠে এল সুশান্ত। মায়ের ঘরে দরজায় দাঁড়িয়ে আড়চোখে গৌরমোহন আর হৈমবতীকে দেখে নিজের ঘরে চলে গেল।

গৌরমোহন আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠলেন।

বাবা, যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ রে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও—

অন্ধকার ঘরে একলা বসে হৈমবতী সুশান্তর কথা ভাবে। মনে-মনে তার অভিমান আরো গভীর হয়। হঠাৎ নিজেকেই যেন বলে, ও যদি নিজের মতো থাকতে চায় তো তাই থাক।

নিজের ঘরের জানালায় এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে সুশান্ত। ঘুম আসে না। ইচ্ছে করছে লাবুকে গিয়ে ডাকে। মায়ের ঘরের আলো না-নিভলে বেরুতে পারে না। অধৈর্য রাত অনেকখানি পার করে তবে হৈমবতীর ঘরের আলো নেভে।

সুশান্ত আর দেরি করে না। নিঃশব্দে সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাবুর ঘরের দরজায় হাজির হয়। ভেবেছিল খোলা থাকবে। অবাক হয়ে দেখে দরজা বন্ধ। সদর পার হয়ে লাবুর জানালার কাছে গিয়ে বলে, দরজা বন্ধ কেন খোল না একবার—

লাবু সাড়া দিল না।

সুশান্ত আবার ডাকে, দরজা খোল—দরজা খোল এ্যাটলাণ্টা! —ঘুম আসছে না কিছুতে—তোমার কাছে একটু বসব।

লাবু এবারও কোন সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে অধৈর্য হয়ে সুশান্ত তারের বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। মালতিপুরের মাঠ আজকে যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথায় যাবে ঠাহর করতে পারে না সুশান্ত। তবু অকারণে এলোমেলো ভাবে ঘুরে আবার ফিরে আসে। দেখে, দরজার সামনে লাবু দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার ঘুম ভেঙে গেল নাকি লাবু? সুশান্তর গলার স্বর কেমন যেন বেসুরো।

তোমার জন্যে ঘুমোবার উপায় আছে নাকি!

লাবুর হাত ধরে টানে সুশান্ত, চল না একটু পুকুরের ধারে গিয়ে বসি—

এত রাতে!

বিশ্বাস কর, এত কথা জমে আছে তোমাকে না বলে শান্তি পাচ্ছি না।

হাই তোলে লাবু, আমার ঘুম আসছে অস্থির—কাল ব'লো—

কাল তো আমি নাও থাকতে পারি?

যাবে কোথায়?

সে কথা কেউ বলতে পারে নাকি!

মাসিমা কিন্তু তোমার উপর রেগে গেছে অস্থির।

মা? ফিস ফিস করে সুশান্ত, তা রাগ করতে পারে। তার ছেলেটাকে তুমি পর করে দিচ্ছ—দিচ্ছ না?

কি জানি। অনেক রাত হয়ে গেছে অস্থির। এখন ঘুমোতে যাও—

তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?

একটুও না। অনেক বড় ভয় পার হয়ে তোমার কাছে আসতে পেরেছি—

তা' হলে—

আজ থাক। নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল লাবু।

সুশান্তর মনের মধ্যে কি রকম একটা জ্বালা ফসফরাসের মতো জ্বলে ওঠে। সে ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করে, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?

না।

যাবে না? সুশান্তর গলা যেন হঠাৎ ধারাল হয়ে ওঠে।

যে হিংস্র জন্তুটা মাঝে-মাঝে সুশান্তর মনে দেখা দেয় সে বোধহয় গভীর অবচেতন থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে, চল বলছি। লাবুর হাত চেপে ধরে সে।

লাবুও ফুঁসে ওঠে, হাত ছাড় বলছি—আঃ, ভেঙে ফেলবে নাকি?

লাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত বলে, জোর করছিলে তাই। জোর একদম সইতে পারি না। অন্ধকারেও সুশান্তর চোখ দু'টো ধক্‌ধক্ করে জ্বলে। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে সরে গেল সে।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে লাবু। ভয় করে তার। এ যেন অন্য সুশান্ত।

সুশান্তর ছায়া বেড়া ডিঙিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকা মাঠের বুকের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কোথায় হারিয়ে গেল!

তার লম্বাটে অলৌকিক ছায়া-ছায়া শরীরটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাবু। দাঁড়িয়ে ভাবে, রাত্রির অন্ধকারে একলা কি খুঁজে বেড়ায় সুশান্ত? মালতিপুরের মাঠে কোন গুপ্তধনের নেশা সুশান্তকে ঘুমভাঙা হাতছানি দিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায়।

ঘরের দিকে ফিরতে গিয়ে লাবু ভাবে, কাল মাসিমাকে বলতে হবে তোমার ছেলের কি যেন হয়েছে!

পরদিন দুপুরের পর গৌরমোহন হৈমবতীর ঘরে এসে হাজির, হৈম জেগে আছিস নাকি?

বই পড়ছিল হৈমবতী। বলল, ঘুমোই নি বাবা।

দুপুরে ঘুমোলে শরীর বড্ড খারাপ হয়।

হাসে হৈমবতী, তাই বুঝি তুমি রোজ দুপুরে ঘুমোও?

বুড়োমানুষের আবার ভালো মন্দ কি!

অত ঘুমোলে সবারই শরীর খারাপ হয়। ইদানীং দেখছি তোমার ঘুম যেন বেড়েই যাচ্ছে। আমি যখনই বলি, ও লাবু দাদুকে একটু

ডেকে দে তো—। লাবু নিচে থেকে উত্তর দেয়, দাদু তো এখন ঘুমোচ্ছে—

আমি বলি, বলিস কি—এই তো ঘুম থেকে উঠল।

গৌরমোহন উত্তর দিতে পারেন না। বলেন, অই রাতে তো তেমন ঘুম-টুম হয় না তাই সকালের দিকে একটু ঝিম আসে। বয়েস হোক দেখবি তোরও ওমনি হবে। যাক গে—এই চিঠিটা পড়। হৈমবতীর দিকে চিঠি এগিয়ে দিয়ে গৌরমোহন বলেন, সতুর উত্তর না পেয়ে দড়্‌গড়্‌জীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। উত্তর দিয়েছেন। পড়ে ছাখ একবার—

চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে থাকে হৈমবতী।

গৌরমোহন হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

চিঠিটা পড়ে গৌরমোহনের হাতে ফিরিয়ে দেয় হৈমবতী।

তুই কি বলিস হৈম? হৈমবতীর দিকে আগ্রহে ঝুকে পড়েন গৌরমোহন।

আমি কি বলব বাবা।

উৎসাহে সোজা হয়ে বসেন গৌরমোহন, তুই বলবি নে তো কে বলবে শুনি? একটা কিছু তো লিখতে হবে? সতুর অবশ্য কোন খবর নেই। সে বহুকাল সেকেন্দ্রারাও যায় নি। যা হোক দড়্‌গড়্‌জী তো লিখেছেন, দাদুর চাকরির অভাব হবে না। সেকেন্দ্রারাও মেয়ে স্কুলে তোরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুই বললেই আমি একটা উত্তর লিখে দি। কবে নাগাদ গিয়ে পৌঁছতে পারব সেটাও লিখে দেবখন।

আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। একটু ভেবে দেখি।

এর মধ্যে আর ভাববার কি আছে?

হৈমবতী মৃদুস্বরে বলে, ভাববার অনেক কিছু আছে বাবা। এত আশা করে গিয়ে কিছু যদি না-হয় তবে কোথায় দাঁড়াব সেটা ভেবে দেখতে হবে না?

মাথা নাড়েন গৌরমোহন, তা' বটে—

তুমি কি বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাও ?

এখনি করা বোধহয় ঠিক হবে না। ওখানে গিয়ে বুঝে-শুনে তারপরে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। সেকেন্দ্রারাও যাবার কথায় তার মন যেন হঠাৎ উতলা হয়ে ওঠে। মনে হয় পরবাস থেকে যেন ফিরে যাবার ডাক এসেছে। মনে-মনে অশ্রুত সেই ডাক শব্দের নূপুর বাজিয়ে যায়।

গৌরমোহন বলেন, ইচ্ছে করে আরেকবার মথুরা-বৃন্দাবনে যাই। এ্যাদ্দুর থেকে তো যাওয়া সম্ভব নয়। সেকেন্দ্রারাও গেলে একবার যাব। হাতরাশ ধর্মশালায় থাকব দিনকয়েক। তোর মা আর আমি সেই কতকাল আগে একবার মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরে এসেছিলাম। দ্বারকানাথের মন্দিরের কাছে একটা মেঠাইয়ের দোকানে খর্চনা পেড়া দেখে তোর মা অবাক। আমায় বলল, হ্যাঁগা পরেতের পরে সাদা ফিতের মতো ঢেলে রাখা ওগুলো কি ?

আমি বললাম, পেড়া—খাবে নাকি ?

প্যাঁড়া আবার অমনি হয় নাকি !

দুধের সর শুকিয়ে ফিতের মতো করে কেটে অমনি সাজিয়ে রেখেছে। বললে, ওরা তৈরি করে দেবে। বলব ?

বলতো দেখি—। তোর মায়ের মুখে লজ্জা-লজ্জা ভাব।

দোকানদারকে বললাম, 'ঢাই শ' খর্চনা পেড়া।

সাদা ফিতের মতো দুধের সর ওজন করে একটা পিতলের পাত্রে ঢেলে গাজিয়াবাদের গোলাপজল আর সফেদ চিনি মেখে দিল। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গেলেন গৌরমোহন, খুব ভালো লেগেছিল তোর মায়ের। সেকেন্দ্রারাও ফিরে কতবার বলেছে, ওদিকে গেলে আমায় খর্চনা প্যাঁড়া এনে দিও না ? কতবার গেছি। বলেও দিত তোর মা। মনে থাকত না। তোর মায়ের আরো অনেক ইচ্ছের

মতো এটাও মেটাতে পারি নি। শেষের দিকে গৌরমোহনের গলা একেবারে খাদে নেমে গেছিল।

হৈমবতী এতক্ষণ নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে গৌরমোহনের দিকে তাকাল, বাবা—

উঁ।

তোমার বোধহয় মনে আছে মায়ের অসুখের সময় একবার মথুরার হাসপাতালে ছিল। মাকে দেখবার জন্যে আমাকে কাত্তরাশ ধর্মশালায় রেখে এসেছিলে। ম্যানেজার মুখার্জীমশাই আমার দেখাশোনা করতেন—

সপ্তাহে দু'দিন করে যেতাম আমি। খুব মনে আছে আমার।

সেই সময় একদিন মাকে সকালে দেখে আসছি। মা আমাকে ডেকে বলল, হৈম তোর কাছে পয়সা আছে?

মাথা নাড়লাম আমি, আছে।

আমার খর্চনা প্যাঁড়া খেতে ইচ্ছে করছে রে—পারবি এনে দিতে?

ডাক্তাররা যদি বকে?

মা বলল, ঈস্ জানতে পারলে তো—তুই আমাকে লুকিয়ে এনে দিবি—পারবি না?

খুব পারব। আমি উত্তর দিলাম, বিকেলে আসবার সময় নিয়ে আসবখন—

উঁ-হুঁ, আমার খেতে ইচ্ছে করছে এখন আর তুই আনবি বিকেলে! যা, দৌড়ে যাবি আর আসবি—একটু থেমে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। তারপর হেসে বলে, এনে দিয়েছিলাম—

আমাকে তো বলিস নি কোন দিন!

মা যে কাউকে বলতে নিষেধ করে দিয়েছিল। তারপর আর মনেই ছিল না। তুমি আজ বললে, তাই মনে পড়ল।

ভালো ভালো। উঠে দাঁড়িয়ে গৌরমোহন বলেন, শুনে ভারি আনন্দ হল হৈম।

নিচে যাচ্ছ নাকি বাবা ?

বসিগে একটু—লাবু আবার একলা আছে।

গৌরমোহন চলে যাবার পর পালঙ্কের বাজুতে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। চোখের সামনে শীতের সূর্যাস্ত হঠাৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

মাসখানেকের বেশি হৈমবতী বিছানায় শুয়ে। কি মনে হল খাট থেকে নেমে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। শরীরে কোন দুর্বলতা নেই। বেশ ঝরঝরে মনে হয় নিজেকে।

জানালার কাছ থেকে সরে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় হৈমবতী। সিঁড়ির কাছে গিয়ে লাবুকে ডাক দেয়, লাবু আজ আমাকে বিকেলের চা দিতে ভুলে গেলি নাকি !

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে লাবু, তাই তো মাসিমা—একেবারে ভুল হয়ে গেছে ! এখন এনে দেব ? সিঁড়ির কাছে হৈমবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাবু অবাক হয়ে যায়, মাসিমা তুমি উঠেছ ?

কতদিন আর শুয়ে থাকব বল ?

ডাক্তারের যে নিষেধ আছে—

ডাক্তাররা তো যা খুশি তাই বলে। ওদের কথা শুনতে গেলে সারা জীবন আমাকে শুয়ে থাকতে হবে। তুই বরং আমাকে হালকা লিকারের চা এনে দে—

লাবু তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থেকে বলে, মাসিমা তোমাকে উঠতে দেখে কিযে আনন্দ হচ্ছে কি বলব ! এসে অবধি তো তোমাকে শুয়ে থাকতেই দেখছি—যাই চা নিয়ে আসি—

ঘরে ফেরে হৈমবতী। খাটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে জানালার গায় গিয়ে দাঁড়ায়। মাঠের ওপর এলিয়ে থাকা রেললাইনের উপর চোখ পড়ে। মনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা সেই ভয়ংকর দিনের ঘটনা সাপের মতো নড়াচড়া করতে থাকে। জানালা থেকে ভয়

পেয়ে সরে আসে হৈমবতী। তার মনেহয় চোখের সামনে হয়তো সেই ঘটনাটা আবার ঘটে যাবে।

মাসিমা চা। লাবু চা এনে টেবিলে রাখে, তোমার হাতে দেব ?

পিছন ফিরে লাবুকে দেখে হৈমবতী বলে, টেবিলেই রাখ।

লাবু একটু দাঁড়িয়ে বলে, আর কিছু দেব—দু'একটা বিস্কুট ?

না।

লাবু কথা না-বলে নিচে নেমে এল। নিচে এখন কেউ নেই।

গৌরমোহন চা খেয়ে স্টেশনের দিকে বেড়াতে গেছেন।

এই ফাঁকে বিকেলের কাজে ফাঁকি দিয়ে লাবু সুশান্তর খোঁজে বের হল। সারাদিনে তার কোন পাত্তা নেই! গত রাতে সুশান্ত লাবুর দরজায় হানা দিয়ে গেছে। দরজা খোলে নি লাবু। জানালা থেকে কথা বলেছে, কি চাই তোমার ?

কিছু না। শুধু তোমার কাছে একটু বসব।

লাবু হেসেছে, কাল এস। অঢেল সময় দিতে পারব।

এ্যাটলাণ্টা প্লিজ, দরজাটা একটু খোল।

না। লাবু জানালা থেকে সরে এসেছে।

মাঝরাতেও সুশান্ত এসেছে। ডেকেছে। সাড়া পায়নি লাবুর।

লাবুর ইচ্ছে করেছিল সাড়া দেয়। বলে, কি বলছ বল—কিছু চাই নাকি -

সুশান্ত হয়তো উত্তর দিত, তোমাকে—তোমাকে—তোমাকে চাই!

বিরক্ত লাবু তাই আড়াল থেকে দেখেছে, সুশান্ত হিংস্র জন্তুর মতো ছটফট করতে-করতে একবার বাগানের ভিতর গেছে আবার বেরিয়ে এসেছে।

আজ সকালে উঠে দেখে সুশান্ত উধাও। হয়তো বিকেলে ফিরতে পারে। তাই খুঁজে দেখতে বেরিয়েছে।

তবে লাবু বুঝেছে এই সংসার-ছাড়া মানুষকে পোষ মানানো তার কাজ নয়। তার মা পারেনি। আর কেউ পারবে কিনা সন্দেহ।

সুশান্তকে দেখলে মায়া লাগে। এই অস্থির অনাত্মীয়কে আত্মার খুব কাছাকাছি পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, ভালোবেসে তার সব অসুখ নিরাময় করে। আবার ভয় করে। সে চেষ্টা করতে গেলে সুশান্তর মনের সংক্রামক অসুখগুলো যদি তাকে পেয়ে বসে!

বাগানের ভিতর থেকে একবার ঘুরে আসে লাবু। তারপর সিলভার ওকের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। গাছটা কুঁড়িতে ভরে গেছে। ডালপালার ভিতর দিয়ে চিরকালের এক-বয়সী সন্ধ্যাতারার মুখ দেখা যাচ্ছে।

সুশান্তকে এখন যদি পাওয়া যায় তো লাবু বলে, অস্থির তোমার জন্যে একটু সময় চুরি করে এনেছি।

দোতলার জানালায় হৈমবতীর গলা শোনা গেল, বাবা ফিরেছে লাবু?

না মাসিমা।

খোকা?

দেখছি নাতো কোথাও।

কোথায় যে সব যায়! জানালা থেকে সরে গেল হৈমবতী।

কয়েকদিন পরে গৌরমোহন আবার হৈমবতীর কাছে কথা পাড়লেন, কিছু ভাবলি হৈম?

কি ব্যাপারে বাবা?

সেই যে দড়্‌গড়্‌জীর চিঠিটার কথা তোকে বলেছিলাম? কিছু একটা উত্তর তো দিতে হবে যা হোক।

ভাবছি। আনমনা হয়ে উত্তর দেয় হৈমবতী। ভাবছি তো বাবা। ভেবে তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

এত ভাববার কি আছে বল দেখি হৈম! এমন করে এখানে কি বেঁচে থাকা যাবে হৈম? তোর ছেলেটাকে একটা চাকরিতে বসাতে না পারলে ও একেবারে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। তোর এই শরীরে

একলা আর টেনে উঠতে পারবি এমন তো মনে হয় না। আমি থাকতে-থাকতে তোদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে না-পারলে মরেও শান্তি পাব না। গৌরমোহন তার মনের সব কথাগুলো বলতে পেরে যেন স্বস্তি পান। এবার কিছু-একটা উত্তরের প্রত্যাশায় হৈমবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে হৈমবতী অস্পষ্ট উত্তর দেয়, দেখি—

দেরি হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। শীত কমে গেছে। যেতে এখন বিশেষ অসুবিধে হবে না।

বেশি আবার গরম পড়ে গেলে বুড়ো বয়সে সহ্য করা মুসকিল হবে!

আর একটু ভাবি বাবা। কাল-পরশু যা হোক একটা কিছু ঠিক করে ফেলব।

যা করবি তাড়াতাড়ি কর। সময় হয়েছে। সুযোগ হয়েছে। দেরি করলে আবার কোন বাধা এসে দাঁড়ায় কে জানে!

সারাদিন উন্মনা হয়ে থাকে হৈমবতী। অসহ্য এক ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। এর হাত থেকে মুক্তি নেই। হ্যাঁ কি না কিছু একটা বলতে হবে। অথচ কিযে বলবে বুঝে উঠতে পারে না! যে সেকেন্দ্রারাও হারিয়ে গেছে তাকে কি আর খুঁজে পাবে! সারা দিন সারারাত ভাবে। ভেবে আর কূল পায় না। চারদিকে অথৈ!

জানালার ফ্রেমে সূর্যাস্ত ছবি হল। আবার সেই ছবি অন্ধকারে মুছে গেল। বাতাসে পাতা-পত্তরের মরমরানি বেজেই চলেছে।

নিশ্চল হয়ে বসে থাকে হৈমবতী।

এর মধ্যে লাবু ওভালটিন নিয়ে উপরে আসে—রাত্রের খাবার দিয়ে যায়।

তবু হৈমবতী ওঠে না। বসে থেকে তার সময় কেটে যায়। একসময় রাত গভীর হয়। বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায়।

রান্নাঘরে দরজা পড়ে। গৌরমোহনের ঘরে দরজা দেবার শব্দ শোনা যায়।

লাবু উপরে এল, মাসিমা তোমার ছেলে এখনো ফেরেনি। দরজা কি খোলা রাখব ?

হৈমবতী বলল, খোলা রেখে আর কি হবে বন্ধ করে দে।

লাবু নেমে যাচ্ছিল! হৈমবতী ডাকল, এই লাবু তোকে কিছু বলে গেছে খোকা ?

সকালে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছ দিনরাত ?

বলল, আমার জন্মের আগের বাড়িটাকে খুঁজে বের করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছি। তাই দেখা পাচ্ছ না।

বাড়িটা পেলে নাকি ?

পাব বোধহয়।

আমি হেসে বললাম, খবরটা আমরা পাব তো ?

বলল, আমি হয়তো দিতে আসতে পারব না তবে মনে-মনে জানতে পারবে।

সব শুনে ভুরু-কুঁচকে হৈমবতী বলে, হুঁউ!

মাসিমা দরজাটা তা' হলে বন্ধ করে দি গে ?

সুশান্তর জন্যে কি রকম একটা ব্যথা বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে, না-রে লাবু দরজাটা খুলেই রাখ। পাগল ছেলে সারাদিন বাদে ফিরে যদি দরজা বন্ধ দেখে বড় কষ্ট পাবে। হয়তো সারা দিন কিছু খায় নি, রাতেও কিছু জুটবে না।

লাবু নিচে নেমে গেল।

মালতিপুরের সান্যাল বাড়ি এখন নিঃসাড়।

হৈমবতীর চোখে ঘুম নেই। রাতের বিনিদ্র প্রহর অত্যন্ত যন্ত্রণাতুর।

হঠাৎ নিচে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। হৈমবতী সজাগ হয়ে ওঠে। আশা করছিল শব্দটা উপরে উঠে আসবে। তার

দরজার সামনেও আসতে পারে। এমন কি কেউ তাকে মা বলে ডাকতেও পারে।

অন্ধকারে শব্দটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। হৈমবতীর মনে হল শোনার ভুল। হয়তো হাওয়ার ছলনা।

লাবু রোজ শুতে যাবার আগে আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধে। এ তার অনেকদিনের অভ্যাস। পরিপাটি করে চুল বেঁধে মনে হল সুশান্ত পাশে থাকলে হয়তো বলতো, ফুল এনে দেব বাগান থেকে?

কেন?

তোমার খোঁপায় দেবে বলে।

এরপর কি উত্তর দিত লাবু ভেবে উঠতে পারে না। বোধহয় বলত, দাওনা এনে দাও। হয়তো বলত, কি হবে ফুল দিয়ে? এখন তো শুয়ে পড়ব।

আয়নায় আরেকবার নিজের মুখ দেখে মুগ্ধ হয় লাবু। তারপর উঠে আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে মনে হল, আরে দরজাটা তো দেওয়া হয়নি! বিরক্তির সঙ্গে আবার উঠে বসে।

দরজা দিয়ে এলোমেলো শীত-শীত বাতাস আসে।

দরজার দিকে এগোতে গিয়ে দেখে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। চমকে ওঠে লাবু। ফিসফিসিয়ে বলে, কে—কে ওখানে?

আমি। সুশান্ত উদাস গলায় শব্দটা ছুঁড়ে দিল।

তুমি! অবাক হল লাবু, তুমি এত রাত্তিরে কোথা থেকে?

আপাতত মাঠ থেকে—।

সারাদিন কোথায় ছিলে?

জানি না।

না জান ভালো। রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। খেয়ে নাওগে।

সুশান্ত একথার কোন উত্তর দিল না। অন্ধকারে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

ভাবছি।

কি ?

কে যেন আমার কানে-কানে বলল, এখন বাড়ি গেলে এ্যাটলাণ্টার মরা-মুখ দেখতে পাবে। যাও শিগ্‌ঘির যাও। তার মুখের উপর একরাশ সূর্যমুখী ছড়িয়ে দাওগে···

আমি বললাম, সূর্যমুখী এই শীতে কোথায় পাব !

বলল, দেখ গে তোমার বাগানে সূর্যমুখী ভরে আছে। একটু থামে সুশান্ত। তারপর স্বগতোক্তি করে, আমি ভাবলাম আগে তোমার মরা-মুখটা দেখে আসি পরে বাগান থেকে ফুল তুলে আনব।

তুমি পাগল নাকি !

কাঁদ-কাঁদ হয়ে যায় সুশান্তর গলা, এসে দেখলাম আয়নায় তুমি মুখ দেখছ। সূর্যমুখী ফুল দিয়ে তোমার মরা-মুখটা ঢেকে দিতে পারলাম না !

এইসব অসংলগ্ন কথার কি উত্তর দেবে লাবু বুঝে উঠতে পারে না।

হঠাৎ সুশান্তর গলার স্বরটা থমথমে হয়ে গেল, ভুল করেছ। আমার মনে হচ্ছে দরজাটা খুলে রেখে বড্ড ভুল করেছ।

লাবু সুশান্তর রকম-সকম দেখে অবাক হয়ে যায়।

শোন, একবার এদিকে শোন। সুশান্ত লাবুকে ডাকে।

বল না শুনতে পাচ্ছি।

কাছে এস। সুশান্ত নিজেই লাবুর দিকে এগিয়ে যায়।

আলো জ্বালব ? লাবু জিজ্ঞাসা করে।

না-না। আলো জ্বেল না।

কেন ?

এখন আমাকে দেখলে তুমি ভয় পাবে। সুশান্তর গলার স্বরটা কি রকম কাঁপা-কাঁপা। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এসে লাবুকে চেপে ধরে সে, এই তো তুমি! তোমার জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যেতে পারছি না। তুমি আমাকে টানছ। কতদূরে চলে গেছিলাম আবার ফিরতে হল। তাই ভাবছি তোমাকে এমন কিছু করে যাই যাতে আমাকে আর ফিরতে না হয়—

এসব কি বলছ তুমি অস্থির!

কি জানি কি বলছি!

ছেড়ে দাও আমাকে! লাবু বাধা দেয়।

তা' বোধহয় পারব না। সুশান্তর গলার স্বর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সুশান্তর হাত দু'টো লাবুর কাঁধ ছেড়ে গলার কাছটা চেপে ধরে।

আঃ, ছেড়ে দাও অস্থির! আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে—ছেড়ে দাও বলছি। সুশান্তর কঠিন আঙুলগুলো ক্রমশ লাবুর গলায় বসে যায়। বাধা দিতে গিয়ে ছটফট করে লাবু। তার গলা থেকে এক-আধটা শব্দ কখনো বেরিয়ে আর্তনাদ করে উঠছিল। ক্রমশ নেতিয়ে পড়ে লাবু।

হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল।

খোকা! হৈমবতী সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, খোকা—

মা! লাবুকে আচমকা ঠেলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায় সুশান্ত। তার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে, ঘুম থেকে উঠে এলে নাকি?

দেয়ালে ঠেস দিয়ে কান্না চাপতে গিয়ে কাঁপে লাবু। যন্ত্রণার শব্দ তার গলায়। নিঃশব্দ তার শরীর। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। একরাশ চুল এসে ঢেকে দিয়েছে।

কী করছিলি তুই লাবুকে?

কিছু না—কিছু না। সুশান্ত অসংলগ্ন পুনরাবৃত্তি করে, কিছু না তো।

আমার কাছে আয় খোকা ?

আমাকে ছুঁয়ো না মা। আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি !

লাবুর দিকে তাকায় হৈমবতী। সে কাঁদছে।

মা আমাকে ডেকো না—আর ডেকো না আমাকে! দরজার বাইরে ছুটে গেল সুশান্ত। থরথর করে কাঁপছিল তার গলা, এবার বোধহয় সত্যি পাগল হয়ে যাব !

হৈমবতী পিছন ফিরে দেখল বাইরের অন্ধকারে ঝাঁপ দিল সে।

খোকা—এই খোকা শোন বলছি ? ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায় হৈমবতী। ভরা নিশুতির জোছনায় মালতিপুরের মুখ ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

সুশান্তকে কোথাও খুঁজে পেল না হৈমবতী। হঠাৎ যেন হারিয়ে গেল সে। হৈমবতীর ব্যাকুল চোখ দুটো অস্থির আশঙ্কায় স্থির বেদনা হয়ে থাকে।

লাবুর কাছে এগিয়ে হৈমবতী সস্নেহে তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বলে, রাগ করিস নে লাবু। উপরে চল আমার ঘরে শুবি।

দু'জনে নির্বাক অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে রইল। বোঝা গেল না কে ঘুমিয়েছে আর কে ঘুমোয় নি। মাঝে-মাঝে হৈমবতীর মন্থর দীর্ঘ নিঃশ্বাস রাত্রির নির্জনতাকে বিষণ্ণ করে তুলছিল।

লাবুর চোখে এতটুকু ঘুম ছিল না। সে আর শুয়ে থাকতে পারল না শেষে। উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যদি সুশান্ত ফিরে না আসে। তার জন্যে লাবুর মন কেমন করছিল।

সকালে উঠতে দেরি হল হৈমবতীর। সামনেই বসেছিল লাবু। নিচে নামেনি সে।

ডাকিস নি কেন—কত দেরি হয়ে গেল উঠতে।

লাবু কোন উত্তর দিল না।

আজই চলে যাবি না কি ?

তুমি যা বলবে—

আমি আর কি বলব! সবই আমার কপাল! তবু কাল যে সময়মতো হাজির হতে পেরেছি এই আমার ভাগ্য। ও যে কি করে বসত কে জানে! তোকে আর রাখতে সাহস পাই না লাবু।

তোমার আর দোষ কি মাসিমা!

তবু তো আমার ছেলে! ওকে আমি পেটে ধরেছিলাম। ওযে এমন হবে কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি!

অনেকক্ষণ বসে থেকে লাবু নিচে নেমে গেল।

হৈমবতী বেরিয়ে সুশান্তর ঘরে উঁকি দিল। কাল রাতে সে আর ফেরে নি।

নিজের ঘরে আসতে গিয়ে হৈমবতী সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল একটু। ঠোঁট কামড়ে ভাবল কিছু। তারপর এক-পা দু'-পা করে নিচে নেমে গেল।

গৌরমোহনের দরজা ভেজান ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখল গৌরমোহন নেই।

পিছনে গৌরমোহনের গলা পাওয়া গেল, এত সকালে তুই আবার নিচে নেমেছিস কেন হৈম?

কথাটা তোমাকে বলতে এলাম!

কিসের কথা?

সেই যে তুমি সেকেন্দ্রারাও যাবার কথা বলেছিলে—আমার আর আপত্তি নেই। তুমি ব্যবস্থা করতে পার।

গৌরমোহন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তুই মত দিচ্ছিস! আমি তো মনে করেছিলাম তোর মত হবে না। ভাবছিলাম, আজই দড়্গড়্জীকে লিখে দেব, আমার যাওয়া হবে না।

না বাবা, আমার মত পালটেছি। এখানে থাকলে খোকা বয়ে যাবে। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। ভাবছি, আর কোথাও গিয়ে ও যদি মানুষের মতো হয়।

হৈমবতী নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল।

যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। কাল সকাল এগারোটা-পঞ্চান্ন মিনিটে গাড়ি।

গৌরমোহন উৎসাহের সঙ্গে জিনিষ-পত্তর গোছগাছের তদারক করছেন।

লাবু এখনো চলে যায় নি। হৈমবতী বলেছে, কাল আমাদের সঙ্গেই চলে যাস।

বাড়িটাকে দুঃস্থ এক আত্মীয়ের হেপাজতে রেখে যাবেন গৌরমোহন। হৈমবতীরা যদি আর না-ফেরে তবে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

স্কুল থেকে উইদাউট্ পে-তে ছুটি নিয়েছে হৈমবতী। বলা যায় না যদি চলে আসতে হয়। তাই চাকরিটা হাতে রেখে দিল। ওদিকে কিছু একটা হয়ে গেলে চাকরিটা ছেড়ে দেবে।

সারাবাড়ি ঘুরে সরানো-গোছানো দেখা-শোনা করে হৈমবতী। এতদিন ধরে জিনিষ-পত্তর জমেছে তো কম নয়। সব কি আর নিয়ে যাওয়া যাবে। সম্ভবও নয়। তাই একটা-কি-দু'টো ঘরে ভরতি করে রেখে যাবে। লোক লেগেছে সেইজন্যে। সেকালের ভারি কাঠের সিন্দুক আর আলমারি সরাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তারা।

লাবুও তাদের সঙ্গে লেগে আছে।

হৈমবতী একটু চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে, তুই একটু দেখে শুনে করে-কম্মে নে লাবু—

দেখছি তো মাসিমা!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হৈমবতী বলে, শরীরটা দেখছি এখনো সামলে উঠতে পারেনি। সেই বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে কি হবে তাই ভাবছি। তুই আমাদের সঙ্গে চল না লাবু—যাবি?

আমি আর কোথায় যাব মাসিমা, মা-বাবাকে ছেড়ে! এইসব বিপদ-আপদ কেটে গেলেই আমি দেশে ফিরে যাব।

হৈমবতী বলে, তা' বটে।

এক-এক সময় ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে চলে যাই। লাবু পিটপিট করে হৈমবতীর দিকে চায়, তোমার এত কষ্ট!

আমার কষ্ট তুই বুঝিস লাবু?

কথা না-বলে শব্দ করে লাবু, হুঁ-উ।

হৈমবতী অপলক চোখে লাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাবুর ইচ্ছে হয় হৈমবতীকে জিজ্ঞাসা করে, মাসিমা তোমার ছেলেকে দেখছি না কেন! তাকে নিয়ে যাবে না?

পারে না। কি রকম একটা লজ্জা এসে লাবুকে জড়িয়ে ধরে। চুপ করে যায় সে।

সারাদিন খেটে-খুটে ক্লান্ত হয়ে উপরে উঠে গেল হৈমবতী।

একটু পরে গিয়ে লাবু চা দিয়ে এল।

চা খেয়ে নিঝুম হয়ে বিছানায় এলিয়ে রইল হৈমবতী।

অবেলার আলো ছেলে-হারা মায়ের মতো জানালার কাছে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ নিভে গেল।

আকাশের দিকে তাকায় হৈমবতী। হঠাৎ মেঘ করে এসেছে।

শুয়ে থাকতে-থাকতে বৃষ্টি এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বৃষ্টির কুয়াসায় সব কিছু আবছা হয়ে গেল। পাতাঝরা বাগান থেকে অচেনা একটা গন্ধ ভেসে আসে।

সেকেন্দ্রারাও থাকতে হৈমবতী দেখেছে শাওনমাসে এমনি মেঘ-করা দিনে মেয়েরা কেউ শ্বশুরবাড়ি থাকে না। ঝুলনে বাপের বাড়ি আসবেই। এই সময়টা বাপের বাড়ির জন্যে মেয়েদের মন কেমন করে!

জানালার বাইরে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে হৈমবতী। তার মনেহল সেও বুঝি অনেকদিন বাদে বাপের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। পরবাস থেকে স্ব-বাসে। আসন্ন এক ঝুলন উৎসবে।

ছোটবেলায় বন থেকে মঁহদীপাতা এনে রাখত। রাত্রে শোবার সময় সেই মঁহদী পাতা বেটে হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

সকালে উঠে দেখেছে হাতের চেটোয় বিচিত্র এক নক্সা রঙীন হয়ে আছে। মনে-মনে অস্পষ্ট একটা গান স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

হরিয়াল হরিয়াল

আম্মা মেরি চুঁদরীরে—

এ জী কোই হাম্মেরি রাঙ্গায় দেরে !

হরিয়াল হরিয়াল

আম্মা মেরি চুঁদরীরে !

সহেলিদের কেউ বসত দোলনায়। দোলা দিত কেউ। পাশে দাঁড়িয়ে গান ধরত বাকিরা :

হিঁডোলা কুঁজ্‌বন ডালারে

ঝুলন আঈ রাধিকা পিয়ারীরে !

কাহেকী খম্ব গড়্‌বায়ে রে,

কাহেকী ডালি ডোরিয়া রে ?

সোনেকী খম্ব গড়্‌বায়ে রে,

রেশমকী ডালি ডোরিয়া রে।

কোন্‌ ঝুলে কো ঝুলাবে পিয়ারীরে ?

রাধে ঝুলে কৃষ্ণ ঝুলাবে পিয়ারীরে !

সুখের সেই ছবি সেকেন্দ্রারাও গিয়ে আর খুঁজে পাবে না। সরোজ প্রেমলতা রুকমিনি বিয়ে হয়ে কে কোথায় চলে গেছে। দীর্ঘদিন কেউ কারো খোঁজ রাখে না। সবাই পালটে গেছে। হৈমবতী নিজেও কি কম পালটেছে। জীবনের স্বপ্ন সাধ সব কিছু শেষ করে আবার সেকেন্দ্রারাও ফিরছে !

জলে ভরে ওঠে হৈমবতীর চোখ।

কখন সন্ধে হয়ে গেছে। আলো জ্বালতে মনে নেই।

গৌরমোহন এসে আলো জ্বাললেন, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি হৈম ?

না বাবা। উঠে বসে হৈমবতী।

হ্যাঁরে হৈম, তোর ছেলের তো খোঁজ-খবর নেই! এদিকে সব ব্যবস্থা শেষ।

এসে পড়বে ঠিক দেখো।

কী জানি! ভারি মুসকিল হল দেখছি।

না এলে আর কি করা যাবে বল।

যাবার সময়ও ওকে নিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না। ফেলে তো যাওয়া যাবে না।

হৈমবতী চুপ করে থাকে।

ওর জন্যে শেষকালে যাওয়াটা না পিছিয়ে যায় আবার! চিন্তিত মনে হয় গৌরমোহনকে, কাজ তো কম নয়! এখানেও যেমন সেখানেও তেমনি। সতুর ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে হবে কারো কাছে যদি থাকে। তার ভরসাতেই একরকম যাওয়া।

হৈমবতী গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবার মুখটা নতুন করে দেখে ভাবে, সব সময় যাকে দেখি তাকে তো ভালো করে দেখি না। আজ বাবার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে কত বুড়ো হয়ে গেছেন। এতদিন এমন করে লক্ষ্য করে নি হৈমবতী। চোখের বাদামি রঙটা যেন চামড়ার ভাঁজ পড়ে ঢেকে যাবার মতো হয়েছে। কালের অন্যমনস্ক হাত সারা মুখে দেদার সব আঁকিবুঁকি টেনে গেছে।

হৈমবতীর ভাবনার মধ্যে কখন নিচে নেমে গেছেন গৌরমোহন। নিঃসঙ্গ সময়ের টানা-পড়েনে আকাশ-কুসুম ফুল তোলে হৈমবতী।

এমনি এক ঝুলনের রাতে সত্যপ্রসাদ এসে ডাক দিয়েছিল হৈমবতীকে। সেদিন বিনা দ্বিধায় দরজা খুলে বেরিয়ে গেছিল।

কোথায় যাব সতুদা?

চল আজ একসঙ্গে দোলনায় দুলব দু'জনে! একটু থেমে সত্যপ্রসাদ বলেছিল, কোন্ ঝুলে কো ঝুলাবে পিয়ারীরে?

রাধে ঝুলে কৃষ্ণ ঝুলাবে পিয়ারীরে!

হৈমবতী হেসে উত্তর দিল,

ধীরে সে ঝোটা দেঅ্ বনয়ারী রে,
হমে তো ডর্ লাগত বড়ী ভারী রে!

তারপর শব্দ করে, ঈস্! অন্ধকারে সত্যপ্রসাদের দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে ছিল হৈমবতী, কেউ যদি দেখে ফেলে সতুদা? আমার বড্ড ভয় করে!

কারো খেয়ে কাজ নেই তোমার-আমার ঝুলন দেখার জন্যে রাত জেগে বসে থাকবে! চল—। হৈমবতীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছিল সত্যপ্রসাদ। রুকমিনিদের বাইরের বাড়ির নিমগাছে টানানো দোলনায় শ্রাবণের রাত্রি অস্থির দুই হৃদয়ের সঙ্গে দুলেছিল।

মাসিমা?

কিছুক্ষণ হৈমবতীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মাসিমা।

এবার চোখ মেলে তাকায় হৈমবতী, কি—কিছু বলছিস লাবু?

তুমি আজ নিচে খাবে তো?

হ্যাঁ, উপরে আর টানাটানির দরকার কি?

আচ্ছা। নিচে নেমে যেতে গিয়েও থেমে গেল লাবু, মাসিমা—

কিছু বলবি লাবু?

নীল লিলি ফুটেছে আজ।

সত্যি? উঠে বসে হৈমবতী, নীল লিলি খোকার প্রাণ ছিল—ও এলে ভারি খুসি হবে রে লাবু—কতদিন থেকে আশা করে বসে আছে!

ও কি আর ফিরবে! অস্পষ্ট স্বরে নিজেকেই বলে বুঝি লাবু।

কিছু বললি লাবু?

কিছু না মাসিমা। লাবু নিচে নেমে গেল।

হৈমবতী উঠে একবার চারদিক দেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে

পড়ল। একবার ভাবল, খোকা বোধহয় মালতিপুরের মাঠ পার হয়ে হেঁটে আসছে। এখুনি হয়তো দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকবে, মা!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হৈমবতী খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল লাবুর ডাকে।

মাসিমা খাবার দিয়েছি। এস—

খোকা ফিরেছে? উঠেই জিজ্ঞাসা করে হৈমবতী।

না তো।

হৈমবতী আর গৌরমোহন একসঙ্গে খেতে বসে।

তুমি এখনো খাও নি বাবা?

তোর জন্যেই বসে আছি। একসঙ্গে খাব।

অনেক রাত হয়ে গেল তোমার খেতে—কাল তো ভোরেই উঠতে হবে আবার!

দু'জনে নিঃশব্দে খেয়ে যায়।

গৌরমোহনের একটু আগে খাওয়া হয়ে গেল। বললেন, হৈম আমি উঠছি। তুই আস্তে খেয়ে আয়।

হৈমবতীরও খাওয়া হয়েগেছিল। মুখ তুলে বলল, বাবা তোমাকে কথাটা বলব কি না ভাবছি—

কি কথা রে!

তোমাকে এখনো বলা হয় নি। একটু ভাবে হৈমবতী, না ঠিক তা নয় তোমাকে বলতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে তোমাকে বলা দরকার। এখনো বোধহয় ভেবে দেখার সময় আছে। যদি মনে কর যাওয়া ঠিক হবে না তা'হলে তাই হবে।

একটু অধৈর্য হয়ে গৌরমোহন বলেন, কি এমন কথা বুঝতে পারছি না যার জন্যে এত বাহানা করছিস হৈম!

সতুদা মারা গেছে।

এ্যাঁ! গৌরমোহনের ভিতর থেকে আর্তনাদ চমকে উঠল, কবে?

অনেকদিন হল। তুমি দুঃখ পাবে তাই তোমাকে বলতে পারি নি। সেকেন্দ্রারাও যাবার আগে কথাটা তোমাকে না-বলাটা বোধহয় অন্যায় হবে। তুমি তো তার উপর অনেকখানি ভরসা রাখ।

এতক্ষণে গৌরমোহন যেন সামলে নিয়েছেন, কি হয়েছিল সতুর ?

এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।

ও। কথাটা শোনবার আগে গৌরমোহন ঘরের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হৈমবতী উঠল, আজ আর রাত করিস নে লাবু। কাল ভোরে উঠতে হবে।

একটু পরে উপরে উঠে গেল হৈমবতী।

পরদিন ভোরে উঠে হৈমবতী লাবুকে ডেকে তোলে, কত বেলা হয়ে গেল ! ও লাবু ওঠ—গোছগাছ সেরে একটু পরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বাবাও ওঠেনি বোধহয়—আজ দেখছি ভারি বিপদ হবে !

হৈমবতী তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গৌরমোহনের দরজায় ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন গৌরমোহন। মাথা একদিকে একেবারে কাৎ হয়ে গেছে। চশমাটা পড়তে-পড়তে কোনরকমে চোখে লেগে আছে।

বাবা তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ !

গৌরমোহনের সাড়া নেই।

অবাক হয়ে নিরুত্তর গৌরমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে হৈমবতী, কোথায় তুই বিষ পেয়েছিলি সেই খবরটা তোর দিদিকে যদি দিয়ে যেতিস হেনু !